বঙ্কিম বীক্ষা

বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ-ইতিহাস-নিসর্গ

ডঃ জয়ন্তী সাহা

সংবাদ

৫৭/২ ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০-০৭৩

ডঃ জয়ন্তী সাহা, এম. এ, পি. এইচ্. ডি, সাংখ্যতীর্থ

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০
প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল
মুদ্রক : অরুণকুমার দাস বাসুদেব কর
এস কে প্রিন্টার্স, ৮২/সি, তারক প্রামাণিক রোড
কলকাতা-৭০০-০০৬

আমার সাহিত্য-গবেষণায় অনুপ্রেরণা—

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-কে

নিবেদন

ভূমিকা

সম্প্রতি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রধান এক ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ তথা বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী যে দারুণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাতে আর একবার প্রমাণ হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখনও ষোল আনা সজীব। তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য দেশবাসী সহ্য করতে রাজী নয়। এমন না হলে বিস্মিত হ'তাম। যে ব্যক্তি এক জীবনে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি আর গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মকে রাজনীতির ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাঁর ঋণ মুষ্টিমেয় "বঙ্কিম বাতিল" দলটি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে রাজী নয়। এ পর্যন্ত যে বঙ্কিমের যোগ্য জীবনী লিখিত হল না, তার কারণ এইখানেই। বঙ্কিমের এই তিন মহত্তম কীর্ত্তিকে একত্র করে গ্রথিত করলে তবেই যথার্থ বঙ্কিমজীবনীর ভিত্তি স্থাপিত হবে। আবার বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনাও যথাযথ ভাবে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ মজুমদার, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উচ্চদরের আলোচনা হয়েছে, একথা সত্য। তবে তা বঙ্কিমপ্রতিভার অংশবিশেষ মাত্র নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ উপন্যাসের আলোচনা, শ্রীশ মজুমদারের বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আলোচনা করেছেন দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। অক্ষয় দত্তগুপ্তর আলোচনা সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনী, যে জীবনীতে তাঁর লোকোত্তর মহিমা প্রতিফলিত হবে। তাঁর কথায়, বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, বলেছিলেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস কে লিখিবে? উত্তর দিয়েছিলেন—আমি লিখিব, তুমি লিখিবে, সকলেই লিখিবে। বঙ্কিমের জিজ্ঞাসার অনুসরণে বলা চলে, যে বঙ্কিমের জীবনী নাই। আরও বলা চলে—আমি লিখিব, তুমি লিখিবে, সকলেই লিখিবে। বঙ্কিমের জিজ্ঞাসার পরে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিত হতে শুরু হয়েছে। তিনি নিজেই শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান প্রজন্মে সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও গবেষকগণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নূতন করে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিকে স্মরণে রেখে আলোচনা শুরু করেছেন। আজ আমি সেইরকম একখানা আলোচনা গ্রন্থের সঙ্গে পাঠক সমাজে পরিচয় সাধন করিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি।

ডক্টর শ্রীমতী জয়ন্তী সাহা এম. এ. সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তিনি আমার তত্ত্বাবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন। এই গবেষণা কর্ম্মে আমি তাঁকে আমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আমি বিশেষ আগ্রহী। তাঁর সম্বন্ধে আমি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছি, কাজেই আমার মনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও আদর্শ আছে। সেই আদর্শ যাতে বর্তমান গবেষণায় প্রতিফলিত হয়, তার চেষ্টার ত্রুটি করিনি। সৌভাগ্যবশতঃ অধ্যাপক সাহা আমার উদ্দেশ্য বুঝে সেই ধারায় থিসিসটি রচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে দু'বছর আমার ক্লাশে তিনি পড়েছেন। তাঁর পাঠ্যতালিকায় বঙ্কিমসাহিত্য ছিল, কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারণার সঙ্গে তিনি পরিচিত।

তারপরে যখন থিসিসটি সম্পূর্ণ হ'ল পড়ে দেখলাম, তাতে অনেক পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। যাইহোক, তিনি পি. এইচ. ডি. লাভ করলেন। সেটা বড় কথা নয়, এখানে সাধারণ মাপের চেয়ে উৎকৃষ্টতর এই থিসিসটি যাতে অধ্যাপক সাহার খাতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে, সেই ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসলো। তখন আমার পরামর্শে অধ্যাপক সাহা থিসিসটি অনেকাংশে সংশোধন ও পুনর্লিখন করে বর্ত্তমান আকার দিয়েছেন। তাই আমি সাহস ও উৎসাহভরে গ্রন্থাকারে ইহা প্রকাশ করতে পরামর্শ দিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ, তিনি সেই পরামর্শ গ্রহণ করে, সংশোধিত ও পুনর্লিখিত গ্রন্থাকারে এইটি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। যে কোনও প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশ করবার ভার নেবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

আরও একটা কথা, এ বই ছাত্রসমাজ, কলেজের অধ্যাপকগণ ও সাধারণ পাঠকগণ সকলেরই উপকারে লাগবে। তাছাড়া অধ্যাপক সাহার লিখনভঙ্গী ও

ভাষাটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, হৃদ্য ও সাবলীল। পড়তে ক্লান্তি বোধ হয় না, বরঞ্চ পড়তে আনন্দ পাওয়া যায়।

তবে এখানেই বলে রাখি, বইখানি বঙ্কিমের জীবনী নয়, বঙ্কিমজীবনীর উপাদান। এখন পরবর্তী উৎসাহী লেখকগণ এইসব উপাদানের সার্থক ব্যবহার করে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনা করতে পারবেন বলে, আমার বিশ্বাস। এখানে আমি এই সব উপাদান তিনি কিভাবে সাজিয়েছেন তার কিছু উদাহরণ দেবো। তবে পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে গ্রন্থের ভূমিকা গ্রন্থ নয়, গ্রন্থের পরিচয় মাত্র।

গ্রন্থখানি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প, বঙ্কিমচন্দ্রের নৈসর্গিক ও সামাজিক উপাদান, বঙ্কিমসাহিত্যের চরিত্র চিত্র এবং ইতিহাস সম্বন্ধে মনন। আগেই বলেছি আমার এই ভূমিকাটি গ্রন্থের সাকুল্য বিবরণ নয়, পরিচয় মাত্র। দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেকগুলি দীঘির উল্লেখ আছে। চন্দ্রশেখরের ভীমা পুষ্করিণী, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রদত্তের ফুলবাগানের পুকুরটি এবং সর্বোপরি কৃষ্ণকান্তের উইলে বারুণী দীঘি। এর কোনওটি অকারণ নয়। প্রত্যেকটি উপন্যাসের গল্পের সঙ্গে জড়িত। কাজেই তাহাদের বাদ দিলে উপন্যাসের অঙ্গহানি হয়। বারুণীকে বাদ দিলে কৃষ্ণকান্তের উইলের গল্পটি দাঁড়ায় না। আবার নদীর উল্লেখ করা যাক—বিষবৃক্ষের নায়ক নগেন্দ্র দত্ত নৌকায় কলিকাতায় যাত্রা করেছেন। তিনি নৌকায় বসে দুদিকের দৃশ্যাবলী দেখছেন। এই দৃশ্যাবলীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের চালচিত্র বর্ণিত হয়েছে। আর গঙ্গানদীর সূত্রে সমস্ত চন্দ্রশেখর উপন্যাসখানি মুক্তাহারের মত গ্রথিত। কলকাতা, বেদগ্রাম, মুঙ্গের, পাটনা এইসব প্রধান ঘটনাস্থানগুলি সবই গঙ্গাতীরে। তাছাড়া প্রথমেই আছে প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ। উপন্যাসের সঙ্কটস্থলে আবার শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গাবক্ষে সাঁতার—এসব বাদ দিলে উপন্যাসখানির ছিন্নসূত্র মালার মত ঝরে পড়ে। আর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে তো সমুদ্রগর্ভোত্থিত একটি মায়াদ্বীপ বললেও চলে।

এবারে সামাজিক উপন্যাসের উপাদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে

পারে। অধিক বলবার প্রয়োজন হয় না। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বাঙ্গালী সমাজে যত রকম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেখা যেত, তাঁর উপন্যাসের চিত্রশালায় সকলেই সমাবিষ্ট, কোনটাই বাদ পড়েনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস চেতনাকে সমর্থন করেছেন। এর চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র আর হয় না।

আমি ভূমিকা লিখতে বসে, ভূমিকা লেখকের কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি, সেইজন্য এখানেই ক্ষান্ত হলাম। শুধু আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই বইখানি একখানি আকর গ্রন্থ। ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ পাঠক উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভারতীয় সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র সুনিপুণ মনোবিশ্লেষণের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মানুষের জীবননাট্যের রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা শুধু সৌন্দর্যনির্মিতিতে নয়, মানুষের আবেগ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের সংঘাতময় নাট্যমুহূর্তের সঙ্গে তার একাত্মতা।

বঙ্কিমের পর্যবেক্ষণী প্রজ্ঞা ইতিহাসের, সমাজের অতীত, বর্তমান, সর্বস্তরের মানুষকে, শৈশব থেকে প্রৌঢ়তা পর্যন্ত বয়সের সর্বসীমাকে স্পর্শ করেছে। তাঁর সাহিত্যে এইসব চরিত্রসমাবেশ স্বল্পরেখায় বাস্তবায়িত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের এই বিপুল বৈচিত্র্যময় প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মিক যোগ এই ক্রান্তদর্শী লেখক অনায়াস দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্যের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণের প্রয়াসই আমার এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কাছে 'বঙ্কিমসাহিত্যে নৈসর্গিক ও সামাজিক উপাদান' এই শীর্ষক গবেষণার কাজ করেছি। তাঁর উৎসাহ আর সহযোগিতায় শ্রীমতী সুরুচি বিশী ও আমার মা-বাবা শ্রীমতী ইন্দুলেখা সাহা ও ডাক্তার মোহিনীমোহন সাহার অনুপ্রেরণায় এই বই মুদ্রণে উৎসাহী হয়েছি, আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা তাঁদের উদ্দেশে। যিনি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়ে লিখনরীতি ও বই-এর পরিকল্পনায় প্রভূত সহায়তা করেছেন, শ্রদ্ধানত প্রণাম জানাই আমাদের সেই প্রয়াত অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সাহিত্যপাঠে ব্রতী হয়ে, আমার শিক্ষক, দুই মহৎ ব্যক্তিত্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্নেহসান্নিধ্য পেয়ে আমি ধন্য। গুরুঋণ স্মরণ করেই তাঁদের আমার গ্রন্থ উৎসর্গ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই শিশুসাহিত্যিক শ্রী শিবশঙ্কর মিত্রকে, যাঁর সাহায্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, Central Library-তে অনায়াসে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থের উপর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। গ্রন্থপঞ্জী রচনায়ও তিনি সহায়তা করেছেন। ইতিহাস-বিষয়ক কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন নি শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রতুল গুপ্ত। এই গ্রন্থের মুদ্রণের কাজে আমার ভাইঝি শ্রীমতী ভাস্বতী সাহার অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমী সহায়তা ছাড়া

একাজ সম্পন্ন করাই আমার পক্ষে কঠিন হতো। বোনঝি শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়ের আমাকে নিরন্তর উদ্যমী রাখার উদ্যমকে ধন্যবাদ। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার দীর্ঘদিন ফেলে রাখা গবেষণাকর্মকে গ্রন্থাকারে প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছেন, কৃতজ্ঞ আমি তাঁদেরও কাছে। ধন্যবাদ জানাই 'সংবাদ' প্রকাশনের স্নেহভাজন শ্রীরাধানাথ মণ্ডল ও তার সহযোগীদের, বিশেষ করে, নির্ধারিত দিনে মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিয়ে আনায় শ্রী কল্যাণ পণ্ডিতের নিরন্তর প্রয়াসকে।

জয়ন্তী সাহা

ভূমিকা : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রথম পর্ব বঙ্কিমসাহিত্যে সমাজ

দ্বিতীয় পর্ব বঙ্কিমসাহিত্যে ইতিহাস

তৃতীয় পর্ব বঙ্কিমসাহিত্যে নিসর্গ

To

Dear Sarala

on her wedding,

with B. C. Chatterjee

sincere affection

June 7. 1878

A virtuous woman is

a crown to her husband.

Proverbs XII 4.

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী সরলা দত্তের বিবাহে বিভিন্ন গ্রন্থের সঙ্গে স্বরচিত 'ইন্দিরা' গ্রন্থটি নিজে স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন। এই স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠাটি শ্রীমতী সরলা গুপ্তর পুত্রবধূ শ্রীমতী মান গুপ্তর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। কাহিনীগ্রন্থনে, জীবননাট্যের উপস্থাপনায়, হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং দার্শনিকচিন্তার গভীরতায় তাঁর উপন্যাস আজও পাঠকের আনন্দ এবং সমালোচকের জিজ্ঞাসার উপকরণ।

এই মহৎ শিল্পস্রষ্টার কথাসাহিত্যসম্ভারের কোনো পুনরালোচনা বক্ষ্যমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান প্রয়াসটি উপস্থাপিত করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পাঙ্গিক নির্মাণের জন্য যে সমস্ত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, তাদের যথাসাধ্য আহরণ, বিন্যাস এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য অনুসন্ধান করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

উপন্যাসের তাত্ত্বিক উপকরণ এই আলোচনায় গৃহীত হয় নি; কারণ তা অতি বৃহৎ বিচার ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমরা প্রধানতঃ তার বহিরঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে শিল্পী বঙ্কিমের বিষয়বস্তু ও চরিত্র আহরণের স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, উপকরণ সংগ্রহের মধ্যেও শিল্পীর নিজস্ব জীবনদৃষ্টি এবং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। শরৎচন্দ্র যখন প্রধানতঃ নারীচরিত্রকেই তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর পুরুষচরিত্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে:পুরুষচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পার্বতীপরমেশ্বরের মত প্রকৃতিপুরুষ সমভাবে উদ্ভাসিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রকৃতির মধ্যে শান্ত এবং সুন্দরকে

প্রধানভাবে নির্বাচন করেন তখন তারাশঙ্করের রচনায় নিসর্গের এক নগ্ন নিষ্ঠুর রূপ প্রায়শঃ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। এই পার্থক্যের কারণ আর কিছুই নয়, তা ব্যক্তি-মানুষের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সাধারণ দুঃখীমানুষের কথা, ভিক্টর হিউগো লিখেছেন এবং এমিল জোলাও লিখেছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও আকাশপাতাল পার্থক্য।

সুতরাং উপকরণবিচার মাত্র একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, তা লেখকের ব্যক্তিত্ব তথা শিল্পিমানসেরও অনেকখানি দ্যোতনা পরিস্ফুট করে।

বর্ষাকালে একদিন গঙ্গাতীরস্থ কোন্ ভবনে বসে চন্দ্রালোকিত গঙ্গার সৌন্দর্যে অভিভূত বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা লক্ষ্য করলে তাঁর শিল্পিমনের বাসনা আমাদের কাছে অনেকাংশে প্রতিভাত হ'য়।

"কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বহিতে বহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যাজিব।
জাহ্নবীজীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম, এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"*

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, অন্তরধর্মে ছিলেন বাঙালী। বাঙলা-দেশেরই মাতৃমূর্তি ছিল তাঁর নিত্য ধ্যেয়, বাঙালীর আত্মিক দুর্গতি ছিল তাঁর প্রতিদিনের যন্ত্রণা, এই অপমানিত জাতি আবার লক্ষ্মণ সেন, হলায়ুধ

* 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ'—'ভূমিকা' : 'জীবনচরিত ও কবিত্ব' : বঙ্কিমচন্দ্র।

ও ভট্টনারায়ণের ইতিহাসগৌরবে প্রদীপ্ত হ'য়ে আবার মাথা তুলবে এই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী অভীপ্সা। তাঁর সামাজিক উপন্যাসে তিনি বাঙালীর স্খলন পতন দেখিয়েছেন, তার সংশোধনের পথনির্দেশ করেছেন এবং সেই প্রয়োজনে প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালীচরিত্র নির্বাচন করেছেন; পারিবারিক জীবনের হাসি-কান্না স্নেহভরা কৌতুকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থলে তিনি বাঙ্গালীর শৌর্যবীর্যকে স্মরণ করেছেন, রাজপুতনার বীরমন্ত্র দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে বহুক্ষেত্রে তাঁকে সর্বভারতীয় হ'তে হয়েছে। দিল্লী-রাজপুতনা থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত বহির্বঙ্গে তাঁর পরিক্রমা, কিন্তু বাংলাদেশের নদনদী, তার তরুলতা তার পশুপাখী, এবং দেশী যূথী, জাতি মল্লিকার সমারোহ বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের আকৃতি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আমাদের আলোচনা বহিরঙ্গমূলক বটে কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরসত্য অনেকখানি অভিব্যক্ত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে দাবী করা যায়।

সামাজিক ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক—আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। সমাজের ও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের নরনারী ও বিচিত্র প্রাকৃতিক উপাদান কি ভাবে তথ্যরূপে কাহিনীর প্রয়োজন এবং অর্থব্যঞ্জনার ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা তাই যথাসাধ্য দেখাবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য অসম্পূর্ণতা অনেক আছে তথাপি আশা করা যায় এ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত নৈসর্গিক ও মানবিক উপকরণগুলির একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই আলোচনার প্রথমখণ্ডে 'সামাজিক উপাদান'-এর অধ্যায়বিভাগকালে আলোচ্য নরনারীচরিত্রগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য অধিক লক্ষিত হয়েছে, সেই ভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত চরিত্রগুলির অন্য অধ্যায়ে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলেও দ্বিরুক্তিভয়ে তাদের পুনরুল্লেখ পরিহার করা হয়েছে।

মহৎ প্রতিভার ধর্ম মাধুকরী। কহ্লন তাঁর 'রাজ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে কৌতুক করে বলেছেন : 'পরকাব্যেষু কবয়ঃ।' যাঁরা অপরের কাব্য থেকে হরণ করেন, তাঁরা অবশ্যই নিন্দনীয়; কিন্তু যাঁরা মধুকরের মতো আহরণ করে নিজ প্রতিভার দ্বারা মধুচক্র নির্মাণে সক্ষম, তাঁরাই শিল্পী। মহাকবি শেক্‌সপীয়রের নাট্যসম্ভার তাই শত-পুষ্পের সৌরভ বহন করছে।

প্রকৃতি, ব্যক্তিমানব, সমাজজীবন ও ভগবদ্‌স্বরূপের রূপকার শিল্পীর এই মাধুকরী হল তাঁর উপাদান সংগ্রহ। মাত্র পূর্ববর্তী প্রতিভার কাছ থেকে ভাব-সংগ্রহই নয়, পারিপার্শ্বিক জীবন, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও মানসিক অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত দার্শনিক দৃষ্টি—এরা সমবেতভাবে কবি কথা-সাহিত্যিক নাট্যকারের উপকরণ-সম্ভারে পরিণত হয়। আর এই সব বিবিধ উপকরণকে ব্যবহার করে তাঁর 'অভিনব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' সর্বকালজয়ী রসবস্তু রচনা করে।

যে কোন স্রষ্টার উপাদানসমূহ মূলতঃ দুই জাতীয়। কিছু উপাদান আধ্যাত্মিক বা মানসিক, এগুলি আহরিত হয় পূর্বগামী সাহিত্য-চিন্তার উত্তরাধিকারে, শিল্পীর দার্শনিক বোধ এবং মনোগত প্রবণতার সহায়তায়। অন্যজাতীয় উপাদান সংগৃহীত হয় চতুর্দিকের বাস্তব জীবন থেকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, পরিচিত পরিপার্শ্ব থেকে, কখনও কখনও অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান থেকে। প্রথম পর্যায়ের উপাদানগুলি শিল্পের ভাবলোকে অবস্থান করে, দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান-সমূহের সাহায্যে শিল্পবস্তুর কায়ারূপ নির্মিত হয়। তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দার্শনিক বা অধ্যাত্মচিন্তা থেকে আরম্ভ করে সমকালীন কবির কোনো বিশিষ্ট আবেগ পর্যন্ত মধুকর স্রষ্টার ভাবময় উপাদানে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার পরিচিত গ্রামবাসী, নদীর ধারের পলাশের বন অথবা ইতিহাস-কিংবদন্তীর চরিত্র অথবা কবির 'রেবারোধসি বেতসিতরুতল' ও তাঁর সৃষ্টির কায়িক উপকরণ হয়ে উঠতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাতে আমরা এই অনন্য মাধুকরী দেখতে পাই। একদিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শনের নিষ্ঠাবান্ পাঠক, অন্যদিকে গীতা উপনিষৎ এবং রামায়ণ মহাভারত—কালিদাস-ভবভূতির রসতীর্থে তিনি নিত্যযাত্রী। তাঁর অনুসন্ধান কখনো অধ্যয়ন ও কল্পনার পথ বেয়ে দিল্লীর মোগল প্রাসাদের রহস্য-রোমাঞ্চময় দূরলোকে; কখনো গঙ্গার কলধ্বনি মুখর বেদগ্রামে,—কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের স্তিমিত দীপালোকে তিনি তাঁর নায়িকাকে দেখতে পান, কখনো তাঁর চরিত্র গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন করে; আবার কখনো বা ইয়োরোপীয় জীবন-চঞ্চলা নারীর মত উন্মত্ত আবেগে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যের মর্মলোকে কখনো জার্মান দার্শনিক ফিক্‌তের 'An Address to the German Nation' প্রভাবিত 'অনুশীলনতত্ত্ব,* কখনো তাঁর ভাবলোকে 'ইন্দিরা'র মত স্নিগ্ধ-গভীর পারিবারিক রস।

আমাদের এই আলোচনায় বঙ্কিমসাহিত্যের ভাবগত উপাদানগুলি বিশ্লেষিত হবে না, আমরা তার বস্তুগত উপাদানগুলিই যথাসাধ্য নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু বলা প্রয়োজন, কায়িক-নির্মিতিও ভাবের দ্বারাই প্রভাবিত হয়; বিশেষ ধরনের চরিত্রের পরিকল্পনা বা অবতারণা, বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি দুর্বলতা, কোন নির্দিষ্ট ফুল বা পাখীর পুনঃপৌনিক আবির্ভাব, এগুলি সাহিত্য-স্রষ্টার মনোভাব এবং জীবনবোধের দ্বারাই বিন্যস্ত হয়ে থাকে।

*　　　*　　　*

---

* "এ অনুশীলনতত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্মণ পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fchte) 'Individual and Communal Culture.' ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী'—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা, 'নারায়ণ' বৈশাখ: ১৩২২।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা-সম্ভারের মূল উপাদানগুলিকে আমরা তিনটি স্থূলভাগে বিভক্ত করতে পারি : ১। প্রাকৃতিক, ২। সামাজিক ও ৩। আধ্যাত্মিক। আমরা আগেই বলেছি শেষোক্ত উপাদানটি এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা প্রথম দুটি বিষয়কেই অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপকরণ-সংগ্রহের বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করব। ঐতিহাসিক উপাদান সামাজিকের অন্তর্ভূ্তই।

বঙ্কিমের জীবন-বাণী বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও উদাত্তভাবে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর অমর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে, ১০ম পরিচ্ছেদে এই গানটি শোনা যায় ভবানন্দের কণ্ঠে। রণনিপুণ ও শত্রুবিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মহেন্দ্রসিংহের সঙ্গে পথ চলতে চলতে অকস্মাৎ যেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন। তারপর তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্ছলিত হয়েছে মাতৃমন্ত্র :

'বন্দেমাতরম্'।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটি-কণ্ঠ কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণীবিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।'

গানটি যদিও 'আনন্দমঠে' সন্নিবিষ্ট কিন্তু বঙ্কিমজীবনীপাঠে জানা যায় যে মাত্র ঔপন্যাসিক প্রয়োজনেই এইটি রচিত হয় নি। কয়েক বৎসর পূর্বেই বঙ্কিমমন্দ্র গানটি লিখে রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"কিঞ্চিৎ পরিণতবয়সে 'আনন্দমঠে' লিখিলেন। 'বন্দেমাতরম্' গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।...

বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা Matter কম পড়িলে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐদিনে লিখিয়া দিতেন।...

'বন্দেমাতরম্' গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত Matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আজই পাবে।' একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধহয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে 'বন্দেমাতরম্' গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, উহা মন্দ নয়ত, ঐটা দিন না কেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা ভাল কি মন্দ এখন তুমি

বুঝিতে পারিবে না, কিছু কাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।' এই গীতটির একটি সুর বসাইয়া উহা গাওয়া হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাইবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন, পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।"[১]

গানটি যে অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ অন্যত্রও আছে, বস্তুতঃ এই গান আনন্দমঠের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা এই গানের প্রেরণাই বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দমঠ লিখিতে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই গানটিতে সুর সংযোজনা করে গাইতে ভালবাসতেন এবং তাঁর স্বদেশমন্ত্র এরই মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হত। এ সম্পর্কে স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :

'কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্ত্ররচনাকালেই দেশের জাগরণের অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই গান উপন্যাসখানির পূর্বে রচিত হয়। তিনি যখন এই গান রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিতেছিলেন তখন বঙ্গ-দর্শনের কার্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গান রচনা না করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে বলেন। গানে বঙ্গদর্শনের ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক তবে তখন এ গানের মর্ম বুঝিবে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্যবধানে কার্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নব জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সেই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে ভারতবর্ষ মুখরিত।'[২]

বস্তুতঃ স্বদেশচিন্তার পরিপূর্ণরূপ যখন 'আনন্দমঠ'-এ উদ্ভাসিত হল তখনই এই গানটি তার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশলাভ করল। 'বন্দেমাতরম্' কেবল বাঙ্গালীর মাতৃবন্দনাতেই সীমাবদ্ধ রইল না সর্বভারতীয় জাতীয় জাগরণে

১। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা। নারায়ণ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২২। পৃঃ ৫৬১।

২। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা, নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২।

বীজমন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করল। অবশ্য পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে মূল সঙ্গীতটির অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে তৎসত্ত্বেও অখণ্ড 'বন্দেমাতরম্' তার স্বমহিমাতেই চির প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসে মহেন্দ্রসিংহ গানের প্রথম কয়েক কলি শুনে বলেছিলেন,—

'এত দেশ, এত মা নয়'—উত্তরে ভবানন্দ বলেছিলেন—'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চস্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই। ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদেব আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—'[৩]

মাতৃবন্দনার এই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত শুধু সন্তানদের নয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই জীবনমন্ত্র। এই গানটি তিনি ঠিক কবে লিখেছিলেন তা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন রচনাসম্ভারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করলে মনে হয় এই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতেই বীজমন্ত্রের মত বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবন, চিন্তা, চেতনা ও চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সর্বময়ী এই মাতৃমূর্তিকে অবমাননা ও দুর্গতির অন্ধকার থেকে আলোকোদ্ভাসিত নবীন মন্দিরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করাই সন্তানদের মহাব্রত এবং লেখকেরও। 'কমলাকান্তের' 'আমার দুর্গোৎসবে' বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বপ্ন উদ্ভাসিত :

'আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি?……সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—স্বুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা!……চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিত। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না,—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী

৩। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

শত্রুমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, সেই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বাঙালী ছিলেন এবং তাঁর মাতৃমূর্তি এই বাংলাদেশেরই সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য. ঐতিহ্য থেকে তিলে তিলে আহরিত।

এই বাংলাদেশেরই শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা রূপে সেই জননীর সৌন্দর্যের পূর্ণতা, তাঁর অঙ্গদ্যুতিস্বরূপ রজনীর বিপ্লাবিনী জ্যোৎস্না, বঙ্গভূমির বহুবর্ণ পুষ্পসম্ভারে, ঘনশ্যাম পাদপচ্ছায়ায় সেই সুখদা বরদাত্রী মায়ের মধুরহাসি :

'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।'

অন্যদিকে বাঙালীর মনুষ্যত্বসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস থেকে শক্তি ও বীর্যবত্তা আহরণ করে আনছেন, অনুধ্যান করছেন ধর্মপাল, দেবপাল লক্ষ্মণসেনকে, উদ্বোধিত করতে চাইছেন সেই প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, কপিল এবং গৌতমের মহামনীষাকে, তাই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে আমরা শুনতে পাই শাক্তের বন্দনা—

'সপ্তকোটীকণ্ঠে-কলকল-নিনাদ-করালে
দ্বিসপ্ত-কোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।'

আবার তারই সঙ্গে জ্ঞানোজ্জ্বল বিভাতির বন্দনা—

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম

৪। কমলাকান্ত : আমার দুর্গোৎসব : একাদশ সংখ্যা।

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'

স্রষ্টা বঙ্কিম তাঁর স্বদেশের মাটির শক্তি, ঐশ্বর্য, ঐতিহ্যের নির্যাস দিয়ে নূতন প্রতিমা, নূতন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপন্যাসে, স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ সন্তানের।

'আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?'[৫]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেন:

'মাতা যখন কালাধীন, তখন তিনি জগৎপালক বিষ্ণুর অঙ্কাশ্রিত। ধরণী, 'ধরণীং ভরণীং মাতরম্।'......বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা সার্বভৌম, পৃথিবীর সর্বভূমিব্যাপী তার প্রসার; ক্ষুদ্র একটি দেশের, সাময়িক একটি সঙ্কট-ত্রাণের জন্য সে কল্পনা বিযুক্ত হবে, এমন আশা সঙ্গত নয়। মানবপ্রীতি যাঁর কাছে ঈশ্বরপ্রীতির নামান্তর, তাঁর কাছে অন্যরূপ কেনই বা আশা করবো। বন্দেমাতরম্ মনুষ্য সমাজের সার্বজনীন মুক্তি-সঙ্গীত, সার্বভৌম পৃথিবীর বন্দনা-সঙ্গীত। তবে দেশ ও সমাজবিশেষ যখন সর্বের অন্তর্গত, তখন দেশ ও সমাজবিশেষের মহিমাদ্যোতক মনে করায় ক্ষতি নাই।'[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল উপকরণগুলি তাই তাঁর ধ্যানের ধন এই বাংলাদেশ থেকেই সংগৃহীত। ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে তাঁকে দিল্লী-মথুরা-মুঙ্গের-উড়িষ্যা, রাজপুতনা ইত্যাদি হয়ত পরিক্রমা করতে হয়েছে, কিন্তু যেখানেই তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা উল্লসিত সেখানেই বাংলার রূপটিই বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ রাজপুতনার একটি পার্বত্যপ্রকৃতির বর্ণনা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

'তথায়, উপলমাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে

৫। আনন্দমঠ: ৪র্থ খণ্ড; সপ্তম পরিচ্ছেদ।
৬। বঙ্কিমসরণী: পৃ: ২৪৬: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে।'[৭]

এই উপলমাতিনী কলতান উদয়পুরের পার্বত্যনদীর, কিন্তু ঐ বন্যকুসুম যেন বাংলার পলিমাটিরই সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ, জগৎসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহকে স্মরণ করেছেন, যাঁদের দেহের বজ্রাস্থি রাজপুতনার স্বদেশপ্রেমের হোমাগ্নিতে নির্মিত। তারও পশ্চাতে বাঙালীর মেরুদণ্ডে বীর্যসঞ্চারের স্বপ্ন। রাজা সীতারাম, মৃন্ময়রায় (মমাহাতি), জীবানন্দ ও ভবানন্দ, প্রতাপ রায় এঁদেরই সগোত্র। তাছাড়া বাঙ্গালী না হলেও চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মানিকলাল সিংহ, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ হেমচন্দ্র, বীরেন্দ্রসিংহ, অভিরামস্বামী, এঁদের মানসিক গঠনে বাংলার মৃত্তিকারই ছায়া। বাঙালীর আবেগপ্রবণতা, কোমলতা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্তি, তীব্র আত্ম-মর্যাদাবোধ এঁদের চরিত্র বিভূষিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আদর্শ মানব—তিনি মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখর, সত্যানন্দ বা রামানন্দ স্বামী যিনিই হোন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, জ্ঞানসাধক। বাঙালী বীর প্রতাপ রায়, রামচরণ, সীতারাম, গঙ্গারাম, মেনাহাতি, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং বীরাঙ্গনা শান্তি, প্রফুল্ল অথবা শ্রী বাঙালীর পারিবারিক জীবনের শান্তি, সৌন্দর্য ও কল্যাণসাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের জাতীয় চরিত্রের অপহ্নব ও লজ্জা যেমন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পশুপতি, সীতারাম ও গঙ্গারামের মধ্য দিয়ে সংকেতিত হয়েছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে নগেন্দ্র দত্ত, অথবা গোবিন্দলালের পাপ বঙ্কিমচন্দ্র যেন বাঙালীর আত্মশোধনের জন্যই উপস্থাপিত করেছেন।

অসীম স্বদেশপ্রেমে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানক্ষেত্রে তাঁর মাতৃভূমি বঙ্গদেশের 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং' ঐশ্বর্যমূর্তি দেবীপ্রতিমা হয়ে বিরাজিত; অন্যদিকে তাঁর দুঃসহ বেদনাবোধ—আমাদের জাতীয় গ্লানি ও অধঃপতন প্রতিমুহূর্তে তাঁকে দহন করে। স্বদেশপ্রেম এবং আত্মসমালোচনার এই দ্বিধারায় বঙ্কিমের উপন্যাসে মানুষ এবং প্রকৃতি যুগপৎ একটা বিশিষ্ট তাৎপর্যে মণ্ডিত

৭। রাজসিংহ : ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

হয়েছে। অন্যদিকে তিনি স্রষ্টা এবং গল্পরচয়িতা, তাই জীবনসত্যের উপস্থাপনার প্রয়োজনে এবং কাহিনীরস নিবিড় করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় উপকরণ উপযুক্ত ভাবেই সংগ্রহ করেছেন। শিল্পের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় শর্ত হল : "Selection and balance." উপকরণ সংগ্রহে বঙ্কিমের সেই নির্বাচনী প্রতিভা, (selection) উপকরণ ব্যবহারে তাঁর ভারসাম্য রচনা।

পরমশক্তিধর বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশিষ্ট দিকটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কথা-সাহিত্যকেই অবলম্বন করব। কারণ, আমাদের সম্পর্ক এক্ষেত্রে চিন্তানায়ক মহামনীষী বঙ্কিমের সঙ্গে নয়, রসস্রষ্টা বঙ্কিমের সঙ্গে।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথা-সাহিত্যে বাংলার প্রকৃতিকে উদ্‌ভাসিত করেছেন, বাংলার সমাজকে উদ্বোধিত করেছেন 'বন্দেমাতরম্' -এর অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মমন্ত্রে। বঙ্কিমসাহিত্যের অন্তরঙ্গে শ্রীমদ্ভাবগবদ্‌গীতার অধ্যাত্মচেতনা আর বহিরঙ্গে বাংলার প্রকৃতি ও সমাজ। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় 'বন্দেমাতরম্'-এর অধ্যাত্মপ্রেরণা নয়, বাংলার প্রকৃতি ও সমাজের বহিরাঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

বঙ্কিমের শিল্পিব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন:

"দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপরিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; এইবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।"[১]

বাংলা সাহিত্যের এই অত্যাশ্চর্য সমুন্নতি সাধিত হয়েছিল বঙ্কিমের প্রতিভার বৈচিত্র্যে এবং ব্যাপকতায়। মাত্র ঔপন্যাসিকই তিনি ছিলেন না—ধর্ম, সমাজ, স্বদেশ, লোকনীতি ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা—সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর মনীষা বজ্রসূচীর মতো বিচিত্র মণিসম্ভারকে বিদ্ধ করেছে। তাঁর শিল্পচেতনা তাদের মধ্য দিয়ে সূত্রের মতো বাহিত হয়েছে। চিন্তাগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের দিগন্তে উদয়শৈলের মতোই মহিমাভাস্বর।

তাঁর বহুধাব্যাপ্ত প্রতিভার একটি খণ্ডাংশই আমাদের আলোচ্য। তাঁর কথা-সাহিত্যে কী কী সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক উপাদান কী কী ভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন—বিশেষভাবে সেইগুলিই আমরা নির্ধারণ করব। এই ধরনের আলোচনা নিঃসন্দেহে যান্ত্রিক, শিল্প-বিচারের কোনো-ভূমিকা নেই, রসব্যাখ্যারও অধিকার নেই, নিছক তথ্যপঞ্জী আহরণ ও সংকলনই আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। শিল্পবস্তুর মুখ্য বা গৌণ উপকরণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লেখকের প্রবণতা পরিস্ফুট হয়, তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজী নিও-রোম্যান্টিক কবিতায় আমরা 'স্কাইলার্ক', কোকিল এবং 'নাইটিংগেল' পাখী সম্পর্কে কবিদের পক্ষপাত দেখি। শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ

১। আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃষ্ঠা: ১০, দ্বিতীয় স্তবক।

অথবা কীটস্, কবিতার রচয়িতা যিনিই হোন, তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি সাধারণ ধর্ম আছে ; এই পাখীরা যেন আনন্দিত স্বাধীন সঙ্গীতের দেবকণ্ঠ, যেন তারা প্রকৃতির প্রাণস্বরূপ, যেন অসীম আকাশে তাদের মুক্তযাত্রা। রোম্যান্টিক কবিদের স্বর্গীয় সঙ্গীতের জন্য অভীপ্সা, নিসর্গের প্রতি আকর্ষণ এবং 'Desire of the moth for the star'—যেন এই সমস্ত পাখীকে আশ্রয় করেই মুক্তি পেয়েছে। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের বহু কবিতায় অশ্বারোহণের প্রসঙ্গ আছে—তা কবির উদ্দাম জীবনাসক্তিরই প্রতীক। আবার টমাস হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতি প্রায়ই বিষণ্ণ এবং ধূসর, কখনো তুষার ঝঞ্ঝাতাড়িত ও বাত্যাক্ষুব্ধ—তাঁর বিষাদান্ত বক্তব্যের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় যোগ আছে: "Suggesting tragical possibilities."। সামাজিক উপকরণ নির্বাচনেও এই ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্রতা ধরা পড়ে। প্রকৃতিবাদী লেখক এমিল জোলা যে সব নর-নারীকে তাঁর কাহিনীতে নিয়ে আসেন, তারা জীবনের নগ্নতা ও কুশ্রীতার প্রতিচ্ছবি, অথচ ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসে সমাজের একান্ত নিম্নতলের মানুষগুলি তাদের বহু দোষত্রুটি সত্ত্বেও মানবীয়তায় উদ্ভাসিত হয়েছে—অন্ততঃ অধিকাংশ চরিত্রকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক নির্বাচন করেছেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে উপাদান নিরূপণে লেখকের জীবনদৃষ্টি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্ব নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী তাদের সঞ্চয় করছে—নির্বিচারে প্রকৃতি এবং জীবন থেকে সব কিছু তুলে নিচ্ছে না ; বাংলা দেশের অকৃপণ বর্ষা, তার মেঘমেদুর আকাশ, তার আসন্ন-বর্ষণ কালো দিগন্তে বকের শ্রেণী, তার 'নৃত্য-তরঙ্গিত তটিনী'—রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে ; শুধু গানে বা কবিতায় নয়—তাঁর নাটক গীতিনাট্যেও নয়, রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যেও মেঘচ্ছায়া এবং ধারাসম্পাতের বহুল আবির্ভাব—নিবিড়তর মুহূর্তগুলির পরিবেশ রচনায় বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এমন উপকরণ আর পান নি। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র "সংসারে যারা শুধুই দিলে পেলে না কিছুই" তাদের বেদনা অভিব্যক্ত করতে গিয়ে বারে বারে বঞ্চিতা নারীদেরই আহরণ করে এনেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক এবং প্রাকৃতিক উপকরণ, নির্বাচনেও তাঁর ব্যক্তিত্বের

বিস্মন লক্ষ্য করা যাবে। সাহিত্যপাঠকরূপে যেমন তিনি স্কট, বায়রণের শিষ্য, তেমনি কালিদাস-ভবভূতির অনুভাবেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। স্কট যেমন তাঁর স্বীয় স্কচ জাতির গৌরব এবং ঐতিহ্যের কাহিনীগুলিকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি কাহিনী খুঁজেছেন হুগলীজেলার গড়মান্দারণে, যশোহর খুলনার মহম্মদপুরে, রংপুর জেলার 'চৌধুরাণী'-তে। বায়রণের 'দি সীজ্ অভ্ করিন্থ' অথবা 'দি পিলগ্রিমেজ অভ্ চাইল্ড হেরল্ড' তাঁকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত করেছে। কালিদাসের ইন্দ্রিয়সচেতন সৌন্দর্যানুভূতি এবং ভবভূতির দাম্পত্য ভালোবাসার নিবিড়তাও তাঁর উপলব্ধির মধ্যে বিদ্যমান— 'উত্তর-রামচরিতের' রাম-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'অয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তিনয়নয়ো'—একথা কখনোই ভুলতে পারেন নি। আর সর্বোপরি তাঁর মানসলোকে পাশ্চাত্য চিন্তাপরিশীলিত ভারতীয় কল্যাণ-বাদ—এই সব মিশ্রণেই বঙ্কিমের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উপাদান নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অপরিহার্য। স্কটের মতই তিনি ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীগত চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বন করেছেন—প্রেম-বেদনা-বাসনা দিয়ে তাঁর উপন্যাসকে মাধুর্যসিক্ত করেছেন; বায়রণের বীরত্বব্যঞ্জক ও স্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্য তাঁর রচনায় উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, আবার কালিদাস-ভবভূতি বাল্মীকি-ব্যাসের প্রভাবে তাঁর উপন্যাসে এসেছে শান্তি, সংযম, কল্যাণবোধ, নিষ্কাম কর্মসাধনার মন্ত্রবাণী।

এই ভাবধারার উপযুক্ত পরিবাহকরূপেই তাঁর সামাজিক এবং প্রাকৃতিক উপকরণ সংগৃহীত। তাঁর নায়কেরা কখনো বীর, কখনো স্বধর্মনিষ্ঠ, কখনো আত্মবিভ্রমের ফলে ক্ষণিকের জন্য মোহগ্রস্ত। তারপরেই তার দুঃখে অনুতাপে গ্লানিমুক্তি। বঙ্কিমের নায়িকাচরিত্রে হয়তো কখনো কখনো কিছু উচ্ছলতা, প্রগল্‌ভতা আছে (যথা:—ইন্দিরা, শান্তি, চঞ্চলকুমারী), কিন্তু তারা অবিচলভাবে ধর্মাসীনা; একমাত্র শৈবলিনী ব্যতিক্রম, তার ফলে তাকে কঠিন দুঃখ লাভ করতে হয়েছে—এমন কি অভিমানের আতিশয্যের ফলে ভ্রমরকে বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়েছেন। নৈতিক এবং দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা (sanctity) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি কল্পিত।

প্রাকৃতিক উপকরণে বঙ্কিমচন্দ্র, প্রধানতঃ বাঙালী। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' বাংলাদেশেরই বন্দনা: 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং' এই দেশ তাঁর জননী বঙ্গভূমি। কথা-সাহিত্যের মানবিক উপকরণরূপে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন স্বদেশগত, নীতিমূলক এবং ভারতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিষয়গুলিই নির্বাচন করে নিয়েছেন, তিনি প্রাকৃতিক উপকরণের ক্ষেত্রে মূলতঃ বাংলার গঙ্গানদী, বাংলার পল্লী, বাংলার আম-জাম-বট-অশথ, বাংলার অশোক-চাঁপা-বকুল-যূথী-মালতী তাঁর কাহিনীকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে রেখেছে।

কাহিনীর প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মথুরা বা দিল্লীতে পরিক্রমা করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে 'বাঙ্গালিত্বের উদ্গাতা' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বদেশকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করেছেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এমন সহজ গৌরবে তাঁর সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে যে, শিল্পি-ব্যক্তিত্বে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র যে একান্তভাবে বাঙালীই ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

॥ ২ ॥

উপন্যাসের উপকরণ প্রধানতঃ জীবন ও মানুষ, অন্যান্য সামগ্রী এরই অনুপূরক। একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও মানুষকে নির্বাচন, বিন্যাস এবং শিল্পায়ন; এরই দ্বারা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিশেষ বক্তব্য পরিস্ফুট এবং প্রমাণিত হয়; তাঁর ছোট বড় প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য থাকে, তারা গতানুগতিক বা অনুবৃত্তিমূলক হয় না।

এই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আজও ভারতীয় কথা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল সামাজিক চরিত্রাবলী তিনি রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কালভূমি এবং লোকক্ষেত্রের প্রসার বিপুল, ঐতিহাসিক যুগ থেকে মধ্যবিত্ত সমসাময়িক জীবন পর্যন্ত তার পরিধি। এই বিস্তৃত শিল্পজগতে বঙ্কিম চরিত্ররচনায় প্রায় সর্বত্রই সিদ্ধ-সাধক।

'চরিত্র-রচনা' কথাটি বিভ্রান্তিমূলক মনে হতে পারে। উপন্যাসের সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে। সুতরাং তাঁর ঘটনা বা 'চরিত্র'—রচিত হয়েও সত্যবৎ হ'তে বাধ্য, শিল্পী চরিত্র নির্মাণ করবেন তাঁর প্রতিভা দ্বারা, অথচ পাঠক তাদের মধ্যে বাস্তবসত্তার স্পর্শ লাভ করবে। সেই সৃষ্টি আলোকচিত্রসুলভ বা Photographic নয়, তাকে রক্তে-মাংসে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। এইভাবে কল্পনা ও সত্যের মধ্যে যিনি শিল্পের স্বর্ণ-সেতু নির্মাণ করবেন, তিনিই মহান্ শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র এই মহত্তোমহীয়ানদের একজন।

বাস্তব জীবনভূমি থেকে চরিত্র আহরণ ও কথাসাহিত্যে তার নব-রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি সার্থকতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন ও সামাজিক উপাদান-সমূহ জীবনকে কত ব্যাপকভাবে স্পর্শ করেছে, আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

প্রকৃতিও বঙ্কিমসাহিত্যে একটি বিশিষ্টরূপ লাভ করেছে। প্রাগ্ বঙ্কিম বাংলা-সাহিত্যে নিসর্গের উপস্থিতি ছিল। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতে, তারও আগে বৈদিক সাহিত্যে এবং পরবর্তী কালিদাস প্রমুখের রচনায় প্রকৃতি সর্বত্র। সংস্কৃত গীতগোবিন্দ বাঙালীর, গীতগোবিন্দ-এর প্রেমগাথায় প্রকৃতি ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে মিশে আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির আবির্ভাব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, মধুসূদন বিহারীলালেও সেই রোম্যান্টিক নিসর্গ।

বাংলা মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতি আছে পার্শ্বচরীর মত। কিন্তু মানুষের আবেগ, চিন্তা, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির যে নিবিড় একাত্মতা তার সূচনা দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্রই তার প্রথম সার্থক অনুসরণ। প্রাকৃতিক উপকরণ নির্বাচনে ও কথাসাহিত্যে তার ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট মানসিকতা ও কলাকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা উপন্যাসের প্রাকৃতিক উপাদানগুলির অন্যত্র বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

প্রত্যেক মহৎস্রষ্টার উপন্যাসে সংশ্লিষ্ট চরিত্রাবলী জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে নিসর্গের সঙ্গে আত্মীয়তা রচনা করে। জ্যোৎস্না, বর্ষণ, মধ্যরাত্রি, ক্ষুব্ধ সমুদ্র, ঝড়-দুর্যোগ, পাখির কাকলি, বনভূমি, পুষ্পসম্ভার ইত্যাদির সঙ্গে তার অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়—ফলে চরিত্রগুলি সেই বিশিষ্ট মানসিকতায় ব্যাপ্তি ও

ব্যঞ্জনা লাভ করে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে লেখক কাহিনীর দাবি অনুসারে পরিবেশ, পটভূমি রচনায় অথবা আলঙ্কারিক প্রয়োজনে গ্রহণ করেন। এই উপাদান চয়নের মধ্যে যেমন একদিকে তাঁর বিশেষ মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমনি উপাদানগুলির ব্যবহারের সুসংগতি ও সার্থকতার মধ্যে প্রকটিত হয় লেখকের রচনানৈপুণ্য। বিশ্বসাহিত্যের অনেক মহৎ স্রষ্টার মতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রকৃতির তিনটি উপাদান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়:

জলধারা, পুষ্পরাজি ও ঝড-বৃষ্টি-মেঘ। নদী ও পুষ্পোদ্যান বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ কাহিনী নদীসূত্রে গাঁথা, অনেকগুলি বিশিষ্ট চরিত্র পুষ্পোদ্যানে আসক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে কেবল নিসর্গসৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেননি; কাহিনীর সহায়করূপে এবং আলঙ্কারিক, মনস্তাত্ত্বিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেও প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুসরণে সেগুলি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

যে কোন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যের মত বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরচনাতেও প্রাকৃতিক উপকরণগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে:

১। পটভূমি নির্মাণে, ২। প্রতীকরূপে; ৩। সাদৃশ্যবিধানে, (আলঙ্কারিক প্রয়োজনে) ৪। পরিবেশ সহায়তায় (যথা: পর্বতে শৈবলিনীর উন্মত্ত পরিভ্রমণে ঝড়বৃষ্টি; কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের সাক্ষাতে সমুদ্রপট) ৫। বর্ণনার আনন্দে।

প্রথম পর্ব

বঙ্কিমসাহিত্যে সমাজ

ইতিহাসভিত্তিক, কিংবদন্তীনির্ভর অথবা বিশুদ্ধ রোম্যান্স-আশ্রয়ী কাহিনী রচনায় লেখকের প্রয়োজনীয় বিদ্যাবত্তা এবং কল্পনাশক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসের রচনায় তাঁর সুতীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞান, চতুষ্পার্শ্বের লোকসমাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও গভীর অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র (Representative character) নির্বাচনের কঠিনতর দায়িত্ব আসে। রোম্যান্স বা ইতিহাসের সুদূরতা তাঁকে সাহায্যে করে না। তাঁর কাহিনীর অবস্থান বিশ্বাস্যতার ভিত্তিভূমিতে। অতএব চরিত্র আহরণে তাঁকে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এইজন্য সার্থক সামাজিক উপন্যাসেই যে-কোন ঔপন্যাসিকের শক্তিপরীক্ষা হ'য়ে থাকে।

অদ্যাবধি ভারতবর্ষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, ইতিহাস-রোমান্স-সমাজ সর্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতম দীপ্তিবিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর রোম্যান্সের কেন্দ্রবর্তিনী মৃণালিনী, ইতিহাস-সম্ভবা জেব-উন্নিসা অথবা সমকালীন সমাজোদ্ভূত গোবিন্দলাল রায় প্রত্যেকেই সমান নৈপুণ্যে, সমান সাহিত্যিক সততায় রচিত। 'কপালকুণ্ডলা', 'রাজসিংহ' রচনা না ক'রেও 'বিষবৃক্ষ'—'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচয়িতাই অমরত্বের অধিকারী হ'তেন।

সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ উচ্চবিত্ত জীবনকেই আশ্রয় করেছেন—একথা সত্য। প্রায় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য শেষ পর্যন্ত আর্থিক সৌভাগ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে—যথা 'রাধারাণী,' 'রজনী', 'প্রফুল্ল'। দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত জীবন ও পরিবেশের চিত্রণ বঙ্কিমসাহিত্যে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণ, কাহিনীর মূল সমস্যার তারা অংশীভূত নয়। এ বিষয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে একটি অনুযোগ আজও বিদ্যমান।

সমাজমূলক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি ভাবনায় অনুপ্রাণিত। নর-নারীর হৃদ্‌গত সমস্যা—বিশেষভাবে প্রেম তাঁর প্রধানতঃ বিশ্লেষণের বিষয়; দ্বিতীয়তঃ

এই প্রণয়-প্রসঙ্গে সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণ ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ সংস্থাপনও তাঁর কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত।

উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যসাধনা 'Art for Art'—এই বাণী বঙ্কিমের কালে উচ্চারিত ছিল না, থাকলেও তিনি তাতে আকৃষ্ট হ'তেন কিনা সন্দেহ। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভাবেই ছিলেন স্বদেশ ও জাতির কল্যাণকামী—সেই লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখেই তিনি তাঁর চরিত্রাবলীর গতি ও পরিণতি নির্দেশ করেছেন। তা সর্বত্র শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা, সে বিচার অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচরিত্রগুলি জীবন্ত, সত্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষবৎ।

ধনী ভূস্বামী, তাঁদের অন্তঃপুরিকাবৃন্দ, আমলা-গোমস্তা-কর্মচারী, দাসদাসী, উচ্চচাকুরীজীবী, আইনব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বাঙালী যুবক, বালক-বালিকা, শিশু ; শঠ ও অসাধু ব্যক্তি, দুশ্চরিত্র সমাজশত্রু ; চিরন্তনী বাঙালী নারী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী, গ্রাম্য সাধারণ মানুষ, বিষবৈদ্য, কবিরাজ, ডাক্তার—সমাজের সর্বস্তরেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টি প্রসারিত। প্রতিটি চরিত্রকেই নৈপুণ্য এবং বাস্তবতার মণি-কাঞ্চনে গঠন করা হয়েছে, এক একটি নগণ্য চরিত্রও মাত্র দুটি একটি রেখায় আশ্চর্য ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। 'রজনী'র হীরালাল অথবা 'চাঁপা', 'দেবী-চৌধুরাণীর' 'নয়ান-বৌ' কিংবা 'গোবরার মা', 'ইন্দিরার' 'বামুনঠাকরুণ' কিংবা সুভাষিণীর শিশুপুত্র ইত্যাদি যে কোনো চরিত্রেই অনন্য ঔপন্যাসিকের সর্বব্যাপী মহিমা প্রকাশিত হয়েছে।

এই পর্যায়ী চরিত্রসমূহের পরিচয় দেওয়ার আগে একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ধনাঢ্য পরিবারই কায়স্থ-বংশীয়—কৃষ্ণকান্ত রায়, নগেন্দ্র দত্ত, রামসদয় মিত্র, হরমোহন দত্ত, রামরাম দত্ত—সর্বত্রই কায়স্থ পরিবারের কাহিনী। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে, বিশেষভাবে ইংরেজ-গঠিত কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে জমিদাররূপে ও দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, অ্যাটর্নি অথবা ব্যবহারজীবী ইত্যাদির ভূমিকায় প্রধানতঃ কায়স্থ-সম্প্রদায়ই ধনে মানে বিদ্যায় সমাজের শীর্ষভাগে ছিলেন—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ইত্যাদি বিদ্যায় তাঁদের প্রতি-যোগী হ'লেও, দু-একটি পরিবার ছাড়া অর্থমর্যাদায় তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নাটকে একজায়গায় বলা হয়েছে-

"তুমি তো কায়েতের ছেলে, তোমার আর ভাবনা কি, বিয়ে করলেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।"

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে তাই ক্ষত্রিয়বংশসম্ভব উচ্চবিত্ত কায়স্থপরিবারই বিশেষভাবে উপজীব্য হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে অতি সচ্ছল একটি একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন তার ফলে এই জাতীয় পরিবারের অন্তঃপুর একেবারে তাঁর নখদর্পণে। সাধারণতঃ পুরুষ-লেখক নারীমহলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কারণ এই অংশটি প্রায়শঃ তাঁদের অভিজ্ঞতার বাইরে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্তঃপুরের ঘোঁট এবং কোন্দল ইত্যাদি পরিচারিকাসমাজের সংসারের ভাঙ্গাগড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই জগতের একটি নিজস্ব বস্তুরূপ 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'ইন্দিরা'র বাসরঘরে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সম্ভবতঃ অনুরূপ কৃতিত্ব আর কোন বাঙালী পুরুষ-সাহিত্যিকই দাবি করতে পারেন না। এই কারণেই তাঁর শিশুচরিত্রগুলিও এত মনোজ্ঞ। প্রধানতঃ উচ্চবিত্ত জীবনের শিল্পী হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্র জীবনেরও সফল রূপকার। যদিও নিম্নবিত্ত-মুখ্য উপন্যাস তিনি একটিও রচনা করেননি, তবু প্রাসঙ্গিক ভাবে যখনই দরিদ্রজীবন উপস্থিত হয়েছে তখনই বঙ্কিমচন্দ্র জীবনশিল্পীর সততা তার মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন। রাধারাণী ও প্রফুল্লের দারিদ্র্য, হীরার বাড়ী অথবা ফুলবিক্রেতা রাজেন্দ্রের সংসার সবই প্রত্যক্ষবৎ। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষগুলো প্রয়োজনমত অতি স্বল্পরেখায় পরিস্ফুট হয়েছে। বিষবৃক্ষে হীরার আয়ি বুড়ি অথবা রোহিণীর গানের ওস্তাদজী, দেবী চৌধুরাণীর ফুলমণি নাপিতানি, গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী, অথবা পরিচারিকা গোবরার মা, এরা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

যে কোন মহান্ ঔপন্যাসিকই কেবল পাঠকের জন্য উপভোগ্য কাহিনী রচনা করেন না। তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁরা একটি জাতির সমাজ-জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে তোলেন। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসাবলীতে সমগ্র ইংরেজ জাতির, বিশেষ ক'রে লণ্ডনবাসীর জীবনচিত্র উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে এই কথা বলা হ'য়ে থাকে। ভিকতর

হিউগোর 'লে মিজ্‌রাবল্‌' ফরাসীদেশের সমস্ত দুঃখী এবং অভিশপ্ত মানুষের জীবনমহাকাব্য ; টলস্টয়ের 'আনে কারেনিনা' রুশীয় আভিজাত্যের এক বিপুল বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসসমূহও সমকালীন বাঙালী জীবনের একটি সমগ্র পরিচয়। যদিও সমাজের নেতৃস্থানীয় উচ্চবিত্ত পরিবার-সমূহকেই তিনি কাহিনীর কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংলাপে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। এইটি তৎকাল-প্রচলিত রীতিবিশেষ, এমনকি পরবর্তীকালের বাংলা নাটকেও অনেক সময় আমরা এইরকম মিশ্র সংলাপের সাক্ষাত পাই। কিন্তু ভাষাগত এই সামান্য অসতর্কতাটুকু বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চরিত্রগুলির সংলাপ সম্পূর্ণ যথাযথ। প্রত্যেকের নিজস্ব বাচনভঙ্গীকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত করেছেন—পরিমার্জিত হাস্যরসের সংযোগে এরা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ রাজসিংহের বিপুল ঐতিহাসিক মহিমা এবং কপালকুণ্ডলার কাব্যসুরভি ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশ ঘটেছে তাঁর সামাজিক উপন্যাসে, এবং এই কারণে বিষবৃক্ষে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ সূর্যোদয় এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সেই শক্তির মধ্যাহ্নদীপ্তি।

উচ্চবিত্ত পর্যায় :

সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য সম্পর্কে একটি অভিযোগ আছে, যে তিনি উচ্চবিত্ত জীবনের শিল্পী, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত জীবন এবং তার দুঃখ-বেদনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ক্বচিৎ রূপায়িত হয়েছে, বস্তুতঃ রাধারাণীর জীবনের স্বল্পাংশে এবং দেবীচৌধুরাণীর প্রথম পর্যায় ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যশিল্পে আমরা দুঃখ-দারিদ্র্যের কোন চিত্রণ দেখি না। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাস্তব দুঃখ-বেদনার রূপায়ণ হিসাবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এত বেশি সমাদৃত হয়েছে।

সন্দেহ নেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানভাবে উচ্চবিত্ত সমাজেরই রূপকার। তিনি নিজে সম্পন্ন পরিবারের সন্তান এবং স্বভাবতঃ তাঁর সমপর্যায়ী সমাজ ও সামাজিক মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্বাধিক জানতেন। যে কোন সত্যনিষ্ঠ শিল্পীর মত বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কল্পনা-বিলাসের পথে অগ্রসর হন নি। ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক বা কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে যেখানে কল্পনা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই, সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণ্য তথ্য-পঞ্জী যোগে তাঁর পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ রচনা করেছেন। সুমহান কবিদৃষ্টি ও শিল্পীসুলভ তৃতীয় নয়নের আলোকে তারা জীবন্তবৎ বিভাসিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলমগীরের অন্তঃপুর, দিল্লীর চাঁদনীচকে অথবা আনন্দারণ্যের সন্ন্যাসীআশ্রম স্মরণ করা যেতে পারে।

সমাজের উচ্চস্তরের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্রপাত্রীরা প্রধানভাবে এই পর্যায় থেকেই নেমে এসেছেন। এমনকি প্রথমে যারা দরিদ্র এবং দুর্ভাগ্যগ্রস্ত, পরবর্তীকালে তাদের অর্থসম্পদের অধিকারী অথবা অধিকারিণী হতে দেখা গিয়েছে। প্রফুল্ল, রাধারাণী এবং প্রতাপ রায়ই তার উদাহরণ। একমাত্র ব্যতিক্রমরূপে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে স্মরণ করা যায়। কিন্তু সেখানে এক বিচিত্র নারীর হৃদয়রহস্য, অলৌকিক শক্তির এক নিত্য-

বিরাজিত ছায়াসম্পাত এবং রোম্যান্সের বিস্ময়রস, তাকে স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা ঐশ্বর্যের দীপ্তিমুক্ত নয়—সেই দীপ্তি এসেছে দিল্লী আগ্রার সিংহাসন থেকে, মতিবিবির অলঙ্কারের ছটায়।

সাধারণভাবে, অভিজাত-চরিত্রের নরনারীর দোষগুণ, ভালমন্দ, আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা, মিলন, বিরহ এবং স্বাভাবিক অন্তরসংঘাত এইসব চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। নগেন্দ্র দত্তের মধ্যে যেমন হৃদয়বান জমিদারকে পাই, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকার সুযোগে তিনি কিভাবে কুন্দনন্দিনীকে জীবনে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর এবং সমগ্র অন্যায়কে অর্থের দ্বারা কিভাবে আচ্ছন্ন করতে সক্ষম তা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সুস্পষ্ট। দেবেন্দ্র দত্ত এবং হরলাল রায় দুই দিক থেকে জমিদারবংশের দুই অধঃপতিত সন্তান। আবার গোবিন্দলাল সমস্ত সৎগুণের অধিকারী হয়েও মাত্র রূপলালসার তাড়নাতেই নয়, অভিজাতসুলভ অভিমানে উপন্যাসের পরিণামকে অনিবার্যতায় নিয়ে গিয়েছেন।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ এবং শচীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে সংযত আভিজাত্য ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাই, তা গোবিন্দলালের মত অত্যুচ্ছ্বাসিত নয়, কিন্তু হৃদয়বত্তায় তা তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠারই যোগ্য। বাংলাদেশের প্রাচীন জমিদারপরিবারে যে শৌর্যবীর্যের চর্চা ছিল তার সার্থক উদাহরণ ব্রজেশ্বর রায়। আবার অপরপক্ষে ভূম্যধিকারীদের অর্থলোলুপতা ও নীচতার পরিচয় হরবল্লভই বহন করেছেন। প্রধান প্রধান নারীচরিত্রগুলির মধ্যেও উচ্চশ্রেণীর মানসবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। মৃণালিনী এবং তিলোত্তমা ঐশ্বর্যলালিতা, সুকুমার, সুকোমল নারীর প্রতিরূপ। অভিজাতনন্দিনীর আত্মমর্যাদাবোধ দীপ্ত হয়েছে সূর্যমুখীতে, ভ্রমরে, এমন কি কৌতুকোচ্ছলা সুভাষিণী এবং ইন্দিরার মধ্যেও। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নায়িকানির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকসময়ই অন্যতর সমাজিকস্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। রজনী (যদিও পরে ঐশ্বর্যবতী), শৈবলিনী, প্রফুল্ল (ইনিও পরে প্রভূত অর্থের অধিকারিণী), কপালকুণ্ডলা এবং মনোরমা দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারসম্ভূতা। নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটি বৈপরীত্য রচনা করে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন। রজনী অথবা কুন্দনন্দিনী, বিপন্না বলেই শচীন্দ্র এবং নগেন্দ্রের মমতা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর এবং কপালকুণ্ডলার বক্তব্য

সম্পূর্ণ আলাদা, এই দুটি উপন্যাসে সামাজিক পরিবেশের বিশিষ্ট প্রভাবের চাইতেও একটি প্রেমোন্মাদিনী নারী এবং একটি বনতনয়া বৈরাগিণীর মানসচিত্র উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর মনোযোগী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে সেইজন্যই অভিজাত পরিবারের নর-নারী আমাদের প্রথম ও প্রধান আলোচিতব্য। এই চরিত্রগুলি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের পরিচয় সর্বাগ্রে গ্রহণ করা যাক।

নায়ক

হেমচন্দ্র

'মৃণালিনী' উপন্যাসে নায়ক মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী তাঁর পিতৃরাজ্যাহরণকারী। স্বরাজ্য উদ্ধারের কঠিন সঙ্কল্পে হেমচন্দ্র ব্রতী। এ ব্রতে অনুপ্রেরণাদাতৃ তাঁরই গুরু সন্ন্যাসী মাধবাচার্য। মাধবাচার্য সন্ন্যাসী হলেও তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা ও গৌরবরক্ষা। মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুর রণঅভিযান—উপন্যাসের এই দৃশ্যমান সূত্রটির অন্তর্লীন ধারা হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমের বিঘ্নসংঘাত। দুটি ধারারই সূত্রধারক মাধবাচার্য। হেমচন্দ্রের রণোদ্যমকে উদ্দীপিত ও দুর্বার প্রণয়াবেগকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনি। স্বদেশানুরাগে ও মৃণালিনীর প্রতি প্রেমে উভয় ক্ষেত্রেই হেমচন্দ্র তীব্র নিষ্ঠাবান; কিন্তু মৃণালিনীর আকর্ষণ রাজপুত্রের জীবনে স্বদেশের অপেক্ষাও অধিক। সেই ভয়েই মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের মনের দ্বিমুখী ধারাকে একমুখে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁর দ্বারা বখ্‌তিয়ারের হাত থেকে গৌড়রক্ষার সঙ্কল্প করেছিলেন। তাই ব্রত সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত হেমচন্দ্রের বিঘ্নকারিণী মৃণালিনীকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজন বোধ করেছেন মাধবাচার্য, আর নায়ক-নায়িকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাবেগ এবং মিলনপ্রয়াস কাহিনীর নাট্যাংশকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

পশুপতি

'মৃণালিনী' উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক পশুপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকার। মুসলিম আক্রমণের কালে হিন্দু রাজপুরুষেরা কিভাবে প্রলুব্ধ হয়ে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন এবং পরিণামে অনেকেই কিভাবে সে ভুলের দুঃখকর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, পশুপতি তারই প্রতীক। শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য—কিছুরই তার অভাব নেই, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা ও দেশদ্রোহিতা কেমন করে মৃত্যুবাণের মত সংশ্লিষ্ট চরিত্রেরই বক্ষবিদ্ধ করে, পশুপতির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। এই চরিত্র ঐতিহাসিক নয়, অন্ততঃ ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু চরিত্রটি ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার গুন বহন করে, কারণ ভারতের ইতিহাসে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতক স্বদেশশত্রুর কোন অভাব নেই; এবং পুরস্কারস্বরূপ পশুপতি যা পেয়েছেন, তাও তার কর্মফলেরই সম্পূর্ণ উপযোগী।

মাত্র বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারীরূপেই নয়, পশুপতি এবং মনোরমাকে নিয়ে 'মৃণালিনী উপন্যাসে আর একটি শাখাকাহিনী বিস্তার করা হয়েছে। এই কাহিনীটিকে খুব স্পষ্ট করা হয় নি, কিন্তু উপন্যাসের শেষাংশে সমাপ্তির আপেক্ষিক লঘুত্বের উপর এই অংশটি ট্র্যাজিডির একটি বিষাদগম্ভীর সৌন্দর্যবিস্তার করে দিয়েছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অংশটিতে পশুপতির ভূমিকা উল্লেখ্য নয়. মনোরমা নামে সেই প্রহেলিকাময় নারীটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

নগেন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের প্রত্যেক নায়কই জমিদার অথবা সঙ্গতিপন্ন, একমাত্র কপালকুণ্ডলার নবকুমার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। যদিও ('কপালকুণ্ডলা'কে সামাজিক কাহিনী বলা যায় না)। 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্র দত্ত জমিদার। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' গোবিন্দলাল রায় অথবা 'রজনী'র শচীন্দ্রের ন্যায় তিনি রূপবান, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান এবং সচ্চরিত্র। কিন্তু গোবিন্দলালের মতো, তাঁরও জীবনে এসেছে রূপোন্মাদ। এসেছে চিত্তবৃত্তির সুকঠিন পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, আত্মযন্ত্রণায় ও মানসদ্বন্দ্বে জর্জরিত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কুন্দনন্দিনীর সকরুণ মৃত্যুতে তাঁর পরম দুঃখময় ভ্রান্তিনিরাস ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চরিত্র তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র যেন দেখাতে চেয়েছেন, মাত্র শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই হয় না, চরিত্র-গঠনও আবশ্যক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালীন গোষ্ঠীর মধ্যে এই চরিত্রশক্তিরই অভাব দেখিয়েছিলেন। নগেন্দ্রের ভ্রান্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-চন্দ্র যুবসমাজকে পথ দেখাতে চেয়েছেন ও 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে চেয়েছেন।

সমস্ত শিক্ষার ঊর্ধ্বে ইন্দ্রিয়সংযম। তার অভাবে কোন্ সর্বনাশা পরিণতি ঘটতে পারে, নগেন্দ্রের মাধ্যমে সেইটিই অভিব্যক্ত।

দেবেন্দ্র দত্ত

দেবেন্দ্র দত্ত 'বিষবৃক্ষের' দ্বিতীয় প্রধান পুরুষ চরিত্র। ইনিও পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার নগেন্দ্রের জ্ঞাতি। নগেন্দ্রে যদি শিক্ষিত ও রুচিমান জমিদার চরিত্র প্রকটিত হয়ে থাকে, তা হলে এই সম্প্রদায়ের আর একটি চিরাচরিত রূপলুব্ধ—মদ্যপ, লম্পট ও বিবেকবর্জিত অমানুষদের প্রতিনিধি হলেন দেবেন্দ্রনাথ। একই উপন্যাসে এই দুই চরিত্রকে পাশাপাশি স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র আলোক-প্রাপ্ত ভূস্বামীসম্প্রদায় এবং দুর্নীতিগ্রস্ত জমিদারদের দ্বৈতস্বরূপ তুলে ধরেছেন। দেবেন্দ্র নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না, নানা বিষয়ে পটুত্বও তাঁর ছিল। কিন্তু সুরা ও লাম্পট্যের ফলে এই চরিত্রটি কিভাবে নরকের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে তা বিষবৃক্ষ থেকেই আমরা দেখতে পাই।

অবশ্য শিল্পী বঙ্কিম চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ 'পাষণ্ড' করে গড়েন নি। কূটভাষিণী স্ত্রী হৈমবতীর জন্যই যে একদা সুশীল দেবেন্দ্রদের আজ এই শোচনীয় অধঃ-পতন তাও কাহিনীতে বলা হয়েছে। এইজন্যই শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রের ভয়াল পরিণামে আমরা কিছু সমবেদনা বোধ করি।

দেবেন্দ্রনাথকে 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র ছদ্মবেশে সাজিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে অতিরিক্ত কিছু নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন।

পুরন্দর

যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের নায়ক শ্রেষ্ঠিপুত্র পুরন্দর মধ্যযুগীয় বাঙালীর একটি

পরিচয় বহন করছে। মাতাপিতৃভক্ত, দৈববিশ্বাসী, সৎ ও সংযত, দুঃখে অবিচল, বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদধন্য এই চরিত্রটির প্রেম, অভিমান ও দুঃখবরণ এবং হিরন্ময়ী ও পুরন্দরের মিলনের মধ্যবর্তী জটিলতা পুরন্দরকে যেন কোন বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ রোম্যান্সের নায়কত্ব দিয়েছে। ব্যক্তিমানুষ হিসাবে বা কোন বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিনিধিরূপে পুরন্দর চরিত্রের কোন গুরুত্ব নেই। 'যুগলাঙ্গুরীয়, যেন কোন সুবৃহৎ উপন্যাসের খসড়া, পুরন্দরও চরিত্রের চিত্ররূপ না হয়ে কয়েকটি রেখাবিন্যাস মাত্র। হিরন্ময়ী এবং পুরন্দরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত বিবাহিত জীবন প্রসঙ্গে শ্রী-সীতারাম ও মনোরমা-পশুপতির সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে।

প্রতাপ

গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র দত্ত, ভবানন্দ অথবা সীতারাম, সমাজের যে স্তরের চরিত্রই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে বহুগুণে গুণান্বিত হয়েও এইসব মানুষ একটিমাত্র অপরাধে আত্মনাশের পথে অগ্রসর হয়েছেন। সেই অপরাধটি হল চারিত্রিক অসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম এবং বাউলসাধনার লীলাভূমি এই বাংলাদেশে, আদিরসের স্বভাবপ্রাবল্যে বাঙালী প্রায়শঃ ইন্দ্রিয়সংযমনে অপারগ। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু প্রধান চরিত্র এই অপরাধে অভিশপ্ত হয়েছেন সত্য কিন্তু এরই মধ্যে আত্মসংযমে এবং ইন্দ্রিয়দমনে 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ এক মহৎ মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ, বঙ্কিমের বাঞ্ছিত সমস্তগুণে ভূষিত বাঙালী যুবকের আদর্শ চরিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস সংস্কার অনুযায়ী বাঙালী যুবকের মনোগঠন কি হওয়া উচিত, প্রতাপের মধ্য দিয়েই যেন তা নির্দেশিত হয়েছে। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসেন না তা নয়, কিন্তু সামাজিকভাবে যে অপ্রাপণীয়া, তাকে তিনি বিষকন্যাবৎ পরিহার করেছেন। আবার আপৎকালে শৈবলিনীর উদ্ধারকর্তার ভূমিকাও তাঁকেই নিতে হয়েছে। প্রতাপের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র হীনতা অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। যখন তিনি জেনেছেন, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন শৈবলিনীর মনানল নির্বাপিত হবে না, তখনই তিনি বীরমৃত্যু বরণ করে শৈবলিনীর উদগ্র হৃদয়াবেগ এবং নিজের অন্তরযন্ত্রণার চির-সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মাত্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেই নয়, সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যেই

প্রতাপের মত চরিত্র বিরল। শুধু আদর্শ দিয়ে গঠিত হলে এর মূল্য খুব বেশী হত না, কিন্তু মানবিক রক্তস্পন্দনের সঙ্গে সমুচ্চ মনুষ্যত্ব মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে তার শ্রেষ্ঠ নায়ক তথা শ্রেষ্ঠ বাঙালী যুবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রুক্মিণীকুমার

রুক্মিণীকুমার অর্থাৎ দেবেন্দ্রনারায়ণের মধ্য দিয়ে একজন হৃদয়বান জমিদারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে চরিত্রটি একেবারে রূপকথার নায়কের মত, অবাস্তব কাহিনীর সর্বগুণান্বিত রাজকুমার,—রাজকুমারী যাকে স্বপ্নে দেখে মালা নিয়ে অপেক্ষা করে।

রুক্মিণীকুমারের ছদ্মনামে মানবদরদী রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ষণমুখর এক রথের মেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন অসাধারণ রাধারাণীকে। দরিদ্র মায়ের পথ্য সংস্থানের আশায় একমাত্র মূলধন একছড়া বনফুলের মালাকে কেন্দ্র করে বালিকা রাধারাণী আর রুক্মিণীকুমার পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয়ে মুগ্ধ হলেন। তারপর একদিকে দেবেন্দ্রনারায়ণের বর্ষারাতের সেই দরিদ্র বালিকার জন্য মমতা আর প্রণয়প্রতীক্ষা, আর ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিতা হলেও রাধারাণীর ধ্যানের আসনে অধিষ্ঠিত রইলেন রুক্মিণীকুমারই।

অমরনাথ

অভিজাত বুদ্ধিজীবী অমরনাথ তৎকালীন সম্ভ্রান্তবংশীয় ঐশ্বর্যলালিত অনেক তরুণের মত বিদ্যাব্যসনী। তাঁর প্রণয় প্রথম যৌবনের অসংযত আকাঙ্ক্ষায় ভ্রান্ত পথে চলেছিল। লবঙ্গলতা বালিকাসুলভ চাপল্যে প্রণয়ীর দেহে নিষ্ঠুর কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিলেন। তারপরে এই মহৎপ্রাণ তরুণের যৌবনের উন্মাদনার পরিসমাপ্তি, জীবনব্যাপী অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্তও। স্বাভাবিক দার্শনিক মননস্পৃহা অমরনাথকে সহজেই সংসারবিরাগী করেছে, তাই গোবিন্দলালের মত তাঁকে সন্ন্যাসী হতে হয় নি। পরোপচিকীর্ষাব্রতকেই জীবনের অবলম্বনস্বরূপ অমরনাথ গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্রতচারণার পথেই দেখা দিল অন্ধরজনী, তার অসীম রূপলাবণ্য আর অপরিসীম হৃদয়মাধুর্য নিয়ে। আরেকবার তিনি সংসারের স্বপ্ন দেখলেন।

কিন্তু অমরনাথের সাংসারিক মোহের শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হয়েছে রজনীর প্রতি তাঁর ব্যর্থ বাসনায় ছুরিকায়। তারপর তাঁর পথ সন্ন্যাসের শান্ত ধূসর নিরাসক্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মধ্যেই যেন এক উদাসীন অর্ধসন্ন্যাসী বাস করত—তাঁর কমলাকান্ত সেই সত্তার প্রকাশ। তাই তাঁর উপন্যাসে বারে বারে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, প্রতাপের সন্ন্যাসীসুলভ আত্মদান। প্রফুল্লর গৃহাঙ্গনেও তাপসীমূর্তি, চন্দ্রশেখরের সৌম্য প্রজ্ঞাজীবিতা এবং অমরনাথের সন্ন্যাস সেই একই মনোভঙ্গীকে নির্দেশ করছে।

অমরনাথ মনে করিয়ে দেয় 'শেষের কবিতা'র শোভনলালকে। অমিত বলেছিল—

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর জীবনের মধ্যে কোনখানে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খুইয়ে দিতে চায়!"১

স্বাভাবিক নিরাসক্ত অমরনাথকে এমনি একটি রক্তক্ষরা ক্ষতই হয়ত কখনও স্থির হতে দেয়নি।

শচীন্দ্রনাথ

জমিদার রামসদয় মিত্রের কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক। তিনি উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান ও রূপবান পুরুষ। প্রচলিত রীতিতে নায়কোচিত সর্ববিধ গুণপনাই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তৎকালীন সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিতের মত শচীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে যুক্তিশীল।

রজনীর প্রতি তাঁর স্বভাব-মমতাশীল হৃদয়ের যে অনুকম্পা, তা তাঁর অবচেতনসত্তায় প্রেমের বীজ বপন করতে পারত। কিন্তু সামাজিক অবস্থার তারতম্যে এবং রুচিমান ও সচ্চরিত্র শচীন্দ্রের চেতনলোকে তা কখনোই প্রকটিত হত না। এই গূঢ় অন্তর্নিহিত অনুরাগকে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা শচীন্দ্রের আকাঙ্ক্ষালোকে উত্তীর্ণ করিয়েছেন। এর মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা অবশ্যই আছে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সত্যও অনুপস্থিত নয়।

১। 'শেষের কবিতা': রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুশীলিত-মানস শচীন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকতায় প্রত্যয়ী করলেন কেন? তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় শিক্ষায় যথোচিত পারঙ্গম হয়েও ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন এবং তার অতিলৌকিক শক্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাই তাঁর নায়ককে তিনি বস্তুসর্বস্ব পাশ্চাত্যজ্ঞানের অহমিকা থেকে উদ্ধার করে ভারতীয় বিশ্বাসে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। শচীন্দ্র এবং অমরনাথকে একত্র মিলিয়ে যেন বঙ্কিমচন্দ্র এখানে একটি আদর্শ নায়কের রূপায়ণ করেছেন।

গোবিন্দলাল

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অভিশপ্ত নায়ক গোবিন্দলাল বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। গোবিন্দলাল পরমরূপবান, শিক্ষিত, হৃদয়বান, পত্নীবৎসল, সচ্চরিত্র পুরুষ। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে'র হীরার যে সুপ্ত রূপতৃষ্ণা পরিশেষে তার চরম সর্বনাশ ঘটালো, গোবিন্দলালের মধ্যেও অনুরূপ একটি মৃত্যুছিদ্র বিদ্যমান ছিল। তাঁর পত্নী ভ্রমর গুণবতী—সর্বাংশে তাঁর যোগ্যা সহধর্মিণী, কিন্তু "ভোমরা কালো"—কন্দর্পপ্রতিম গোবিন্দলালের অন্তরে যে সৌন্দর্যের উপাসনা চলত (যার অভিব্যক্তি বারুণীর তীরস্থ মনোহর উদ্যান)—ভ্রমর সেই উপাস্যা দেবীর আসন নিতে পারেনি। তার পরিবর্তে উইলের নিষ্ঠুর পরিহাসে এবং ঘটনাচক্রের আবর্তনে গোবিন্দলালের হৃদয়লোকে আসীনা হয়েছে রূপসী উপদেবী রোহিণী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তার ট্রাজিক পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

গোবিন্দলালের যেমন সংযত চরিত্র একটি মানুষের পতনের ইতিহাস, তেমনি সেই দুর্ভাগ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানও উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে। দুই নারীহত্যার (ভ্রমর ও রোহিণী) পাপে গোবিন্দলাল যতখানি দণ্ড পেতে পারতেন আইনের কাছে, তার শতগুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন অনুতাপ ও গ্লানির অগ্নিদহনে—পরিশেষে সন্ন্যাসীরূপে যেন আত্মিক নবোত্থান (Resurrection) ঘটেছে। গোবিন্দলালের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একসঙ্গে মহৎ মানুষের ভ্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ যেন একই সঙ্গে নির্দেশ করে দিয়েছেন।

জমিদারপুত্রেরা কখনও অপদার্থ, বিলাসী এবং চরম দুর্নীতিপরায়ণ হয়,

যথা দেবেন্দ্র দত্ত, যথা হরলাল। আবার কেউ কেউ শিক্ষা, দীক্ষা, মাহুষ্যত্বে আদর্শরূপে প্রতিভাত হন—যেমন নগেন্দ্র দত্ত, যেমন গোবিন্দলাল রায়। কিন্তু সকলেই মানবিক ভ্রান্তির অধীন—প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলালের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন—উভয়ের প্রায়শ্চিত্তে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

মহেন্দ্র সিংহ

পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার, প্রচুর ভূ-সম্পদ এবং ধনরত্নের অধিপতি হয়েও পঞ্চাশের মন্বন্তরে ভার্যা কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীসহ গৃহছাড়া। পথে দস্যুহস্তে পত্নীবিচ্ছেদ, তারপর ঘটনাচক্রে উভয়েরই আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের সাহায্যে আশ্রয়লাভ। কল্যাণী গৃহান্তরে স্থাপিতা হলেন, মহেন্দ্র আনন্দমঠে স্থান পেলেন।

মহেন্দ্র সিংহ বীর ও বিবেচক। আবেগের বশীভূত নন—সন্ন্যাসীদের দস্যুবৃত্তি দেখে তিনি সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা নিতে দ্বিধা করেছেন—কোম্পানীর সিপাহীশালা'র যে অন্যায় তা নিয়ে তর্ক তুলেছেন। পরে 'মাতৃমূর্তি' দর্শনে ক্রমশঃ তাঁর মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে দেশসেবায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বীর এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মহেন্দ্রসিংহ 'আনন্দমঠের' একটি উজ্জ্বল, ঋজু, চরিত্র। দেশব্রতী বটেন, কিন্তু স্ত্রী-কন্যা সম্পর্কে তিনি সদা-সজাগ, তাঁর অন্তরে একটি পত্নীবৎসল স্বামী এবং সন্তান বৎসল পিতার নিয়ত উপস্থিতি। অন্যদিকে তাঁর অসীম শৌর্য ও কৌশলেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে সন্তানসেনা বিজয়ী হয়েছে। প্রাচীন বাংলাদেশের বীরহৃদয় অথচ স্নেহমমতা-পূর্ণ সুবিবেচক একটি জমিদার সন্তানরূপে মহেন্দ্রসিংহ আনন্দমঠ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছেন।

ব্রজেশ্বর

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে নায়কের ভূমিকা মুখ্য নয়—এই কাহিনীতে নায়িকা এবং স্ত্রীচরিত্রেরই প্রাধান্য। প্রফুল্লের আত্মোন্নয়ন এবং পরিশেষে গীতার

নিষ্কাম কর্মযোগে দীক্ষালাভ করে অনাসক্ত সেবাব্রতিনীরূপে গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃপ্রবেশ, উপন্যাসের বক্তব্য এইটিই।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর স্বামী। নয়ান বৌ এবং সাগর বৌ নামে তাঁর আরও দুটি পত্নী বিদ্যমান। কুলীনসন্তান ব্রজেশ্বর এ ব্যাপারে নির্বিকার। প্রফুল্ল সম্পর্কে তাঁর অনুকম্পা এবং প্রেম যদি কিয়ৎ পরিমাণে থাকেও, মূলতঃ তিনি রামচন্দ্রের মতই পরম পিতৃভক্ত পুত্র। বিনাদোষে প্রফুল্লকে বিতাড়িত করবার সময় ব্রজেশ্বর রুদ্ধ নেত্রে শাস্ত্রবাক্য জপ করেন: "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমন্তপঃ।" বলা নিষ্প্রয়োজন, এই অংশে তাঁর পিতৃভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, বরং সুবিধাবাদী কাপুরুষকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রঙ্গরাজের দস্যুদলের হাতে বন্দী হওয়ার সময় ব্রজেশ্বরের পৌরুষ কিছুটা অভিব্যক্ত হয়। তাঁর চরিত্রের স্বাধীনতা ও তেজ সর্বাধিক প্রকটিত হয়েছে —দেবীরাণীর বজরায়—পিতার মেরুদণ্ডহীন ইংরেজদাস্যতার পটভূমিতে। সেই-খানেই যেন তিনি সিংহের মত গর্জন করে উঠেছেন।

সাধারণভাবে ব্রজেশ্বর সচ্চরিত্র, তেজস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ যে কোন প্রথাসিদ্ধ নায়কের গুণাবলীসম্পন্ন। কিন্তু সাগর-বৌ-এর পদ-সংবাহনে এবং অন্যান্য সরস পরিবেশে তাঁকে নিয়ে যে বাসর-ঘর জাতীয় কৌতুক ও কৌতূহল রচনা করা হয়েছে, তাতে এই চরিত্রটিকে অনেকখানি নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

উপেনবাবু

'ইন্দিরা' উপন্যাসের নায়ক উপেন্দ্রনাথ চরিত্র হিসাবে যে কোন সাধারণ বাঙালী যুবকমাত্র। বিবাহের পর ইন্দিরার পিতার বিদ্রূপে তাঁর পৌরুষের উদ্বোধন, কর্মজীবনে প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ। তারপর ইন্দিরার ভাগ্যবিপর্যয়; দস্যুর হাতে পতন, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় সুভাষিণীর সহৃদয়তায় দত্ত পরিবারে আশ্রয়লাভ ঘটলে বিচিত্র অবস্থায় পত্নীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার।

এই অংশে উপেন্দ্রকে নিয়ে ইন্দিরার যে অভিনয়, তাতে ইন্দিরার অন্তর-বেদনাই মুখ্য, উপেন্দ্রের পরিচয় সেখানে খুব গৌরবজনক নয়। তিনি পরস্ত্রী-লোলুপ এবং ধর্মবোধবর্জিত। ইন্দিরা সঙ্কল্প করেছে, "যদি দিন পাই, এ রোগ তাঁহার ছাড়াইব।"

ক্রমে ইন্দিরার প্রতি উপেন্দ্রের লালসা প্রেমে পরিণত হয়েছে। তখন 'কুমুদিনী' ব্যতিরেকে তাঁর জীবন অকল্পনীয়—

"বলিব, এ ইন্দিরা, দত্তবাড়ীতে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"[২] এইখানেই উপেন্দ্রের চরিত্রে কিছুটা সৌন্দর্যের আভা পড়েছে।

উপেন্দ্রনাথ সাধারণ বাঙালী যুবক, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু নৈতিকতার বোধ তত উজ্জ্বল নয়, শাণিতরসনা শ্যালিকাদের বিদ্রূপোপযোগী কিঞ্চিৎ স্থূলমস্তিষ্ক। চরিত্রটি স্বাভাবিক এবং শিল্পসম্মত।

মুচিরাম গুড়

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য সমাজ-ব্যঙ্গ। মুচিরাম গুড়ের 'জীবন-চরিত' কাহিনীর নামপুরুষ। কোনও এক কৈবর্তের ব্রাহ্মণ দরিদ্র সফলরাম গুড়ের মূর্খ সন্তান। গুণ মাত্র তিনটি। সুকণ্ঠ, হাতের লেখাটি পরিপাটি এবং তোষামোদে সুনিপুণ। এরই ফলে যাত্রার দলের গায়ক বালক ক্রমশঃ পেশকার, তারপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অতঃপর জমিদার এবং মীনওয়েল সাহেবের অনবদ্য বাংলা জ্ঞানের প্রভাবে পরিশেষে 'রায়বাহাদুর'—শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্।'

যদিও মুচিরামের 'রায়বাহাদুরত্ব' লাভ পর্যন্ত কাহিনীর পরিণতি, তা হলেও চরিত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য—তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শায়ক-বর্ষণ। বিদ্বান, বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলেই উক্ত রাজপদ অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালে প্রায়ই এই পদ পূর্ণ হ'ত ইংরেজ বড়কর্তাদের মনোনয়নে। স্তুতিবাদ এবং পদলেহনই ছিল মাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি। এই কারণে সেকালের ডেপুটিরা রসিক লেখকের হাতে প্রায়ই বিদ্রূপের উপকরণে পরিণত হয়েছেন।—দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে 'ঘটিরাম ডেপুটি' ক্ল্যাসিক হয়ে আছেন। পেশকারীর কামধেনু পরিত্যাগ করে ডেপুটিত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মুচিরামের ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেন দেখিয়েছেন—মূর্খ, লোভী এবং তস্করের পক্ষে ডেপুটিগিরিই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ দায়িত্ব।

মাত্র তোষামোদই যে ইহসংসারে উন্নতির সোপান, মুচিরামের মধ্য দিয়ে

২। ইন্দিরা ১৮ শ পরিচ্ছেদ।

সেইটিই প্রমাণিত। কোর্ট কাছারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে আলোক-চিত্রের বাস্তবতায় মুচিরাম গুড়ের অভ্যুত্থান কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং সেই সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষ ও সামাজিক পরিবেশ অতি নিপুণতায় চিত্রিত হয়েছে।

যিনি "মানময়ী রাধে একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও" এই গান গেয়ে যাত্রা পণ্ড করতে পারেন, তাঁর রায় রাজাবাহাদুরত্বের শীর্ষশিখরে আরোহণ সমাজ-জীবনের রীতিপদ্ধতির হাস্যকর অসঙ্গতি সম্পর্কেও এক ব্যঙ্গশাণিত অপূর্ব প্রতিবাদ।

নায়িকা

তিলোত্তমা

প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রথম নাম 'তিলোত্তমা'র। ইনি গড়মান্দারণের দুর্গাধিপ বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা। এই দুর্যোগের সন্ধ্যা, প্রবল ঝঞ্ঝাবৃষ্টির পরিবেশ শৈলেশ্বরের মন্দিরে নায়ক জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার, পূর্বরাগ এবং পরে কাহিনীগত পরিণামে মিলন, তিলোত্তমা ষোড়শী এবং রূপবতী, বিমলার স্নেহে যত্নে লালিতা ও পরিবর্ধিতা। একটি স্বভাবজাত ব্রীড়া এবং সুকুমার ভীরুতা এই কিশোরীটিকে অর্ধবিকশিত কলিকার মাধুর্যে মণ্ডিত করে রেখেছে, অথচ প্রয়োজনক্ষেত্রে দুঃখ এবং ত্যাগবরণের শক্তিও তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। কতলু খাঁকে হত্যার রাত্রে বিমলার অতিসজ্জা তিলোত্তমার আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়েছিল (দুর্গেশনন্দিনী ২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ)। সেখানে তার ধমনীতে নির্ভীক রাজপুত বীরেন্দ্রসিংহের শোণিত-স্পন্দন অনুভব করা যায়। রাজপরিবারের স্নেহক্রোড়ে পরিবর্ধিতা শান্ত সুকোমল চরিত্রের তিলোত্তমা যেন গৃহেকপোতী বাঙালী কিশোরীরই সৌন্দর্য-প্রতিমা।

আয়েষা

আয়েষা 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সহনায়িকা। বাংলার পাঠান নবাব কতলু খাঁর দুহিতা। এই নারীটিও তরুণী, রূপসী এবং গুণবতী। আয়েষা নারীমহত্ত্বের প্রতিমূর্তি—আভিজাত্যসুলভ ন্যায়পরায়ণতায় সে পিতৃপ্রতিদ্বন্দ্বী অরাতি জগৎসিংহকেও সেবা করেছে, তিলোত্তমার দুঃখমোচনে প্রয়াসী হয়েছে আয়েষার হৃদয়-বিস্তার নবাবনন্দিনীরই উপযোগী। ধর্মসংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি বিধর্মী এবং শত্রু জগৎসিংহকে ভালোবেসেছেন, আবার তিলোত্তমার সুখের জন্য অবলীলাক্রমে আত্মত্যাগ করেছেন। এই আত্ম-শক্তির বলেই স্ব-হননের দুর্বলতা থেকে উত্তীর্ণা হয়েছেন তিনি, কারণ আয়েষা বঙ্কিমের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিতা। 'জীবন নিজের জন্য নয় পরার্থে;' এই পরোহিতব্রতী প্রাণকে বিসর্জন দেবার অধিকার তাঁর নেই।

আয়েষা নবাবকন্যাসুলভ সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারিণী এবং বঙ্কিমসাহিত্যে মহিমময়ী রমণীদের অন্যতমা।

মতিবিবি (পদ্মাবতী)

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক নবকুমারের প্রথমা পত্নী। অবস্থাচক্রে তিনি মুসলিমধর্মে দীক্ষিতা হন, তাঁর পরিবর্তিত নাম হয় লুৎফউন্নিসা, মতিবিবিরূপেই তিনি পরিচিতা হন। আগ্রার সম্রাটভবনে তাঁর স্থানলাভ ঘটে, যুবরাজ সেলিমের প্রেমের ক্ষেত্রে মেহের-উন্নিসার প্রতিযোগিনী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে পূর্বস্বামী নবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলে লুৎফ-উন্নিসার চিত্তবৃত্তি তাঁর দিকে ধাবিত হয়। নবকুমার ধর্মপরিত্যক্তা পত্নীকে পুনর্গ্রহণ করবেন না জেনেও চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, অসংযম ও জেদের তাড়নায় এবং চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসের গ্লানিতে ক্লান্ত হয়ে তিনি স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আশায় নানা চক্রান্তজাল বিস্তার করতে থাকেন।

পদ্মাবতীর চরিত্রে যে বাল্যাবধি একটা প্রবল ঔদ্ধত্য ছিল—তার পরিচয় উত্তরকালেও পরিস্ফুট কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই নারীটির সাহায্যে অন্যবিধ উদ্দেশ্যও সাধন করতে চেয়েছেন। নিছক বিলাস-ভোগে আত্মার ক্ষুধা মেটে না, বঞ্চিত নারীত্ব একটি সহজ সুন্দর পারিবারিক জীবনের অমৃত-স্বাদ কামনা

করে, তখন রাণীর ঐশ্বর্য ছেড়ে 'কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী' হওয়ার সাধ যায়, তখন 'পাষাণে অগ্নিপ্রবেশ' করে। এই চরিত্রে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—কোন ভ্রান্ত পথযাত্রিণী রমণী যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরে এসে স্বামীর আশ্রয় কামনা করে, তবে সমাজকে অস্বীকার করে সে আশ্রয় তাকে কি দেওয়া সম্ভব ?

মতিবিবি চরিত্রটি বাস্তব-সম্ভূত। কাঁটাপাড়া অঞ্চলের এক কুলত্যাগিনী দুর্ভাগিণী গ্রামে ফিরে এসে স্বামীর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন সেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথের ধারে একটি বাড়ি তৈরী করে সেখানে বসে থাকত এবং প্রতিদিন স্নানার্থী স্বামীকে দেখতে পেত। এই মেয়েটির ইতিবৃত্ত অগ্রজ সঞ্জীবের কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র জানতে পারেন এবং এইভাবেই চরিত্রটির বীজ উপ্ত হয়। (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

মৃণালিনী

'মৃণালিনী', উক্ত উপন্যাসের নায়িকা মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী। মৃণালিনী মথুরার শ্রেষ্ঠীকন্যা। এই চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে গঠিত। সহিষ্ণুতায়, ধৈর্যে, প্রেমের গভীরতায় এবং দুঃখবরণে কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির সীতা ও শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র সঙ্গে তুলনীয়া। প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে দীপ্ত তেজস্বিতার প্রকাশ ঘটতে পারে—দুর্বৃত্ত ব্যোমকেশকে পদাঘাতের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' তাঁর কোমলতমা নায়িকাদের একজন ; সংস্কৃত-সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে বঙ্গ-নারীসুলভ ত্যাগ-তিতিক্ষা, মাধুর্য-স্নিগ্ধতা ও অশ্রু মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে রচনা করেছেন।

প্রাচীনভারতে শ্রেষ্ঠীকন্যারা রূপসী ও কলাবতীরূপে বিশিষ্টা ছিলেন, তাঁরা প্রায়ই রাজকন্যাদের সখীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মৃণালিনী এই আদর্শ এবং ভাবনার দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে।

সূর্যমুখী

কুন্দকে "বিষবৃক্ষে"র "রাগানুগা" নায়িকা বলা যায়, সূর্যমুখী হলেন "বৈধী"।

বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাতবংশীয়া আত্মমর্যাদাসম্পন্না একটি প্রদীপ্তা নারীকে এই চরিত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সূর্যমুখীর গাম্ভীর্য, তাঁর স্বাভাবিক :আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি পূর্ণযৌবনে স্থির বিদ্যুতের মতো রূপ—বঙ্কিমসাহিত্যে তাঁকে একটি স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন একটি আদর্শ জমিদার-বধূরূপে তাঁকে চিত্রিত করেছেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসায় যেমন তিনি অনন্যব্রতা, তেমনি স্বামীর জীবনে যখন তাঁর প্রয়োজন নেই—তখন আত্মমর্যাদার প্রেরণাতেই কুন্দকে স্বস্থানে অভিষিক্তা করে দেশত্যাগিনী। তাঁর বেদনা আছে, অশ্রু আছে, দুঃখের দুঃসহতা আছে, কিন্তু কোথাও দীনতা নেই। তিনি রাণীর মত নির্বাসন নিয়েছেন, আবার রাণীর মহিমাতেই তাঁর পুনরাগমন ঘটেছে। আর চরিত্রোচিত ঔদার্যেই তিনি বলতে পেরেছেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"[৩]

ঠিক এই ধরনের অভিজাত বধূ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আর নেই। অভিমানিনী ভ্রমরও নয়, প্রগল্‌ভা লবঙ্গলতাও না। নারীর ব্যক্তিত্ববোধ যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় পূর্বাবধি বিদ্যমান ছিল সূর্যমুখীই তার প্রমাণ।

হিরণ্ময়ী

'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের নায়িকা হিরণ্ময়ী শ্রেষ্ঠী ধর্মদাসের একমাত্র কন্যা, সম্পদলালিতা। কিন্তু পিতার অতুল ঐশ্বর্য তাঁকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। বিধিলিপি অমোঘ, তাই পিতৃগুরু আনন্দস্বামী ও পিতা ধর্মদাস হিরণ্ময়ীর প্রতি ব্যবহারে আপাত উদাসীন, নির্মম।

ভাগ্যের অনিবার্য বিধানকে পুরুষকার ও সুকৌশল সতর্কতার দ্বারা কিভাবে খণ্ডিত করা যায়, দুর্ভাগ্যের ভিত্তিতে সৌভাগ্যকে গড়ে তোলা যায় কি করে 'যুগলাঙ্গুরীয়' তারই কাহিনী। ধনীর দুলালীর জীবনে আকস্মিক অসহায়তা দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণে ক্ষণিক চিত্তদৌর্বল্য, একই কালে সুচিরস্মিত প্রণয়ী বিপুল ঐশ্বর্যসম্পদশালী পুরন্দরের জন্য প্রেমের কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব, দার্ঢ্যেও

৩। বিষবৃক্ষ ; ৪৮ শ পরিচ্ছেদ

ততোধিক কঠিন আত্মসংযম হিরণ্ময়ী চরিত্রকে বাস্তবরসে সমৃদ্ধ করেছে।

রাধারাণী :

রাধারাণী মুগ্ধা নায়িকা। চরিত্রটি স্নিগ্ধ মাধুর্যে, পবিত্রতায়, সরলতায়, চিত্তকে আকর্ষণ করে, করুণরসে অভিভূত করে। চরিত্রটি কিন্তু অনেকটা অবাস্তব। বর্ষার রাতে দুর্দিনের চরম অন্ধকারক্ষণটিতে দৈবের আশীর্বাদ হয়ে রাধারাণীর জীবনে রুক্মিণীকুমার ওরফে দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখা দিলেন মূর্তিমান করুণার মত। সেই মুহূর্তটি বালিকা রাধারাণীর চিত্তপটে দেবেন্দ্রনারায়ণের জন্য একটি চিরকালের প্রেম ও পূজার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। রাধারাণীর এই চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনায় প্রেমের আরাধনা মূর্তি। এই প্রেমতপস্বিনী আমাদের মানসপটে সুন্দর হয়ে ওঠে। বাস্তবে সর্বদা সত্য হয়ে ওঠে না।

লবঙ্গলতা

লবঙ্গলতা 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক শচীন্দ্রের তরুণী বিমাতা—বৃদ্ধ জমিদার রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয়া পত্নী। এই চরিত্রে যেমন কৌতুকের উচ্ছলতা, তেমনি গভীর অন্তর্মুখিতা। স্বামীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি, সপত্নীপুত্রের প্রতি তাঁর অকৃপণ স্নেহ ও নিত্যবর্ষিত শুভাকাঙ্ক্ষা, আশ্রিত ও প্রার্থীজনের প্রতি তাঁর উৎসারিত করুণা, তাই অন্ধ রজনীর তিনি হিতৈষিণী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আদর্শ হিন্দুনারীরূপে রচনা করেছেন।

প্রথম জীবনে অমরনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়ত এই ভালবাসা স্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হলে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের মিলন ঘটাতে পারত। কিন্তু বয়োসুলভ চাঞ্চল্যে অমরনাথ যে ভুল করেছিলেন—হিন্দু-গৃহের শুচিস্মিতা কন্যা লবঙ্গলতা তাঁর নিষ্ঠুর অথচ যথাবিধি দণ্ডদান করেছেন। এই দণ্ডপ্রয়োগ আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনন্দিনীরই উপযুক্ত।

কাহিনীর বিবর্তনে মহাপ্রাণ অমরনাথের সমস্ত মহিমা লবঙ্গের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। অমরনাথ সম্পর্কে লবঙ্গের যে অন্তর্নিহিত বাল্যপ্রণয় তাঁর সতীধর্মের দ্বারা শাসিত, কাহিনীর শেষে চকিতের জন্য তা আত্মপ্রকাশ করেছে। সর্ববঞ্চিত অভাগ্য অমরনাথের প্রতি 'স্নেহ' প্রকাশ করাও তাঁর ধর্মবিরোধী, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যেও একটি ইঙ্গিত আছে 'ইহলোকে'। অর্থাৎ

পরলোকে যখন এই সংসারের শাস্ত্রীয় বন্ধন থাকবে না—সেদিন হয়ত তার 'সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে' অমরনাথের জন্য 'এতটুকু স্থান' রচিত হবে।

আদর্শ হিন্দু-নারীত্বের প্রতীক লবঙ্গলতা, চলিত প্রতিটি বিশ্বাসের যেন সে মূর্তিমতী প্রতিবাদ। 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্ষা' মাত্রেই অসুখকর নয়, সপত্নী সন্তান সম্পর্কে বিমাতার স্নেহও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। তরুণ বয়সে সবাই-ই চপলতায় আত্মবিস্মৃত হয় না—অসংযমকে বালিকাও দণ্ড দিতে পারে; এবং সর্বশেষে যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ লৌকিক ধর্ম অবশ্যমান্য, তার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় কল্পনারও অতীত।

ভ্রমর

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর একেবারে পতিপ্রেম ও মানসিক আভিজাত্যের প্রতীক। পরম রূপবান্ গোবিন্দলালের তিনি 'কালো ভোমরা'—কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্যে সে স্বামীর হৃদয়লক্ষ্মী। তথাপি ঘটনাচক্রে এবং রোহিণীর রূপের আকর্ষণে গোবিন্দলাল তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, স্বেচ্ছায় সর্বনাশের স্রোতে তরী ভাসিয়েছেন। চূড়ান্ত বিপর্যয়ে অপরাধী গোবিন্দলাল যখন নতমস্তকে এসে ভ্রমরের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়েছেন তখন প্রায়শ্চিত্তের লগ্ন অতীত হয়ে গিয়েছে।

তারপর গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হয়েছেন—বিকৃত বাসনার স্তূপে অগ্নিবিন্যাস করে লাভ করেছেন ঈশ্বরানুরক্তি—"এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"[৪]

ভ্রমরের মৃত্যুই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' যেন সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, যেন একটি মহৎ ও পবিত্র মৃত্যুর দ্বারা উপন্যাসের সমস্ত কলুষ ক্ষালিত হয়েছে।

চরিত্রটি স্বামীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে যেমন অটল, তেমনি স্বামীর কৃত অন্যায় ও অবমাননায় আত্মমর্যাদায় প্রদীপ্ত। উচ্চমনা, সুরুচিসম্পন্না, অভিজাত কন্যা ও বধূর একটি অতিবাস্তব রূপায়ণ এই চরিত্রে ঘটেছে। আমরা ভ্রমরের মধ্যে বয়স্ক সূর্যমুখীরই ব্যক্তিত্বের পূর্বাভাস পাই। আবার তরুণ বয়োসুলভ অভিমানও তাঁর চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রকটিত। সূর্যমুখী অনেকখানি আদর্শায়িত। কিন্তু ভ্রমর বাস্তব এবং অধিকতর মনস্তত্ত্বসম্মত।

৪। 'কৃষ্ণকান্তের উইল': পরিশিষ্ট

ভ্রমরের মধ্যে আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর বিশ্বাস পূর্বাপর অটুট। দারুণ অভিমানে এবং অবস্থাচক্রে তিনি ভুল করেছেন, তার মার্জনাও চেয়েছেন। বিমূঢ় গোবিন্দলাল তখন আহত-পৌরুষ এবং রোহিণীর রূপলালসায় উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি ভ্রমরের দিকে ফিরেও তাকাননি। কিন্তু ভ্রমর জানেন :

"দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার 'পরে আমার ভক্তি থাকে তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে।"৫

এই সঙ্কল্প মিথ্যা হয়নি। ভ্রমরের জন্য গোবিন্দলালকে কাঁদতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মাধ্যমে একটি অভিজাত বধূর পতিপ্রেম, বিশ্বাস, তেজ এবং ধর্মবিশ্বাসের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বিগত কালের বাঙালী সমাজের বধূরূপে ভ্রমর যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি নারীত্বের মহিমায় মণ্ডিত।

কল্যাণী

'কল্যাণী' বঙ্গনারীর চিরন্তনী কল্যাণী মূর্তি। স্বামীর সুখদুঃখে, বিপদে সম্পদে তাঁর সমভাগিনী সহচারিণী। এই সব নারীর প্রেমে সমুদ্রের গভীরতা। স্বামীর প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠাই এঁদের আত্মরক্ষার প্রধান শক্তি। কল্যাণীও বাংলাদেশের সেই জাতের মেয়ে—যাঁরা স্বামীর ঐশ্বর্যে সম্রাজ্ঞী, আবার প্রয়োজন হলে পতির সঙ্গে জীর্ণবেশ পরে অর্ধাশনে, অনশনে পথ চলেন। এই জাতীয়া নারীর সতীত্বের বর্মটি ভিতরে বাইরে এমনই ইস্পাতকঠিন যে পৃথিবীর কোন পুরুষের সাধ্য নেই তাঁর হৃদয়ের সীমান্তেও প্রবেশলাভ করে। আনন্দমঠে এমনি একটি কল্যাণী নারীকে আমরা দেখেছি মহেন্দ্রের পত্নী কল্যাণীর মধ্যে। ঐশ্বর্যবান স্বামীর স্ত্রী কল্যাণী। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় পদচিহ্ন গ্রাম যখন অন্নহীন, তখন মহেন্দ্রের সঙ্গে তিনি পথে বেরোলেন কিন্তু পথের কন্টক স্মরণ করে বিষের কৌটা নিতে ভোলেননি। তারপর মাতৃসেবাব্রতে মহেন্দ্রকে একনিষ্ঠ করবার জন্য তিনি মৃত্যুবরণও করতে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে ভবানন্দের চিকিৎসায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। তারপর দুর্দিনের মেঘ জীবনে অনেক জটিলতার সঞ্চার করেছে। ভবানন্দের উন্মাদনা এসে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়েছে। কিন্তু স্থিরব্রতা কল্যাণী বিপদে-সম্পদে হিন্দুনারীর

৫। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৩০শ তম পরিচ্ছেদ।

মহিমায় গরীয়সী হয়ে বিরাজ করেছেন—শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের প্রসন্ন করুণা অকৃপণভাবে তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছে।

ইন্দিরা

দস্যুহস্তে পতিতা ইন্দিরার জীবনকাহিনীতে ভাগ্যের লীলাই অনেকখানি। কিন্তু এই চরিত্রটি বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মূল উদ্দেশ্যেরই পরিবাহণ হয়েছে। চরম দুঃখ বিপদ ও দুর্দিনের মধ্যেও যে মনোবল হারানো অকর্তব্য, ইন্দিরা তার প্রমাণ; দ্বিতীয়তঃ প্রলোভনের জাল ফেলে সে নিজ স্বামীকে আকৃষ্ট করেছে বটে, কিন্তু লালসার বন্যাবেগে প্লাবিত হয়ে যায়নি—কঠিন শাসনের দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছে, স্বামীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আপাত সমস্ত লঘুতা এবং প্রগলভতার অন্তরালে যে কঠোর আত্মসংযম হিন্দুনারীর চরিত্রের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, ইন্দিরা যেন তারই প্রতীক।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' উপন্যাসে একটি মধুর মিলনান্তক এবং কৌতুকরসোজ্জ্বল কাহিনী বিবৃত করতে চেয়েছেন; এতে সমাজচিত্র আছে, গ্রাম্য নারীবাসরের কুরুচি নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মাধ্যমে দেখিয়েছেন—এইসব লঘুতা, গ্রাম্যতা ও রুচিহীনতা—সবই বহিরাঙ্গিক। সংযম এবং কল্যাণ-বোধই আমাদের নারীসমাজের অন্তরলোকে ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্ত হয়ে আছে।

চঞ্চলকুমারী

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা চঞ্চলকুমারীর চরিত্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তি আছে। মনে হয়, টডের রাজস্থানকে ভিত্তি করেই তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের সঙ্গে তার কিছু অমিল আছে। বস্তুতঃ রাণা বিক্রমসিংহের কন্যা রূপনগরী চঞ্চলকুমারী, রাজকন্যা চারুমতীরই কল্পিত প্রতিচ্ছবি। চঞ্চলকুমারী তেজস্বিনী রাজপুতানী। তিনি প্রাণ দিতে পারেন কিন্তু আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে পারেন না। চঞ্চলকুমারী বা চারুমতী পদ্মিনীর ঐতিহ্যেরই অনুবর্তিনী। প্রৌঢ়বয়স্ক এবং রূপহীন অথচ বীরশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহকে পতিরূপে নির্বাচন করার মধ্যেও তাঁর রাজপুত-কুলাঙ্গনাসুলভ এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত পর্যায় :

শ্রেণী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন নির্দিষ্ট পরিচয় নেই। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় শশিভূষণ-বিধুভূষণের যে পারিবারিক চিত্র পাই রবীন্দ্রনাথের দুই একটি উপন্যাসে যেমন 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ইত্যাদি মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তের যে সাংসারিক চিত্র আছে এবং পরবর্তীকালে অনুরূপাদেবী, নিরুপমাদেবী ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, বঙ্কিমসাহিত্যে তা অপ্রাপ্য বললেই চলে। সুতরাং জমিদার বা ধনী পরিবারভুক্ত নয়, অথচ দরিদ্রের পর্যায়েও পড়ে না এমন মধ্যবর্তীস্তরের যে সব চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে তারা কখনও মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত কখনও বা কোন বিশেষ রোম্যান্টিক মনস্তাত্ত্বিক অথবা অন্যাবিধ তাৎপর্যে প্রকটিত। মধ্যবিত্ত জীবনের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে আমরা সাধারণভাবে ধনী এবং দরিদ্র পরিবারের মধ্যস্থলবর্তী চরিত্রগুলোকে এই বিশেষ অর্থে গ্রহণ করব।

নিম্নবিত্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। 'রজনী' অথবা প্রফুল্লর প্রথম জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য যাই থাক, পরবর্তীকালে অবস্থাচক্রে তারা 'রাধারাণী'র মতই ধনবতী ও সৌভাগ্যবতী হয়েছিল। আমরা রজনী এবং প্রফুল্লকে এই কারণেই উচ্চবিত্তের অন্তর্ভুক্ত করিনি যে, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও দেবী চৌধুরাণী ব্রতচারিণী, শেষে গৃহবধূর সহজ ও সরল জীবনযাত্রার মধ্যে কালাতিপাত করেছে এবং ঐশ্বর্যবতী রজনী উপন্যাসে কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেনি। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই মূল কাহিনীর সহায়ক বা সহায়িকা, নিম্নবিত্তরূপে তাদের ব্যক্তিপরিচয় যৎসামান্য।

এই চরিত্রাবলীর মধ্যে যেগুলি মুখ্য নায়ক-নায়িকা পর্যায়ী, আমরা সর্বাগ্রে তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

নবকুমার

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক 'নবকুমার' সপ্তগ্রামের বাঙালী ব্রাহ্মণ-যুবক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। চরিত্রটি ঐতিহাসিক নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথমাংশে নবকুমারকে নায়োকোচিত আদর্শে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিনি বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত, কাব্যপ্রাণ, সমুদ্রসন্দর্শনে তিনি কালিদাসের কাব্য থেকে সাগরবর্ণনা আবৃত্তি করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কবিদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কেও তিনি লেখকের উনবিংশ শতকীয় মানসিকতার অধিকারী।

নবকুমার নির্ভীক, তেজস্বী, পরোপকারী। 'পরের জন্য কাষ্ঠাহরণে' যাওয়া তাঁর স্বভাবধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য সকলে 'অধম' হলেও তিনি 'উত্তম রীতি' পরিত্যাগ করেন না। অবস্থাচক্রে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পরিচয় হলে, নবকুমার তাকে বিবাহ করে সপ্তগ্রামে এনেছেন এবং দাম্পত্যজীবন যাপন করতে চেয়েছেন। কপালকুণ্ডলার বৈরাগিণী মনকে তিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পারেননি, তার জন্য তাঁর যে যন্ত্রণা তা স্বাভাবিক, তাঁর দুর্বলতা এবং আত্মিক পরাভবও অনুরূপ সামাজিক চরিত্রের অনুকূল। পদ্মাবতীকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকাচারের প্রতি অটল আনুগত্য এবং কপালকুণ্ডলার প্রতি গভীর পত্নীপ্রেম প্রকটিত হয়েছে। নবকুমারের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর যুবকের চরিত্রের শক্তি এবং দুর্বলতা দুই-ই পরিস্ফুট করেছেন।

কাপালিক

সাধুসন্ন্যাসী সম্পর্কিত বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের মজ্জাগত। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'কাপালিক' মাত্র সেই বিশ্বাস-সম্ভূতই নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও লব্ধ। আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগেও বাংলাদেশের শ্মশানে মশানে অঘোরপন্থী তান্ত্রিক দুর্লভদর্শন ছিল না, কপালকুণ্ডলার পটভূমি নেগুঁয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র এক কাপালিকের রহস্যজনক সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁর জীবনী থেকে তা জানা যায়। "শচীশবাবু লিখিয়াছেন,—নেগুঁয়াতে অবস্থান-কালে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন একজন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন অনেক রাত্রি।......এমন সময় বাটীর দ্বারে সবলে করাঘাত হইল।...... বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নরকপালহস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা,

পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গারবেখা, সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডাকিতেছ কেন?'

কাপালিক। আমার সঙ্গে এস।

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপালিক। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

……এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনদিবস প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই।"[৭] (বঙ্কিমজীবনী-পৃষ্ঠা-৪৫৭-৪৫৯)

তাছাড়া 'মালতী-মাধবে' নাটকের অঘোরঘণ্ট কাপালিকের কিছু প্রভাবও এই চরিত্রে থাকতে পারে, সেও অনুরূপভাবে মাধবের প্রাণ হরণের চেষ্টা করেছিল।

নরশোণিত ব্যতিরেকে যার সাধনা সিদ্ধ হয় না এবং মহত্তর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবার জন্য যে মানবিক স্নেহ-প্রেমকে তুচ্ছ করে কাপালিকের চরিত্রে সেই নিষ্ঠুরতা এবং মহিমা যুগপৎ আরোপিত হয়েছে। নবকুমারের প্রথম দর্শনে অন্ধকার বালিয়াড়ির চূড়ায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দীপিত কাপালিকের চিত্রার্পিতবৎ মূর্তি বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি এবং চিত্রীচৈতন্যের এক অনন্য প্রকাশ। 'এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎ প্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে।'[৮] নবকুমারের বধায়োজন পর্যন্ত কাপালিকের এই স্বমহিমব্যক্তিত্ব নির্দয় হলেও স্বাভাবিক, এমন কি কন্যাতুল্যপালিতা কপালকুণ্ডলাও যে অচিরে তাঁর ভৈরবসাধনার উপকরণে পরিণত হবে—এই তথ্য পীড়াদায়ক হলেও অসঙ্গত নয়।

কাহিনীর শেষাংশে কাপালিকের পুনরাবির্ভাব অত্যন্ত নাটকীয় সন্দেহ নেই; পরিণতিও তার ফলে ক্ষিপ্র এবং অমোঘ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অংশে কাপালিকের চরিত্রে মহাপুরুষসুলভ উন্নয়ন নেই, এখানে তিনি নিতান্তই প্রতিহিংসাকামী চক্রান্তকারীতে পরিণত হয়েছেন, এক্ষেত্রে মতিবিবির সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কপালকুণ্ডলার প্রতি সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাপালিকের চরিত্রমাহাত্ম্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন।

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন: শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু।

৮। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

বর্তমানকালের অনুরূপ পটভূমি এবং কাপালিকের এই রূপায়ণ কাল্পনিক মনে হলেও কপালকুণ্ডলার কালমঞ্চে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সহজাত শিল্পনৈপুণ্যেই কাপালিক চরিত্রটিকে প্রকটিত করেছেন।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখর কাহিনীর মুখ্য পুরুষ। সামাজিক প্রতীকরূপে তিনি বিদ্যাজীবী, সহৃদয় এবং অসাংসারিক জনৈক মহদাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর এই সন্ন্যাসীপ্রতিম অসাংসারিকতাই তাঁর পারিবারিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ (শৈবলিনীর মনোবিকারও কিছু দায়ী)। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের মধ্যে যেমন তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ নির্দেশ করেছেন, তেমনি তাঁর সাধুতা ও মহত্ত্বই যে শেষপর্যন্ত শৈবলিনীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে এনেছে,—তাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই হল চন্দ্রশেখরের social type.

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসে নায়করূপে প্রতাপচরিত্র চন্দ্রশেখরের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু প্রতাপের শৌর্যবীর্য আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শান্তসহিষ্ণুতা এবং প্রজ্ঞাদীপ্ত চিত্তমহিমায় চন্দ্রশেখরই কাহিনীর কেন্দ্রপুরুষরূপে মর্যাদালাভের যোগ্য।

ভারতীয় বিদ্যাজীবী ব্রাহ্মণের যে শুচিপবিত্র, ক্ষমাসুন্দর মূর্তি বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তপটে প্রতিফলিত ছিল, তা সম্পূর্ণ কল্পনা-সম্ভব নয়। কাঁটালপাড়ার অদূরেই ভট্টপল্লী, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র আবাল্য এইরকম শাস্ত্রপারঙ্গম উদার-হৃদয় এবং বস্তুজ্ঞান-বিবর্জিত বাঙালী পণ্ডিতকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদগ্রামের চন্দ্রশেখর শর্মা ভট্টপল্লীর অনিবার্য প্রভাবেই রচিত।

জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র শাস্ত্রবিদ মহদাশয় ব্রাহ্মণের চরিত্রমহিমাই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে কীর্তিত করেন নি, বাস্তববুদ্ধির অভাবই দার্শনিক হ্যামলেটের দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ, সক্রেটিসের মৃত্যুর হেতু। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিবাহ করেছিলেন—কিন্তু গ্রন্থকীট এই ব্রাহ্মণ নিজের পুঁথিপত্রের বাইরে আর কিছুই দেখতে পাননি, শৈবলিনীকে তিনি প্রত্যাশিত গার্হস্থ্যজীবন দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে প্রবল এবং স্বাভাবিক প্রেমের স্পর্শ লাভ করলে হয়তো শৈবলিনীর দুর্দম চিত্তবেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে আসত, 'প্রতাপপাখী ধরার' অবাস্তব চিন্তাও তার মনে স্থান পেতো না। অপরাধ

অসংযতবৃত্তি শৈবলিনীর ছিলই, কিন্তু চন্দ্রশেখর সেই অপরাধপ্রবণতাকে পরোক্ষে অনুপ্রাণিত করেছেন।

তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর চরিত্রকে যে মহিমা দিয়েছেন, তা তাঁর অন্য কোন নায়কচরিত্রে দুর্লভ। মহান্ ঔদার্যের মধ্য দিয়ে তিনি গৃহত্যাগিনী বিমুখী পত্নীকে পুনর্গ্রহণ করেছেন,—তার নবজন্মের উদ্‌যাপন করেছেন। কলঙ্কিত হয়েও চন্দ্র যেমন কলানিধি, তেমনি বাস্তববুদ্ধিহীনতার অপূর্ণতাটুকু চন্দ্রশেখরের চন্দ্রোপম চরিত্রকে শতগুণে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

চন্দ্রশেখর যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের মূর্ত বিগ্রহ।

সত্যানন্দ ও মহাপুরুষ

আনন্দমঠের স্থাপয়িতা। গ্রন্থসূচনায় নিবিড় অরণ্যে মধ্যযামে এই সত্যানন্দেরই আকুল আর্তি: 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' এই সত্যানন্দই ভক্তি ও সাধনার সর্বপণে 'মা যাহা হইবেন'—তারই প্রতিষ্ঠাব্রতী।

সত্যানন্দ আদর্শ চরিত্র। তিনি স্বদেশব্রতী মহাসাধক—মাতৃমন্ত্রে সমর্পিতপ্রাণ। তাঁর অন্তরে মানবিক কোমলতার অভাব নেই, শান্তির সঙ্গে তাঁর আলাপনে সেটি পরিস্ফুট। 'ছিঃ মা আমার সঙ্গে প্রতারণা?' কিন্তু এই কোমলতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে সংকল্পের কঠিনতা, সেখানে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলেও কারো মার্জনা নেই—সেখানে একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত 'মৃত্যু'। সেই মৃত্যুদণ্ড ভবানন্দ গ্রহণ করেছেন, জীবানন্দও নিষ্কৃতি পান নি।

সত্যানন্দ 'আনন্দমঠ'-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেও তার নিয়ামক একজন রহস্যময় মহাপুরুষ। তিনি সত্যানন্দের উপদেষ্টা, নির্ণায়ক, দিগ্‌দর্শায়ক। এই মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তিধর, তিনি মৃত জীবানন্দকে পুনর্জীবন দান করেন, তাঁর প্রজ্ঞানেত্রে তিনি ভবিষ্যতের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই দুর্বোধ্য শক্তির কাছে আত্ম-সমর্পিত সত্যানন্দের মধ্যে তাই দ্বৈতভাবনা আরোপিত। একদিকে তিনি শক্তিব্রতধারী অপরদিকে তিনি বৈষ্ণব। সন্তানদের কর্মকাণ্ডে শক্তির উল্লাস—অথচ ভক্তিতে বৈষ্ণবের 'কৃষ্ণার্পণমস্তু'। বাংলাদেশে চিরদিন শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমন্বয়সাধনা—রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের গান তার প্রাণবন্ত প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বিতসাধনা এক অভিনব ভাবমূর্তিলাভ করেছে।

'আনন্দমঠ' পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিপ্লববাদী আন্দোলনের গীতারূপে পরিণত হয়েছিল। আর যে সর্বত্যাগী নেতারা সে মৃত্যুযজ্ঞে ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা অনেকেই যে সত্যানন্দের দ্বারা অনুভাবিত ছিলেন, এ বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে ?

ভবানন্দ

ভবানন্দ 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী সৈনিক। সন্তানসেনার লক্ষ্য সমস্ত কামনা, বাসনা ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে মাতৃসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ। এই মহান সন্ন্যাসে এতটুকু দুর্বলতা প্রবেশ করলে বা বিন্দুমাত্র স্খলন ঘটলে 'মৃত্যু'ই ব্রতীর একমাত্র কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। ভবানন্দ সন্তানসেনার অন্যতম নায়ক। তাঁব বীর্য, স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ অনুকরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আদর্শ স্বদেশী সৈনিক তিনি। কিন্তু ভবানন্দ সর্বোপরি মানুষ। ত্যাগের সর্বাঙ্গীণ সাধনা সত্ত্বেও মহৎ ও বীর চরিত্রের মধ্যে কোথাও এমন একটি ছিদ্র রয়ে যায় যে সেই তার সর্বনাশ রচনা করে। ভবানন্দের রূপতৃষ্ণা সেই মৃত্যুরন্ধ্র—যেন সমুদ্রজয়ী কোন অর্ণবপোতের একটি গুপ্ত ছিদ্র। ভবানন্দের অসংযত অন্যায় বাসনা কল্যাণীর পবিত্রতায় প্রতিহত হয়েছে, বীর ভবানন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

মাতৃমন্ত্রী সৈনিকের অন্তরে দুর্বলতার স্থান নেই, যে কোন চিত্তবৈকল্যের জন্য তাঁকে সুকঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ বঙ্কিমের প্রতীতি, তাঁর প্রতিপাদ্য। তাই ভবানন্দের পরিণাম অমোঘ, জীবানন্দকেও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়েই পুনর্জীবন লাভ করতে হয়েছে।

জীবানন্দ

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে নায়কত্বের দোলক একবার মহেন্দ্র সিংহ, একবার জীবানন্দ, আর একবার ভবানন্দের মধ্যে আন্দোলিত হলেও জীবানন্দকেই এর নায়করূপে মোটামুটি নির্বাচন করা চলে। জীবানন্দ ও শান্তি, জ্যোৎস্না-লোকিত মধ্যযামে কাহিনীর সমাপ্তিদৃশ্য। উপন্যাসের অন্যান্য অংশে দৃষ্টিক্ষেপণ করলেও বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃসংযোগের কেন্দ্রস্থল কোন্‌টি।

'আনন্দমঠে'র কল্পনায় একটি সুস্পষ্ট অবাস্তবতা আছে। যে 'সন্ন্যাসীবিদ্রোহ'

এর উপকরণ 'আনন্দমঠে'র দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সূত্রানুসরণ করে প্রায় কাল্পনিক এই যে কাহিনী নির্মাণ করেছেন, তাতে 'বন্দে মাতরম'-এর মন্ত্র কালাতিক্রমণ বা 'অ্যানাক্রনিজম্' (anachronism)-এর দোষে দুষ্ট—সেকালে কোন সন্ন্যাসীই 'সপ্তকোটিকণ্ঠে'র গান গাইতেন না।

বঙ্কিম অতীতের কয়েকটি রেখামাত্র অবলম্বন করে তার উপরে আধুনিক স্বাদেশিকতার চিত্রপট রচনা করেছেন। ফলে 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী চরিত্রগুলি নামতঃ সন্ন্যাসী হলেও ভারতীয় সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত কিছু দেশপ্রেমিক মাত্র। জীবানন্দ বা ভবানন্দ কেউ-ই এর ব্যতিক্রম নন—তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের মানস সন্তান, তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ সৈনিক।

জীবনবাদী বঙ্কিম শুষ্ক সন্ন্যাসের সাধনাকে বোধ হয় অন্তরধর্মেই গ্রহণ করতে পারতেন না। তাই জীবানন্দের গার্হস্থ্যজীবনের একটি সুন্দর দিক তিনি উপন্যাসে এনেছেন, আনন্দমঠে কঠিন ব্রহ্মচর্যের 'অসিধার ব্রত' পালন করে একসঙ্গে বাস করেছেন জীবানন্দ ও নবীনানন্দবেশিনী শান্তি। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্যের যে মেল-বন্ধন ঘটেছে জীবানন্দের জীবনেও তা স্বাভাবিক। অসংযমের প্রায়শ্চিত্ত ভবানন্দের মত জীবানন্দও করেছেন, কিন্তু জীবানন্দ শান্তির বিবাহিত জীবনের মূলমন্ত্র কাহিনীতে অটুট 'ওঁ ব্রতে তে হৃদয়ঞ্চ মনোঞ্চ দধাতু।' শান্তি জীবানন্দের ব্রতে হৃদয় মন সমর্পিতা সহধর্মিণী।

কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তরে'-র নামপুরুষ কমলাকান্ত চক্রবর্তী। অহিফেনসেবী ভবঘুরে, প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুগ্ধে কিঞ্চিৎ পুষ্ট অথবা কিয়ৎকাল জমিদার নসীরামবাবুর আশ্রিত এই কমলাকান্ত তাঁর 'দপ্তর' এবং 'পত্রে' বাংলা-সাহিত্যে বুদ্ধি, কৌতুক, শ্লেষ, কবিত্ব, দার্শনিকতা ও দেশপ্রেমের যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন, অদ্যাবধি তা তুলনারহিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৌশলে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর একটি কায়ারূপ প্রকটিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে আফিংখোর কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাবময় সত্তা। কমলাকান্তের ছদ্মবেশের অন্তরালে থেকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বিচিত্র ও

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও মানবতার বিচার করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কারুণ্যে দ্রবীভূত হয়েছেন। কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র অভিন্ন।

কিন্তু বহিরঙ্গেও কমলাকান্তের একটি সুন্দররূপ আছে। অকৃতদার। স্পষ্টভাষী ('পে বিল' রচনা ক'রে চাকরি হারানোর দৃষ্টান্ত থেকেই চরিত্রটি বোঝা যায়), প্রখরবুদ্ধি, কবিপ্রাণ, স্বদেশপ্রেমিক। অন্যদিকে 'যত্র তত্র ভোজন', 'হট্টমন্দিরে শয়ন' এবং প্রয়োজনমাত্র একভরি আফিং ও এক সের দুগ্ধ। এত দুঃখ-দুর্গতির মধ্যেও কৌতুক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, রসিকতা তাঁর জিহ্বাগ্রে সারস্বত-কৃপার মতো বিরাজিত। এক 'কমলাকান্তের জোবানবন্দি'ই এই রসিক মানুষটির পরিচয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভবঘুরে কমলাকান্ত চক্রবর্তী বাংলাসাহিত্যে এক এবং অদ্বিতীয়।

*　　　*　　　*

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যেই 'কপালকুণ্ডলা' অনন্য নারীচরিত্র। এই চরিত্রটিকে কিছু পরিমাণে শেক্‌স্‌পীয়রের 'দি টেম্‌পেষ্ট' নাটকের নায়িকা 'মিরান্দা'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু দ্বীপ-লালিতা হলেও মিরান্দা পিতার সঙ্গে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন—সামাজিক বোধও তাঁর ছিল, কালিদাসের শকুন্তলাও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তুলনীয়া নন, কারণ আশ্রমে গৃহ-ধর্ম বর্তমান থাকায় শকুন্তলা সমাজবিধি এবং স্বাভাবিক মানব-সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিতা ছিলেন।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষামূলক চরিত্র। এটির বাস্তব প্রেরণা নেগুয়া অবস্থানকালে চকিতে দৃষ্ট একটি কাপালিক কন্যা, নামকরণের জন্য ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা 'কপালকুণ্ডলা'র কাছে বঙ্কিম ঋণী। কিন্তু ভবভূতির চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। 'মালতী মাধব'-এর কপালকুণ্ডলা নিষ্ঠুর কাপালিকের সুযোগ্যা সঙ্গিনী। এই চরিত্র বিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সংলাপ* স্মরণীয়।

* দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। যথা—

'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই সত্যটিই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাকৃতিক প্রাণশক্তির মতো স্ফুরিত হয়েছিল—লোকালয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না, তার মানবিক স্নেহমমতা কোমলতার উপরে কাপালিক এবং ধর্মবিশ্বাসের অসীম প্রভাব, এই প্রভাব অতিক্রম করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কপালকুণ্ডলার এই নিরাসক্তি কি সম্পূর্ণ স্বীকারযোগ্য? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সাধারণতঃ বারো বৎসর বয়সের মধ্যেই মানবচরিত্রের সব মৌলবৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণীত হয়ে যায়—পরবর্তী সময়ে তাদের বিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তন ঘটে না। কপালকুণ্ডলা যদি রোমান্স না হয়ে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হত, তাহলেও হয়তো বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন পরিণামই ঘটত না। সে যেন গ্রীক পুরাণের 'দাফনি' চরিত্রটির মতো—অ্যাপোলো—অর্থাৎ জীবন

কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে? যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেই স্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'যদি দরিদ্র ঘরে মেয়েটার বিবাহ হয় তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে,…দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।' পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।' ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।'

'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু'—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'ভারতী', চৈত্র, ১৩২১।

এবং প্রেমের স্পর্শ থেকে চিরপলাতকা, শেষ পর্যন্ত একটি লরেল-বৃক্ষে তার পরিণতি। সিন্ধু-সম্ভবা কপালকুণ্ডলাও তাই সমুদ্রপ্রতিম গঙ্গাতরঙ্গে মিশে গিয়েছে।

তবু সামাজিক নারীরূপে তার ভূমিকা আছে। দয়া, মমতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, নিঃস্বার্থতায় ও তেজস্বিতায় যে কোন আদর্শ নায়িকার বৈশিষ্ট্যাবলীও তার মধ্যে আরোপিত হয়েছে।

মনোরমা

মনোরমা 'মৃণালিনী' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় নারী চরিত্র। তাঁর প্রকৃত নাম হৈমবতী। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ কেশবের কন্যা আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ-বালক পশুপতির সঙ্গে বিবাহিত। কিন্তু অল্পবয়সেই তার বৈধব্য ঘটবে এবং পতির সঙ্গে তিনি সহমৃতা হবেন, জ্যোতির্বিদের এই গণনায় কেশব সকন্যা দেশত্যাগ করেন। মাতৃহীনা হৈমবতী পিতৃবিয়োগের পর পিতার জনৈক আচার্য জনার্দনের স্নেহাশ্রয় লাভ করেন এবং পরিশেষে নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে পারেন।

বিবাহের পরেই সম্বন্ধবিরহিত পশুপতি তখন প্রতিষ্ঠানের প্রবল ব্যক্তি—নবদ্বীপের ধর্মাধিকার। পত্নীকে তিনি চিনতেন না—কিন্তু তাঁর পরিচয় মনোরমার অজ্ঞাত ছিল না। বালবিধবাবোধে এই অপরূপা কন্যার প্রণয়াসক্ত হলেন পশুপতি—কিন্তু মনোরমা জানতেন, তাঁর আত্মপরিচয়দান পশুপতির মৃত্যুকেই হয়ত ত্বরান্বিত করবে। তারপর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পশুপতি বখতিয়ারের সঙ্গে চক্রান্ত করে বাংলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করবার ভূমিকা নিয়েছেন—প্রেম এবং যন্ত্রণার বিচিত্র দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়েছেন মনোরমা, পরিশেষে পশুপতির ভয়াল মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের পর তাঁর জলচ্চিতায় মনোরমাও অরুন্ধতী-ব্রত পালন করেছেন।

দৈবশাসিত প্রেম ও বিবাহ বঙ্কিমের একটি প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। কপালকুণ্ডলা, যুগলাঙ্গুরীয় এবং সীতারাম ব্যতীত বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনও এই বিশিষ্ট প্রবণতায় অনুভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতি ও মনোরমার মধ্যে একাধারে প্রণয় ও দূরত্ব রচনা করে—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর জীবননাট্যে, আরেকটি পার্শ্ববর্তী প্রবল নাট্যবেগ স্থাপন করেছেন।

মনোরমা অপূর্ব জটিল মানসিকতায় গঠিত। একদিকে তার বালিকা-সুলভ সারল্য, অন্যদিকে ব্যক্তিত্বময়ী গাম্ভীর্য, দুই-এ মিলে এটি একটি অসাধারণ নারী-চরিত্র। মনোরমার মধ্যে কৈশোর এবং যৌবনের দ্বৈতলীলা বারে বারে অপূর্ব নাটকীয়তা রচনা করে। একদিকে বনহরিণীর ন্যায় কৌতূহল, অন্যদিকে পশুপতির প্রতি প্রেম, তাঁর ভ্রান্তিজনিত বেদনা ও দৈবের নিগূঢ় নেপথ্যশাসন—এইগুলির সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই চরিত্রটি একেবারে রোম্যান্টিক সৌন্দর্যে বিকশিত এবং মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় খচিত। সরলতা, মাধুর্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ত্রিবেণীতে সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে মনোরমার চরিত্র দ্বিতীয়রহিত।

কুন্দনন্দিনী

'কুন্দনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বিতীয়া নায়িকা এবং পরমা দুর্ভাগিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে চরিত্রটির আত্মিক যোগ থাকায় এটি যেমন করুণ তেমনি বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে। মাতৃপিতৃহীনা অনাথা কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদর্শনেই তার দুর্ভাগ্যের পূর্ব-সংকেত, তবু সে নগেন্দ্রের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না—নিয়তি তাড়িতার মত তাকে অনুসরণ করল, অকালবৈধব্য তার ভাবতব্যকে ত্বরান্বিত করল, নগেন্দ্রের প্রেমাকর্ষণে বহ্নিমুখ পতঙ্গবৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ক্ষণিকের সুখস্বর্গ তাকে শেষপর্যন্ত আত্মঘাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এমন করুণ নিরুপায় আত্মবলিদান বঙ্কিম-সাহিত্যে দলনী বেগম ছাড়া আর কারো-রই নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তিগত অসংযমের ভয়াবহ পরিণাম দেখাবার জন্যই 'বিষবৃক্ষ' রচনা করেছেন—কুন্দ চরিত্রটি তারই উপকরণ। নগেন্দ্র তাকে নিতান্ত রূপজমোহে কামনা করেছেন, মোহমোচন ঘটামাত্র ভগ্ন ক্রীড়নকের ন্যায় পরিত্যাগ করেছেন; নাগিনী হীরা তার জন্য মৃত্যু-গরল বহন করে এনেছে। তার অসীম দুর্ভাগ্য তার সরলতা ও স্নিগ্ধতা বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যসাধনে প্রভূত সহায়তা করেছে বলা যায়। কুন্দ যদি এত নিষ্পাপ ও সরল না হোত, যদি এমনভাবে সর্বাত্মক বঞ্চনা লাভ না করত তাহলে 'বিষবৃক্ষে'র ট্র্যাজেডি এত গভীর হতে পারত না।

সূর্যমুখী চরিত্রের খরদীপ্তির পার্শ্বে বিপরীত বৈশিষ্ট্যে কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। সে তিলোত্তমা-মৃণালিনীর সগোত্রা, শান্তি-শৈবলিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে।

শৈবলিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে শৈবলিনী সম্ভবত জটিলতম নারী-চরিত্র। এই চরিত্রের সৃষ্টি এবং পরিণতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদী সমাজচেতনা ও জীবনধর্মী শিল্পীসত্তার মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে। মনীষী টলস্টয় দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর নায়িকা আনা কারেনিনার মৃত্যু তিনি চাননি—আনা আত্মহত্যা করলে তিনি আর কী করতে পারেন ; বঙ্কিমচন্দ্রও যেন শৈবলিনীকে নিয়ে অনুরূপ সমস্যায় পড়েছিলেন, তাই তাঁর রামানন্দস্বামীর সাহায্যও প্রয়োজন হয়েছে।

"বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে"—প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনলীলায় এইটুকু রোম্যান্টিক সূত্র। কিন্তু দুরন্ত ও দুঃসাহসিকা শৈবলিনীর প্রবল আকাঙ্ক্ষাবেগ, প্রতাপের জন্য তাঁর অভিমান এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ মনোভঙ্গে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে স্নায়বিক বিপর্যয়। (শৈবলিনীর 'নরকদর্শন' ইত্যাদি পর্যায় 'nervous breakdown'-এরই নিদর্শন।) এই সবের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি মৌলিক সত্যের প্রতি নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, সমাজ ও সম্বন্ধবিরোধী প্রেম কোন কল্যাণ আনে না—সংশ্লিষ্ট সকলেরই সর্বনাশ ঘটায়, এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুবিবাহের মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠানানুগ উচ্চার্য শব্দসমষ্টিই নয়—তার নিঃশব্দ অথচ অনিবার্য প্রভাব আছে (উত্তরকালে অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে 'রাণী'-র চরিত্র স্মরণীয়।)।

চন্দ্রশেখর শর্মা আদর্শ ব্রাহ্মণ হলেও তিনি বয়সের ব্যবধানে শৈবলিনী অপেক্ষা অনেকখানি দূরবর্তী ; যৌবনচঞ্চলা এবং জীবনরসিকা শৈবলিনী তাঁকে পূজনীয় বলে ভাবতে পারে, কিন্তু বয়োধর্মসুলভ লীলার উৎসবে সঙ্গী করতে পারে না। এককথায়, উদাসীনপ্রায় চন্দ্রশেখরকে অকস্মাৎ পতিরূপে লাভ করে শৈবলিনী যেমন সুখী হতে পারে নি, (প্রতাপের পূর্ব ভূমিকা না থাকলেও চব্বিশ বছরের অসম ব্যবধান কি অন্যবিধ ট্র্যাজিডি ডেকে আনত না ?) তেমনি শৈবলিনীর মনস্তত্ত্ব বুঝেও সাত্ত্বিকচেতা সন্ন্যাসীপ্রতিম চন্দ্রশেখর তাঁকে সুখী করবার উপায় খুঁজে পান নি।

এই সমস্যাকে জটিলতর করেছে ফস্টরের আবির্ভাব—সে পরোক্ষে শৈবলিনীর 'প্রতাপ-পাখি' ধরবার অসম্ভব স্বপ্নে সহযোগিতা করেছে। তারপর কাহিনী অগ্রসর হয়েছে ঝঞ্ঝার গতিতে। আর প্রলয়ের পর ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গী শৈবলিনীকে

শেষ পর্যন্ত পুনরাশ্রয় পেতে হয়েছে চন্দ্রশেখরের ক্ষমার উদার নীড়টিতে। এই প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুবিবাহের সত্য—তার জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন, পিতৃলোকের আশীর্বাদ, হোমাগ্নির পুণ্যস্পর্শ, দেবগণের আবির্ভাব, সপ্তর্ষি ও দেবী অরুন্ধতীর প্রসন্নতা, সপ্তপদীর শাশ্বত সহযাত্রা। এইসব পুণ্য-সংস্কারের মধ্য দিয়েই শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের অনুগামিনী হয়েছে তার সাধ্য কি সেই পাশ ছিন্ন করে; তাই শেষপর্যন্ত মোহ অপসৃত হয়েছে, প্রবৃত্তি প্রতিহত হয়েছে প্রতাপের অতুলনীয় চরিত্রমহিমায়, আত্মদ্বন্দ্বে ও গ্লানিতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে শৈবলিনী পরিশেষে দাম্পত্যজীবনের কল্যাণকেন্দ্রে পুনরধিষ্ঠিতা হয়েছেন।

'Sanctity of Domestic Life' বিপথচারিণীকে সংহত করা শুধু নয়। বিবাহ-সংস্কারের প্রভাবও শৈবলিনীর মধ্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে দেখানো হয়েছে, আর দেখানো হয়েছে সম্ভবতঃ আর একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য; যে প্রেম প্রশান্ত, উদার, ক্ষমাশীল—চঞ্চল বেগবান্ হৃদয় প্রথমে হয়ত তাকে চিনতে পারে না, কিন্তু তার নিভৃততম কেন্দ্রে সে নিঃশব্দে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, পরিণামে তারই জয় অবশ্যম্ভাবী।

রজনী

'রজনী' চরিত্রটি উক্তনায়িকা উপন্যাসের নায়িকা। বিশেষ কোন সামাজিক তাৎপর্য এই চরিত্র বহন করে না। উপন্যাসটি ঘটনাবিচিত্র এবং রোম্যান্টিক। একটি অন্ধ পুষ্পনারীর জীবনে 'রূপোন্মাদ' কী তীব্র এবং গভীর রূপ ধারণ করতে পারে, উপন্যাসের এই মূল বক্তব্যটিই রজনীর মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'রজনী'র প্রেরণা ঔপন্যাসিক লর্ড লীটনের (Edward G. E. B. Lytton) বিখ্যাত উপন্যাস 'দি লাস্ট ডেজ্‌ অফ্‌ পম্‌পিয়া'র 'নিদিয়া' চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং রজনীর ভূমিকায় সেকথা বলেছেন। নিদিয়া (Nydia)-ও অন্ধ এবং ফুলওয়ালী, সেও 'রজনী'র মতই তীব্র উন্মাদনায় 'গ্লোকস'কে ভালবাসে, সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। কিন্তু ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদ্গীরণের করাল-লগ্নে পম্পেই নগরীর ধ্বংসমুহূর্তে নিদিয়াই পথ দেখিয়ে বাঁচিয়েছে গ্লোকসকে, তুলে দিয়েছে জাহাজে, তারপর জলগর্ভে আত্মহত্যা করেছে। 'রজনী'র গতি-পরিণতির সঙ্গে 'নিদিয়া'র এর অতিরিক্ত সম্পর্ক নেই। তথাপি, "কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে" রজনী-রূপের অপূর্ব চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের আবরণে

বেঁধে দিয়েছেন—জলমধ্যে নিদিয়ার মৃত্যুর image হয়ত তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে।

রজনীর রূপোন্মাদ, তার ভাগ্যের বিচিত্র লীলা, অমরনাথের আবির্ভাবে কাহিনীর নাটকীয় রূপান্তর ও রজনীর ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন, মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত ও সর্বোপরি অলৌকিকতার বিস্তার—এইসব মিলে রজনী চরিত্র রোম্যান্সেই বিলসিত। কাল্পনিক পরিবেশে এই কাল্পনিক চরিত্র কবিদৃষ্টিসম্ভব, যেন সম্পূর্ণভাবে ঔপন্যাসিকের দ্বারা সে রচিত নয়। কিন্তু দারিদ্র্য সত্ত্বেও তার আত্মমর্যাদা, তার নির্ভীকতা, তার নিরুপায় অথচ সুদৃঢ় ভালবাসা, তার চরিত্রের সরসতা—সব মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ রজনীর মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে।

রোহিণী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দ্বিতীয়া অথবা প্রধানা নারী রোহিণী সমগ্র বাংলাসাহিত্যে সম্ভবতঃ বিতর্কিত চরিত্র। রোহিণীর মৃত্যু-পরিণতির জন্য বঙ্কিমকে বহু জনের কাছে বহু জবাবদিহি করতে হয়েছিল, শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, "আমার ঘাট হইয়াছে"।

রোহিণীর উপস্থাপনা, ক্রমবিকাশ এবং পরিণাম শিল্পসম্মত কিনা, সে আমাদের বিচার্য নয়। কিন্তু এই চরিত্রটির মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক হিন্দুসমাজের একটি চিরন্তন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। বাল্যবিধবার রূপতৃষ্ণা এবং জীবন-ভোগলিপ্সার প্রশ্ন হিন্দুসমাজে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হতে পারে; পুনর্বিবাহের অনুমোদনে যদি এই রূপোন্মাদ ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত না করা যায়, তাহলে তা কোন্ সর্বনাশের কালানল প্রধূমিত করে রোহিণী তারই উদাহরণ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে মাত্র বাল্যবিধবারূপেই উপস্থিত করেন নি, তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মিলিত হয়েছে ক্রূরতা। কাহিনীর প্রথমাংশে তার চরিত্রে কোমলতা, বেদনা ও গভীরতা সবই ছিল, কিন্তু প্রসাদপুরে যাওয়ার পর তার নৈতিক অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়েছে, রূপবান নিশাকরের প্রতি তার আকর্ষণ ভ্রমরীবৃত্তিরই পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে আশ্রয় করে অসংযত বৈধব্য ("বুঝি পানও খাইত") এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিবেগেরই পরিণাম নির্ধারণ করেছেন। তাই রোহিণীর বৈধব্যের প্রতি মমতা আকর্ষণ লেখকের উদ্দেশ্য

নয়, তিনি তার দুরন্ত বাসনা-পীড়নকেই ধিকৃত করেছেন। 'বিষবৃক্ষে'র হীরার সঙ্গে রোহিণীর একটি আত্মিক যোগ আছে।

বাল্যবিধবার পত্যন্তর গ্রহণে বঙ্কিমচন্দ্রের যদি সমূহ প্রতিবাদ থাকত, তাহলে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী অমনভাবে তাঁর মমতার অভিসেচনে স্নিগ্ধ হত না। লক্ষ্য করবার মত 'বিষবৃক্ষ'এ হীরার ইন্দ্রিয়পরতাই অভিশপ্ত হয়েছে, আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের সুতীব্র ধিক্কার লাভ করেছেন, কিন্তু 'বালনখরবিচ্ছিন্নপদ্মিনীবৎ' রোহিণীর উপর লেখকের দৃষ্টি যখন ঘৃণা জর্জরিত তখন মৃত্যুম্লান কুন্দকলিকাটির উপরে তাঁর অশ্রু শিশিরবিন্দুর মত বর্ষিত হয়েছে।

শান্তি

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক। স্বদেশসেবার ব্রত উদ্‌যাপন করতে সৈনিক প্রয়োজন। স্বদেশব্রতী সন্ন্যাসী সৈনিক—শান্তি, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, ভবানন্দ। নারীরূপে শান্তিকে আমরা সামান্যই দেখি। জীবানন্দ, ভবানন্দের পাশে সহকর্মী সন্ন্যাসী সৈনিকবেশে শান্তিকে স্বামী নবীনানন্দরূপে দেখতে পাই। এই পুরুষসুলভ ব্রতচর্চা শান্তির মৌল চরিত্রের অভিব্যক্তি।

চিরকালের নারীত্বের আদর্শ দেবী চৌধুরাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট বিশিষ্ট নারী শান্তির এই চরিত্রটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন সামাজিক নারীত্বের প্রতীক নয়। যে বঙ্কিমচন্দ্র শক্তিদীপ্ত বাঙালী জাতির উদ্বোধন আশা করেছিলেন—তাঁর কল্পনায় সেই জাতির নারীকেও মহাশক্তিসমুদ্‌ভূতারূপে সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। এরই আংশিক পরিচয় 'শ্রী'র মধ্যে, বটের দিদ্বল শাখায় তার দুরন্ত আবির্ভাব এবং স্বতন্ত্র বক্তব্য সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা দেবী চৌধুরাণীতেও কিছু পরিমাণে প্রকটিত।

শান্তি বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিময়ী মানসকন্যা। তার ক্রিয়াকলাপের যে আতিশয্য আছে, তা আদর্শপ্রবণতারই ফল, বস্তুধর্মিতার প্রশ্ন এখানে গৌণ। 'আনন্দমঠ' ভাবধর্মী উপন্যাস বলে চরিত্রচিত্রণেও বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুসীমা কিছু লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু তাই বলে 'শান্তি' চরিত্রকে সম্পূর্ণ কাল্পনিকরূপেও চিহ্নিত করা যায় না। অতীতে বাঙ্গালী নারীর বাহুবল এবং মনোবলও উপেক্ষণীয় ছিল না—'রায় বাঘিনী', 'দেবী চৌধুরাণী'রা তার প্রমাণ রেখেছেন।

বাঙ্গালীপ্রেমিক, ঐতিহ্যবিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র লোককথা, কিংবদন্তী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অতীতের বঙ্গনারীর শৌর্যকথা শুনেছেন আর 'শান্তি'র মধ্য দিয়ে সে দৃপ্ত নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

প্রফুল্ল

দেবী চৌধুরাণী বা প্রফুল্ল একটি কিংবদন্তীনির্ভর চরিত্র। উত্তরবঙ্গের এই বিখ্যাত নারীদস্যু সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি এবং সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যতমা মানসকন্যা প্রফুল্লকে গড়ে তুলেছেন। প্রফুল্ল যতখানি চরিত্র তার চাইতেও বেশী পরিমাণে আইডিয়া। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ যেন এই অসামান্যা নারীটির মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব অর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সংসারযাত্রার মধ্যে যে ভারতের চিরন্তন আদর্শ নিহিত: 'ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থাস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ' প্রফুল্ল তারই মূর্ত প্রতীক। বঙ্কিমসাহিত্যে এমন একটি তত্ত্বময়ী নারীচরিত্র আর রচিত হয় নি।

নিদারুণ দারিদ্র্যের পীড়ন, শ্বশুরবাড়ির অবমাননা, বঞ্চিত নারীত্ব এবং ভাগ্যবিড়ম্বনা এই সমস্ত অতি বাস্তব উপকরণ দিয়ে প্রফুল্ল চরিত্রের প্রাসঙ্গিক রূপ অঙ্কন করা হয়েছে। ভবানী পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে প্রফুল্ল চরিত্রের আর এক পর্যায় আরম্ভ। একাধারে সে পঞ্চতপা পার্বতীর মত ব্রতধারিণী। অন্যদিকে এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর নায়িকা। বহিরঙ্গে চরিত্রটি অতঃপর প্রখর বুদ্ধিশালিনী দুরন্ত দস্যুনেত্রী, অন্তরঙ্গে অগ্নিশুদ্ধা অপরূপা এক ভারতীয় বধূ, বাঙ্গালীর সংসারে যার আবির্ভাব বারে বারেই বঙ্কিমচন্দ্র কামনা করেছেন। মানবিকতা, তত্ত্বময়তা এবং রহস্যরোমাঞ্চের কেন্দ্রবর্তিতা—এই ত্রিধারার মিলনে প্রফুল্লচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র না হোক, সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছিতা নারীচরিত্র, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ শান্তি এবং শ্রী যুগ্মভাবেই এই চরিত্রের খানিকটা সমীপবর্তী।

পূর্বেই বলেছি প্রফুল্ল বস্তুসম্ভবা হয়েও ভাবলোকে সমুত্তীর্ণা, এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই শাস্ত্রনির্দেশিত পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রলক্ষ্মীকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের মঙ্গলঘট ধূপদীপ এবং শঙ্খধ্বনিতে বরণ করেছেন।

শ্রী

রাজা সীতারাম রায়ের স্ত্রী হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বনায় শ্রী সন্ন্যাসিনী। কোষ্ঠী-দোষে বাল্যে পরিত্যক্তা হয়েও স্বামীর প্রতি সুগভীর অনুরাগ পরিত্যাগ করা শ্রীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিজের 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে'—এই নিষ্ঠুর ভাগ্য-লিপি জানবার পর পলাতকা শ্রী বৈতরণীতে আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর প্রভাবে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটল। সন্ন্যাসের বর্মে নারীহৃদয়কে আচ্ছাদিত রেখে, নিরাসক্তির দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে শ্রী সীতারামের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁর 'চিত্তাবিশ্রামবাসিনী' হলেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন 'শ্রী'র সন্ন্যাসসাধনার ব্যর্থতা। সন্ন্যাসের নিষ্কামসাধনা মানুষকে শেখায় সর্বকর্মে সমভাব, অভেদ-দৃষ্টি। কিন্তু শ্রীর সেই ভেদবুদ্ধি দূর হয় নি তাই তিনি রাজমহিষীত্ব স্বীকার করতে পারেন নি, উপরন্তু নিরাসক্তির কঠিন ব্যবধান রচনা করে রাজার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে, রাজা ও রাজ্যের সর্বনাশের বীজই বপন করেছেন।

সম্ভবতঃ প্রফুল্ল এর বিপরীত দৃষ্টান্ত। সংসারবাসিনী হয়েও অন্তরে সন্ন্যাসিনী আকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের সাধিকা, প্রফুল্ল তাই গৃহধর্মের দীপশিখা, নিষ্কামা সন্ন্যাসিনী, শ্রী অন্যদিকে সীতারামের জতুগৃহে অগ্নিশলাকা।

বঙ্কিম উপন্যাসে প্রধান ও অপ্রধান পার্শ্বচরিত্র

দুর্গেশনন্দিনী : বিমলা

'দুর্গেশনন্দিনী'র নাটকীয় প্রারম্ভে শৈলেশ্বর মন্দিরে নায়ক জগৎসিংহের সঙ্গে বিমলার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। তিলোত্তমার সঙ্গিনী বিমলা 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা' জগৎসিংহ 'বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন, অথচ সচরাচর দাসী অপেক্ষা সম্পন্না।'[১] তিলোত্তমার নবানুরাগকে লক্ষ্য করে বিমলার পরিহাস পরে জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর নিভৃত মিলনে সহায়তা, উভয়ের প্রণয়ের গভীরতা সম্বন্ধে সস্নেহ কৌতুক, প্রভৃতি ঘটনা বিমলাকে তিলোত্তমার প্রিয়সখীরূপে প্রতিপন্ন করে। পরে অবশ্য ব্যক্ত হয় যে কোন গুরুতর কারণে বিমলা 'পরিচারিকা ও তিলোত্তমার সখীরূপে পরিচিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তিলোত্তমার বিধাতা'।[২]

তিলোত্তমা কিছু না জানিলেও বিমলা এ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই ঠিক মাতৃরূপে না হলেও স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ার মত একটি স্নিগ্ধ অথচ মমতানিষিক্ত সখিভাব তাঁর মধ্যে অনুভব করা যায়।

জগৎসিংহের নিকট লিখিত বিমলার পত্র থেকে জানা যায় যে তিনি একসময়ে মানসিংহের অন্যতমা মহিষী উর্মিলাদেবীর সহচারিণী ছিলেন; অবশ্য উর্মিলাদেবীর পতিপ্রেমে সখীর ন্যায় সহায়তা করবার তাঁর প্রয়োজন হয়নি, বরং উর্মিলাদেবীই তাঁর গুপ্ত প্রণয়ে সহায়তা করেছেন।

কপালকুণ্ডলা : শ্যামাসুন্দরী

নায়ক নবকুমারের অনুজা। মৃন্ময়ীরূপিণী কপালকুণ্ডলার সুরসিকা সংসারাভিজ্ঞা ননদিনী। এই শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি, বনবিহঙ্গী কপালকুণ্ডলা গৃহপিঞ্জরবন্দিনী হয়ে সুখী হতে পারেন নি। সাংসারিক সুখ, সন্তান, দাম্পত্য জীবন সবই তাঁর কাছে তাৎপর্যবিহীন।

শ্যামাসুন্দরীর পরম দুর্ভাগ্য এই যে তিনি কুলীনকন্যা। তৎকালীন কুলীনেরা নির্বিচারে ও অর্থলোভে শত শত কন্যার পাণিগ্রহণ করতেন—দু-চারজন ব্যতীত অবশিষ্ট পত্নীরা বিবাহের পর কখনো পতি সন্দর্শন লাভ করতেন কিনা সন্দেহ। সমগ্র জীবনে যদি দিনেকের জন্যও স্বামীদেবতার আবির্ভাব ঘটত—স্ত্রী যথাসর্বস্ব দিয়ে তার পরিতোষ বিধান করতে চাইতেন—তাঁকে বশীভূত করবার প্রাণপণ প্রয়াস করতেন।

১। : দুর্গেশনন্দিনী : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। ঐ

শ্যামাসুন্দরীর মধ্যেই এই দুর্ভাগিনী কুলীন দুহিতার দীর্ঘশ্বাস। তাঁরই পতি-বশীকরণের ওষুধ সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করে নিশিরাত্রে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির সাক্ষাৎ পান।

পেষমন্

পেষমন্ কপালকুণ্ডলার মতিবিবি ওরফে লুৎফুন্নিসার দাসী বা বাঁদী। মতিবিবি আত্মনির্ভরক্ষম জেদী ও দাম্ভিক। সখীর প্রয়োজন তার নাই, কারও আন্তরিক সখী হওয়া তার মতো আত্মসর্বস্বার পক্ষে সম্ভবও নয়।

আকস্মিকভাবে নিজ স্বামীকে নববধূ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে দেখে মতিবিবির উদ্‌ভ্রান্ত ভোগতপ্ত জীবন যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের সন্ধান পেল। হৃদয় উদ্বেল হল, পাথরে প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল। এই হৃচ্চাঞ্চল্য এবং তার ক্রমবিবর্তনের স্তরপর্যায় পরিস্ফুটিত করবার জন্য উপন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে পেষমন্ ও মতিবিবির সংলাপের এবং সান্নিধ্যের প্রয়োজনে ঘটেছে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মতি ও পেষমনের একটি সংক্ষিপ্ত সংলাপ স্মরণ করা যেতে পারে।

'বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

—বিবিজান! এ ব্যক্তি কে? যবনবালা উত্তর করিলেন 'মেরা শৌহর।'[৩]

উপন্যাসের চরিত্র যদি রজনীর রীতিতে আত্মকথক হয়, তা হলে তার মানস-দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য সহায়ক চরিত্রের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যে চরিত্র লেখকের দ্বারা বর্ণিত—তার উদ্‌ঘাটনে অন্যতর চরিত্র অত্যাবশ্যক। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে পেষমনের অবতারণার মধ্যে লেখকের একটি কাব্য-কৌশল বর্তমান। মতিবিবির পেষমনের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিনায়িকার মনোভাব পরিবর্তনের ইতিহাস আমরা বুঝতে পারি। মতির মনোভাব পাঠকের গোচর করানোর এই কৌশলটি খুব স্বাভাবিক হয়েছে।

পেষমনের ব্যক্তিগত চরিত্র অবশ্য দাসদাসীশ্রেণীর চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদ মতিবিবির পরিত্যক্ত অলঙ্কারের প্রতি পেষমনের লোভের কথা এবং ৩য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত পোষাকলাভের কথা পেষমনচরিত্রের স্বাভাবিক দৌর্বল্যের পরিচায়ক।

৩। কপালকুণ্ডলা: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

মৃণালিনী :

গিরিজায়া

'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া পরিচারিকা এবং বান্ধবীর এক অপূর্ব সমন্বয়।

ভিখারিণী গিরিজায়াকে প্রথমে নায়িকার দূতীরূপেই আমরা দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই গৌড়দেশে, হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটীতে। হেমচন্দ্রের গুরুদেব মাধবাচার্য কর্তৃক লুক্কায়িতা নায়িকা মৃণালিনীর সন্ধানে নায়ক হেমচন্দ্রের দ্বারা এই ভিখারিণী নিয়োজিতা হয়েছে। (১ম খণ্ড, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ)

তারপর থেকেই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর বিরহবার্তার আদানপ্রদান সঙ্গীতের মাধ্যমে। দুটি ব্যাকুল প্রেমিকপ্রেমিকার গানের বাণী ও সুরকে বহন করেছে গিরিজায়া। এইভাবেই ভিখারিণী গিরিজায়া অসীম মমতাময় হৃদয়ের সহৃদয়তায় ও সমবেদনাবোধে ধনীকন্যা মৃণালিনীর প্রিয় সখীত্বে উন্নীত হল। তারপর নিরাশ্রিতা মৃণালিনী সেই চরম দুঃখের দিনে গিরিজায়াকেই তার একমাত্র সহায়িকা, সান্ত্বনাদায়িনী ও সঙ্গিনীরূপে পেয়েছেন। গিরিজায়া মৃণালিনীর সুখদুঃখের সমভাগিনী, মৃণালিনীর জন্যই সে হেমচন্দ্রের কাছে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রণয়ের তীব্র বেদনা, সন্দেহসংশয়, প্রীতি-মিলন সমস্ত কিছুরই সাক্ষী গিরিজায়া।

গ্রন্থকার বলেছেন—"গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে ভিখারী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না।"[৪]

সত্যই প্রভেদ ছিল না। মৃণালিনী ভিখারিণী গিরিজায়াকে সখীরূপে পেয়ে ধন্য। কিন্তু গিরিজায়া বার বার নিজেকে মৃণালিনীর দাসী বলেই স্বীকার করেছে। পরে মৃণালিনীর সুখৈশ্বর্যের দিনে মৃণালিনীর পরিচর্যায়েই নিযুক্ত হয়েছে হেমচন্দ্রের প্রিয়ভৃত্য দিগ্বিজয়কে পতিরূপে গ্রহণ করে।

দিগ্বিজয়

উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রের পরম বিশ্বাসী ভৃত্য ও একান্ত অনুগত নিত্যসঙ্গী। হেমচন্দ্রের সর্বপ্রকার খেয়ালখুশীর ও দুর্দিনের সে অনুগামী। ভৃত্যের সেবা,

৪। মৃণালিনী : ৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

সহৃদয় সহায়তা, প্রীতি ও শাসনে দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর গোপন বিবাহ ও প্রেমের কণ্টকপথের সুখদুঃখের সাক্ষী দিগ্বিজয়। দিগ্বিজয়-এর প্রসঙ্গে সময়ক্ষেপ লেখক বিশেষ করেন নি। কিন্তু কয়েকটি ইঙ্গিতেই তার পরিচয় পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট। দিগ্বিজয়ের জীবনের পরম পুরস্কার মৃণালিনীর দুঃখের দিনের একান্ত সঙ্গিনী ভিখারিণী গিরিজায়া। দিগ্বিজয় গিরিজায়ার প্রণয়প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে একটি অতিরিক্ত কৌতুকস্নিগ্ধ মাধুর্য বিকিরণ করেছে।

মাধবাচার্য

মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের গুরু। ভগবদ্গীতার কর্মযোগের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। মনে হয় মাধবাচার্যের চরিত্র এই আদর্শের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীর সূত্রধার তিনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আশাআকাঙ্ক্ষার ছায়া কোথাও পড়ে নি। অন্ততঃ কর্মযোগীর জীবনে সে অবকাশও নেই। মাধবাচার্যের সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষায় ব্যাপৃত। এ চেষ্টার সহায়কারী হিসাবে তিনি আপনশিষ্য হেমচন্দ্রের বীর্যবত্তায় আস্থাবান। আর সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি যখন যা করণীয় মনে করেছেন বিনা দ্বিধায় দৃঢ়তার সঙ্গে তা সাধন করেছেন। হেমচন্দ্রের চিত্তকে স্বদেশরক্ষাব্রতে একমুখী করবার জন্য মৃণালিনীকে কৌশলে অপসারণ তার দৃষ্টান্ত, এই কার্যে মাধবাচার্যের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না, শিষ্যকে মহত্তর কর্মোদ্যোগে প্রেরণা দেবার জন্যই তিনি তাঁর ব্যক্তিসুখের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

গুরু মাধবাচার্যের চরিত্র মহারাষ্ট্রের মহানায়ক শিবাজীর বাল্যজীবনের শিক্ষক দাদাজী কোণ্ডদেব এবং পরবর্তীকালের রামদাস স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিক থেকে তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের স্বনামখ্যাত গুরুদেব বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের সঙ্গেও কিছুটা তুলনীয়।

মহম্মদ আলী

জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে বাতায়নপথে শ্মশ্রু ও উষ্ণীষধারী যে চিত্রবৎ যবন-সৈনিকের মূর্তি দেখে হেমচন্দ্র সচকিতচিত্তে শয্যাত্যাগ করেন এবং ব্যর্থ

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তিনিই মহম্মদ আলি। বিচক্ষণ এবং বীর পুরুষ মহম্মদ আলি বখ্‌তিয়ার খিলিজীর দূতরূপে ধর্মাধিকার পশুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সেনবংশকে ধ্বংস করে যবনরাজের অধীনে গৌড়ের শাসনকর্তা হবার জন্য কৃতঘ্ন পশুপতি তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। তারপর সেই চক্রান্তের সূত্র ধরে বিনাযুদ্ধে নবদ্বীপ বখ্‌তিয়ারের করতলগত হয় এবং নিরীহ নগরবাসীর শোণিতপ্লাবনে প্রক্ষালিতপদ পশুপতি তাঁর বাঞ্ছিত পুরস্কারের আশায় বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি।" ধূর্তচূড়ামণি বখ্‌তিয়ার পশুপতিকে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিতে বলেন এবং পশুপতি স্বখাতসলিলে নিমজ্জিত হন। বখ্‌তিয়ারের এই শঠতার জন্য মহম্মদ আলিও প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং পাঠান সেনাপতির এই চক্রান্তজাল থেকে তিনি অনুতপ্তচিত্তে পশুপতির মৃত্যুর উপায় করে দেন। অবশ্য তখন আর পশুপতির মুক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। ভয়াল মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

বিষবৃক্ষ :

কমলমণি

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথের ভগিনী। স্বামী শ্রীশচন্দ্র এবং শিশুপুত্র সতীশকে নিয়ে কলকাতায় তাঁর সুখের সংসার। স্বভাবতই: ভাগ্যবতী কমলমণি প্রাণরসে সজীব ও উজ্জ্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালিনী এবং সঙ্কটের সময় তাঁর গাম্ভীর্য ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ঘটনা পরিণতিতে কমলমণি বিশেষভাবে আলোড়িতা হয়েছেন, কারণ একদিকে তাঁর সূর্যমুখীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, অন্যদিকে কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা।

এইজন্যই সঙ্কটকালে ইনি কুন্দকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সমস্যার একটি সমাধান করতে চেয়েছেন। নগেন্দ্র দত্তের অগ্নিবলয়িত সংসারের প্রেক্ষাপটে কমল ও শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্য-সুখের শান্তিকুঞ্জে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

কমলমণি রূপেগুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় নগেন্দ্রেরই সুযোগ্যা ভগিনী। কিন্তু নগেন্দ্রের হটকারী বাসনাবেগ তাঁর মধ্যে না থাকায় একটি শোভন সৌন্দর্যে চরিত্রটি মণ্ডিত হয়েছে।

হীরা

'বিষবৃক্ষে'র একটি দাসী-চরিত্র। কিন্তু 'পদ্মপলাশলোচনা' এই নারী সাধারণ দাসীমাত্র নয়, উপন্যাসে সে একটি প্রধান ব্যক্তিত্ব। কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশে তাঁর অনন্য ভূমিকা। বালবিধবা হীরাদাসী রোহিণীর মতই বুদ্ধিমতী ও প্রভূত গুণশালিনী হয়েও অন্তরের অতৃপ্ত রূপপিপাসা তার মধ্যে একটি মৃত্যুরন্ধ্র রেখে দিয়েছে। বৈষ্ণবীবেশী দেবেন্দ্রকে অনুসরণ করতে গিয়ে সে সেই পাষণ্ডের অসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু দেবেন্দ্র একান্তভাবে কুন্দের অভিলাষী, সেইজন্য কুন্দ সম্পর্কে তার মনে জাগ্রত হয়েছে ঈর্ষা—সেই ঈর্ষা নিজের বঞ্চনা ও ব্যর্থতার বীভৎস প্রতিহিংসার রূপ পরিগ্রহ করেছে। শেষ পর্যন্ত সে কুন্দনন্দিনীর হাতে বিষপাত্র তুলে দিয়েছে এবং দেবেন্দ্রর মৃত্যুশয্যা চিরকণ্টকিত করার জন্য সে দেখা দিয়েছে উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে।

বিষবৃক্ষের মূল বক্তব্য আত্মসংযম, প্রকৃতিশাসনা এই প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলেই বিষতরু অঙ্কুরিত হয়। একদিকে আত্মদমনে অক্ষম নগেন্দ্র চূড়ান্ত দুঃখের মূল্যে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—অনাথা কুন্দর মৃত্যুর দায়িক হয়েছেন, অন্যদিকে রূপবতী, গুণবতী, খরবুদ্ধিশালিনী হীরা এই তরুর বিষফলে জর্জরিত হয়েছে—হীরা ও দেবেন্দ্রের কলুষিত প্রেম 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নারকীয় পরিবেশ রচনা করেছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সিদ্ধান্তবাক্য পরিস্ফুটনে হীরাদাসী একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। তবু সমাজলঙ্ঘনের ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছে। হীরা দেবেন্দ্রর বাসনাবহ্নিতে আত্মসমর্পণ করবার আগে বহুবার আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে—নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সর্পদৃষ্টিবন্দী হরিণের মতো নিরুপায়ভাবে দেবেন্দ্রর কামনানলে আত্মাহুতি দিয়েছে। তারপরেই শুরু হয়েছে তার দুঃসহতম দহন —বিধাতার দণ্ড তার ওপরে এসেছে নিষ্ঠুরতম রূপে কখনো অর্ধ-চেতনা, কখনো উন্মত্ততার মধ্য দিয়ে আমৃত্যু যে দুর্গতি তাকে ভোগ করতে হল, তা তুষানলে প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গেই তুলনীয়।

যুগলাঙ্গুরীয় :

রাজা মদনদেব

যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে তাম্রলিপ্তের অধিপতি। ন্যায়বান ও বিচক্ষণ রাজা-রূপে তিনি এই উপন্যাসের নাট্যাংশে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জ্যোতির্গণনার ফলে শ্রেষ্ঠীদম্পতি হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের যে বিবাহোত্তর পঞ্চ-বার্ষিকী আবশ্যিক বিচ্ছেদ, তার পরবর্তী অধ্যায়ে উভয়ের মিলনের অংশে তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে হিরণ্ময়ীর সতীধর্ম পরীক্ষা করেছেন—হিরণ্ময়ী এবং পুরন্দরকে যথাকালে পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজসুলভ মর্যাদাবোধের সঙ্গে উপচিকীর্ষা এবং সরলতার সংমিশ্রণে মদনদেবকে আদর্শ নৃপতিরূপে নির্ণয় করা যায়।

ধনদাস

ধনদাস অত্যন্ত সম্পন্ন শ্রেষ্ঠী। বাণিজ্যের দ্বারাই তাঁর লক্ষ্মীলাভ। এই জন্যই একদিন যেমন ধনদাস ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠলেন, তেমনই তাঁরই জীবনের শেষাংশে সেই বিপুল ধনরাশির শেষ কপর্দক ঋণের দায়ে বিক্রীত হল। এক-মাত্র আদরিণী কন্যা হিরণ্ময়ীকে অবশেষে মাতাপিতৃহারা এবং গৃহশূন্যা অবস্থায় দাসী অমলার উপরেই জীবনধারণ করতে হল।

স্বীয় অন্তরের সুখদুঃখ ভাবনাযন্ত্রণা সম্বন্ধে ধনদাসের চরিত্র সম্পূর্ণ বহিঃ-প্রকাশহীন। আপাতদৃষ্টিতে মানুষটিকে কঠোরপ্রকৃতি মনে হয়, যেন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বেদনা সম্বন্ধে একটা নির্মম ঔদাসীন্যে তিনি নীরব। কিন্তু গুরুদেবের নিকটে হিরণ্ময়ীর ভাগ্যলিপি জানবার পর তার বিবাহ সম্বন্ধে ধন-দাসের রহস্যপূর্ণ আচরণ পিতৃহৃদয়ের সুগভীর ভাবনা ও মঙ্গলপ্রচেষ্টারই পরিচয় দান করে।

আনন্দস্বামী

আনন্দস্বামী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। হিন্দু সন্ন্যাসীর মত ইনিও আপন জপ তপস্যায় রত এবং উদাসীন। কিন্তু শিষ্যের প্রতি এবং শিষ্যের সংসারের প্রতি তাঁর কল্যাণদৃষ্টি মায়ের মত সদাজাগ্রত। পরিবারের জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক গুরু তাঁদের কল্যাণ এবং রক্ষায় সদা ব্রতী। জ্যোতির্গণনা অথবা পৌরোহিত্য

আনন্দস্বামীর বৃত্তি নয়। তথাপি শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীর কল্যাণের জন্য এবং দৈবাগত বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য আনন্দস্বামী হিরণ্ময়ীর ভাগ্যগণনা করেছেন এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে পরস্পরকে অপরিচিত এবং বিপৎকাল অবধি বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, সংকট উত্তীর্ণ হলে উভয়ের মিলন ব্যাপারেও তিনি শিথিল-প্রযত্ন নন। আনন্দস্বামী বৃহতের ধ্যানে মগ্ন তথাপি ক্ষুদ্র হিরণ্ময়ী ও তার ক্ষুদ্র লৌকিক দুঃখবেদনা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রচনা করেন নি। সন্ন্যাসীসুলভ পরোপচিকীর্ষা এবং পবিত্র-হৃদয়বত্তা তাই আনন্দস্বামীতেও সশ্রদ্ধভাবে আরোপিত হয়েছে।

চন্দ্রশেখর :

রমানন্দ স্বামী

সন্ন্যাসী রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের গুরু। বীতরাগ পরমহংস। লোকালয়ে তিনি অদৃশ্য, সংসার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। তাঁর আচরণে মনে হয়, জনসমাজের সঙ্গে এই জাতীয় সন্ন্যাসীর একমাত্র সম্বন্ধ নিষ্কাম লোকহিতৈষণার। সাধনা অর্জিত দেহমনের অমিত শক্তিতে এঁরা যেন বিশ্বতশ্চক্ষু, সর্বত্রগামী, সর্বভারবহনক্ষম। জননীর শাশ্বত স্নেহদৃষ্টির মতো এঁদের কল্যাণ-বর্ষী দৃষ্টি রক্ষাকবচের মত ঘিরে আছে মানুষকে। অদৃষ্টের শিকার জীবকে নিবিড় মমতায় এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীরা রক্ষা করতে চান। এইরূপ জনৈক সন্ন্যাসী আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত-প্রায় দেহে প্রাণসঞ্চারের দ্বারা সে যাত্রা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মজীবনের অভিজ্ঞতাবশতঃই এই সব সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং এঁদের চরিত্রঅঙ্কনে সেই শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট।

রমানন্দ স্বামী পরহিতব্রতেই চন্দ্রশেখরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন—এবং এই ব্রতসাধনে কিছু বিচারবিবেচনার অবকাশ ছিল, চন্দ্রশেখরের প্রতি রমানন্দ স্বামীর নিম্নোক্ত নির্দেশ তার পরিচায়ক—

'তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য কর। এই যবনকন্যা ধর্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার

পশ্চাদনুসরণ কর, যখন পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও।'[৫]

শৈবলিনীকে অনুসরণের মধ্যে রমানন্দ স্বামীর শিষ্যের প্রতি স্নেহ ও শুভৈষণাই প্রকট, সেইজন্য শৈবলিনীর রক্ষার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে এই মানবিকতার স্পর্শটুকু মধুর।

'রমানন্দ স্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, 'বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্যও আবার আমাকে সংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।"[৬]

লরেন্স ফস্টর

পুরন্দরপুর গ্রামের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশম কুঠির কুঠিয়াল। অল্প-বয়স্ক ও প্রিয়দর্শন ইংরাজ। ইংলণ্ডে থাকাকালীন মেরী নামক কোন তরুণীর প্রণয়ে ব্যর্থকাম হয়ে কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং পুরন্দরপুরে কুঠিয়ালরূপে নিযুক্ত হন। ফস্টর অর্থলোভী এবং পরদারলোলুপ, শৈবলিনীর রূপদর্শনে তার চিত্তবৈকল্য ঘটে এবং পাল্কী ও লাঠিয়ালযোগে চন্দ্রশেখরের গৃহ থেকে সে শৈবলিনীকে অপহরণ করে। এই হরণকার্যে অবশ্য শৈবলিনীরও পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল, কারণ, সেও 'প্রতাপপক্ষী' ধরবার উদ্‌ভ্রান্ত কামনায় যে কোনও একটা মুক্তিপথ সন্ধান করছিল, ফস্টর তার উপলক্ষ্য হল।

শৈবলিনীর মত কৌশলপরায়ণা নারীকে আয়ত্ত করা ফস্টরের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না এবং তা ঘটেও নি। কিন্তু ফস্টরের এই দুষ্কার্যের ফলেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূলকাহিনী-সংঘাত আরম্ভ হল, শৈবলিনীর জীবননাট্যে প্রতাপ পুনঃপ্রবেশ করল। আত্মকেন্দ্রিক চন্দ্রশেখরের বদ্ধদৃষ্টি উন্মীলিত হল, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের ভাগ্যসূত্র মীরকাশিম-দলনীর সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল। ফস্টর এই কাহিনীতে একটি জ্বলন্ত দীপ-শলাকা—যে নিজের অজ্ঞাতে বিপুল অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিয়েছে।

সাধারণভাবে, বহু দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইংরেজচরিত্রে যে সাহস ও সত্য-বাদিতা বঙ্কিমচন্দ্র নানাস্থানে পরিস্ফুট করেছেন ফস্টরের মধ্যে সেই সব গুণের সমাবেশ আমরা দেখতে পাই না। চরিত্রটি ইতর ও কাপুরুষোচিত

৫। চন্দ্রশেখর : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

৬। চন্দ্রশেখর : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

এবং মীরকাশিমের সম্মুখে তার চরিত্রদৈন্য সম্পূর্ণ প্রকটিত হয়েছে।

বস্তুতঃ লরেন্স ফস্টরের চরিত্রকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন নীলকুঠির কুঠিয়ালদের স্মরণ করেছেন। এই লোভী এবং হিংস্র নীলকরের দল ইংরাজ-চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কলেপন করেছে এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণে এদের একেবারে বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কর্মসূত্রে এই নীলকরদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছিলেন। প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, নারীহরণকারী এবং দুর্দান্ত নীলকর হিলি সাহেবকে গ্রেপ্তার করা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মনে হয় লরেন্স ফস্টরের চরিত্রে তদানীন্তন নীলকর সম্প্রদায় এবং বিশেষ ভাবে হিলিসাহেবের ছায়াপাত ঘটেছে।

কুলসম্

'চন্দ্রশেখরে' কুলসম্ দলনী বেগমের দাসী বা বাঁদী। সে আস্‌মানী পেষমনের উন্নত সংস্করণ, অধিকতর পূর্ণতা ও নিপুণতার সঙ্গে রচিত হয়েছে। তার চরিত্রে গভীরতার পরিমাণও বেশি।

আমরা ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কুলসমকে দলনীর পার্শ্বে প্রথম দেখি। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সংবাদে নবাবের বিপদাশঙ্কায় দলনী আতঙ্কিতা। যুদ্ধ যাতে বন্ধ হয় এজন্য নবাবের দক্ষিণহস্ত গুর্গণ খাঁর কাছে তিনি পত্র পাঠান। গুর্গণ খাঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎকারের জন্য নায়িকার সহায়িকা একজন দাসীর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনসাধনের সহৃদয়া সহায়িকা কুলসম্। ভ্রাতা গুর্গণ খাঁর ষড়যন্ত্রে নবাবমহিষী দলনী যখন নিতান্ত নিঃসহায় হয়ে রাজপথে দাঁড়ালেন তখন সেই অন্ধকার নিরুপায় রাত্রিতে তাঁর একমাত্র সহায় ও অবলম্বন কুলসম্ করুণাময়ী সখীর মত তাঁকে সান্ত্বনা দিল ও তাঁর দুঃখে অংশ গ্রহণ করল। তারপর অনেক বিচিত্র ঘটনার পর উভয়ে ইংরেজের হাতে বন্দী হলেন। দলনীর মুক্তি আসন্ন হলে নবাবের ভয়ে ও ইংরেজ সেনাপতি ফস্টরের প্রতি আসক্তিতে কুলসম্ আত্মবিস্মৃত হয়ে দলনীর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। তারপর তকি খাঁর ষড়যন্ত্রে নবাবের নির্দেশে দলনীর আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে কুলসম্ তীব্র অনুশোচনায় নবাবের দরবারে দাঁড়িয়ে আত্মদোষ স্বীকার করে সমস্ত সত্য অকপটে প্রকাশ করে। গভীর সমবেদনা ও অনুতাপের যন্ত্রণায় কুলসম্ মীরকাশিমকে মূর্খ নবাব বলে সভায়

দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে ধিক্কার দিতেও দ্বিধা করে নি। সাহস, দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়ানুরাগ ও সমবেদনা বাঁদী কুলসমকে গৌরবান্বিত আসনে স্থান দেয়। সকলের সম্মুখে দলনীর নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তির ইতিহাস বর্ণনা করে (ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। জন স্ট্যালকার্টকে লরেন্স ফস্টর বলে চিনিয়ে দিয়ে এবং আমদরবারে দাঁড়িয়ে মহম্মদ তকির নামে দলনী হত্যার নালিশ জানিয়ে কুলসম্ ব্যাকুল যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে প্রতিশোধের দাবী করেছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনা কুলসমের চরিত্রগত মহত্ত্বের ও অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন হয়ে আছে।

রজনী :

রামসদয় মিত্র

রজনী উপন্যাসের প্রাচীন জমিদার। নায়ক শচীন্দ্রনাথের পিতা, বয়স ৬৩ বৎসর। তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের গৃহিনী, উনবিংশতিবর্ষীয়া লবঙ্গলতা। রামসদয় লবঙ্গলতার নয়নমণি—তরুণী পত্নীর পরিচর্যায় বৃদ্ধবয়সেও তিনি যেন নবীনত্বের মধ্যে বিরাজ করতেন। প্রথম যৌবনে রামসদয় উদ্ধত ও দুর্বিনীত ছিলেন। পিতার পরম হিতকারী ও সহোদরতুল্য মনোহরদাসকে তিনি 'সহনাতীত অপমান' করেন। মনোহর, মিত্র পরিবারের সংশ্রব পরিত্যাগ করে চলে যান। তার ফলে রামসদয়ের ক্রুদ্ধ পিতা সম্পত্তি সম্পর্কে যে উইল রচনা করেন, তাতেই 'রজনী' উপন্যাসে বিষয়সম্পত্তিগত জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং ঘটনাক্ষেত্রে অমরনাথকে পদক্ষেপ করতে দেখা যায়।

রামসদয় নিজেও কর্মযোগী ছিলেন! পিতৃসম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও কিছু পত্নীধনের ওপর নির্ভর করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মীলাভও করেন। কিন্তু পিতাপুত্রের সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না। পিতার আকস্মিক লোকান্তরে পুত্র যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হন, কিন্তু তখন আর কিছুই করণীয় ছিল না।

মূল কাহিনীতে আমরা লবঙ্গলতার যত্নলালিত ভাগ্যবান একটি বৃদ্ধ স্বামীকে দেখি। সম্পত্তি হারানোর ভয়ে কাতর হয়ে রজনীকে বিবাহ করবার জন্য শচীন্দ্রকে অনুনয় করতে দেখি। এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই না।

সন্ন্যাসী

রজনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাসী চরিত্র রয়েছে। এই সন্ন্যাসীর পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষায় কিছুটা দেওয়া যেতে পারে।

"আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা। মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে। রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলোকাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসীজাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু।......"[৭]

"...সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে।—শচীন্দ্র।"[৮]

এইসব করার পেছনে সন্ন্যাসীর একটা নিজস্ব যুক্তি আছে। সে যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। শচীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসীর যুক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল :

"আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে হাতের রেখা দেখিয়া কেহ এ পর্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে হাত দেখিতে: প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে।"

সন্ন্যাসীর ভারতীয় শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, এ দৃষ্টিভঙ্গীই বঙ্কিমের নিজস্ব। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় বহু বিশ্বাস ও পদ্ধতিকে অশ্রদ্ধেয় মনে হলেও, সূক্ষ্মবিচারে তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতি ও সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনেও এইরকম সন্ন্যাসী সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ঘটেছে। যাঁরা অযাচিতভাবে অকস্মাৎ এসেছেন,

৭। রজনী : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৮। রজনী : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৯। রজনী : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অলৌকিক শক্তির দ্বারা উপকারসাধন করেছেন অথচ বাস্তববিচারে এগুলি অবিশ্বাস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সংস্কৃত। তিনি এই কারণে নিছক বিশ্বাসের দ্বারাই চালিত হননি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এদের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের মধ্যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা সন্ধান করেছেন, রজনীর সন্ন্যাসী সেই মানসিকতায় উদ্ভূত। ইনি জ্ঞানপ্রেমী, তত্ত্বসন্ধানী, পরোপকারী, ভগবদ্‌পথের পথিক। কিন্তু সন্ন্যাসের আড়ম্বর তাঁর কিছু নেই এবং বীততৃষ্ণ হলেও তিনি লোকসমাজ ত্যাগ করেন নি।

কৃষ্ণকান্তের উইলঃ

নিশাকর

নিশাকর "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের জনৈক যুবক বন্ধু। অতিশয় রূপবান এবং বিচক্ষণ পুরুষ। প্রসাদপুর কুঠিতে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রমোদনিবাসে সর্বনাশসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁরই কৌশলে রোহিণীর অপমৃত্যু।

মাধবীনাথ

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ সরকার মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। অতি সুপুরুষ এবং অতি চতুর—শত্রুমিত্রনির্বিচারে তাঁর চাতুর্যকে ভয় করত।

গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্তা অসুস্থ কন্যার দুরবস্থা দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে এর প্রতিকার করবেন "নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না, ভ্রমরও মরিবে।"[১০] তারপর সুকৌশলে গ্রাম্য পোস্টমাস্টার এবং ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে তিনি রোহিণী ও গোবিন্দলালের অবস্থানসংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এবং যথাকালে নিশাকর সমভিব্যাহারে প্রতিশোধকামনায় তিনি প্রসাদপুরে যাত্রা করেছেন।

অতীব চতুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ গ্রাম্য জমিদাররূপে মাধবীনাথের চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

১০। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

হরলাল রায়

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল রায়। দুর্দান্ত দুর্বিনীত। "আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।"[১১] হরলালের চরিত্র বোঝবার পক্ষে পিতৃসমক্ষে তার এই উক্তিই যথেষ্ট।

জমিদার পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল এবং নির্বিবেক সন্তানের প্রতিনিধি হরলাল। বিষয়ের লোভে কোনো অন্যায়েই সে পশ্চাদ্‌পদ নয়, ভাই-ভগ্নী-জননী প্রত্যেককে বঞ্চনা করতে সে সদা প্রস্তুত, জাল জুয়াচুরিতেও তার নৈপুণ্য অসীম। এই জাতীয় মানুষ অন্যের দুর্বলতারও সন্ধানী, তাই রোহিণীর অন্তর্গূঢ় আকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে বিধবাবিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে সে কাহিনীকে তার ভয়াবহ পরিণতির মুক্তিমুখ খুলে দিয়েছে।

এই চরিত্র একেবারে প্রত্যক্ষভাবে সমাজজীবন থেকে আহৃত, বঙ্কিম-চন্দ্রের অন্যতম মুখ্য শঠ (villain) ব্যক্তিত্বরূপে হরলাল স্মরণীয়।

বিনোদলাল রায়

কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু হরলালের ন্যায় লোভী এবং স্বার্থপর নয়। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত যখন হরলালকে বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চেয়েছেন ("তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে এবার শূন্য পড়িবে") তখন বিনোদলাল তার প্রতিবাদ করেছেন। চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও বিবেচক এবং বুদ্ধিমানরূপে উপন্যাসে নির্দেশিত।

দেবী চৌধুরাণী :

সাগর বৌ

এই সুন্দরী কিশোরী ধনীর দুলালী ব্রজেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা প্রফুল্ল নির্বাসিতা, দ্বিতীয়া নয়নতারা রূপ এবং গুণে কদর্যতার ছবি, সুতরাং স্বামীপ্রেমে ভাগ্যবতী সাগর বৌ। ধনী শ্বশুর আর অর্বাচীন পিতার মনোভেদের জন্য সাগরকে অধিকাংশ সময় থাকতে হয় পিত্রালয়ে। কিন্তু যত অল্পবয়সী এবং সরলই হোক স্বামীসেবা অপেক্ষা কোনো ঐশ্বর্যের সুখই যে মেয়েদের জীবনে প্রধান নয় প্রফুল্লর কাছে সাগরের আক্ষেপই তার পরিচায়ক—

১১। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' : ১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

"আমার অদৃষ্ট মাটির ভাঁবের মত তাকে তোলা থাকব। দেবতার ভোগে কখন লাগিব না।"[১২]

সাগরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর প্রফুল্লর মনে হ'ল—"সাগর দিব্য মেয়ে সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না।"[১৩]

সাগরের প্রকৃতি মধুর, বালিকাস্বভাব, কৌতুকপ্রিয়। হিংসাবিদ্বেষশূন্য দরদী মনের সঙ্গে সরলতা মিশে চরিত্রটিকে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য দান করেছে। বস্তুতঃ প্রফুল্লর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে স্বামীপ্রেম ও স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে এই কিশোরীর সহৃদয় সহায়তা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিই অনেকখানি দায়ী। ধনের অহঙ্কার না থাকলেও ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য সাগরের ছিল। তারই জোরে সাগর ব্রজেশ্বরকে বলেছিল—"আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা………"[১৪] দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত ছিলেন, পরে তাঁরই প্রচেষ্টায় একটি কৌতুকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর এই মনোভঙ্গের নিরসন ঘটে।

এই অংশে সাগরচরিত্রে যেন ভ্রমরের ছায়া বিদ্যমান।

নয়নতারা

শ্বশুরবাড়ীতে নয়নতারার নামকরণ হয়েছে 'কালপেঁচা'। সাগর বৌ বলে তার "রূপ দেখে আমার কান্না পায়।"[১৫] এই নয়নতারার মুখের জ্বালায় ব্রজেশ্বর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে চান না, আর ছেলেমেয়েরা পালিয়ে বেড়াতে চায়। প্রফুল্লকে পরিত্যাগের পর এই কন্যাটিকেই বধূ করে আনতে হয় ব্রজেশ্বরের। এই দ্বিতীয়া বধূটিই ঘরের 'ঘরণী গৃহিণী।'

লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান

রংপুরের কালেক্টর গুড্‌ল্যাড সাহেব এই লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনানকে সসৈন্যে বিশ্বাসঘাতক হরবল্লভের সঙ্গে দিয়েছিলেন দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার

১২। দেবী চৌধুরাণী: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

১৩। দেবী চৌধুরাণী: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

১৪। দেবী চৌধুরাণী: ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

১৫। দেবী চৌধুরাণী: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

করার জন্য। কিন্তু দেবীরাণীর কৌশলে হরবল্লভসহ ব্রেনান দেবীর বজরায় বন্দী হন। কাপুরুষ হরবল্লভ যখন মৃত্যুভয়ে কাতর তখন অকুতোভয় ইংরাজের চরিত্রশক্তি আমরা ব্রেনানের মধ্যে দেখতে পাই। দেবী চৌধুরাণী যখন শেষপর্যন্ত তাকে মুক্তি দেন তখন দাম্ভিক ইংরেজের মনে হয়েছে, "ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙালীর এত কি ভরসা?"[১৬] এই অংশেও ব্রেনানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। রঙ্গরাজ যখন তাকে পথখরচ বাবদ শত স্বর্ণমুদ্রা দেয় তখন মর্যাদাবান্ ইংরেজ তা থেকে মাত্র পাঁচটি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "এ আমি কর্জ্জ লইলাম।"[১৭]

হরবল্লভ রায়

দেবী চৌধুরাণীর নায়ক ব্রজেশ্বরের পিতৃদেব। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী জমিদার ও সমাজপতি। কুলীন ব্রাহ্মণ, সমাজের দোহাই দিয়ে নিরপরাধা পুত্রবধূকে গৃহ থেকে বিতাড়ন করতে তাঁর বিন্দুমাত্র চিত্তদৌর্বল্য জাগে না। কিন্তু বস্তুতঃ লোকটি প্রচণ্ড লোভী ও স্বার্থপর, বিশুদ্ধ বকধার্মিক। যে দেবী চৌধুরাণীর অনুগ্রহে তিনি কয়েদবাস থেকে পরিত্রাণ পেলেন, তাঁর ঋণ শোধ করা দূরে থাক—অসংকোচে তিনি ইংরেজের গোয়েন্দা হতে পারলেন, দেবী রাণীকে ধরিয়ে দেবার চক্রান্তে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করলেন। হরবল্লভের ভীরুতা, নীচতা ও লোলুপতা তথাকথিত সমাজপতিদের সম্পর্কে বঙ্কিমের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

প্রফুল্লর শ্বশ্রূমাতা

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে হরবল্লভ রায়ের গৃহিণী এবং ব্রজেশ্বরের জননী বাঙালীর ঘরের স্বাভাবিক পুরনারী। স্বামীর ইচ্ছার দ্বারা তিনি প্রভাবিত কিন্তু হরবল্লভের নীচতা এবং শঠতা তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেই। প্রফুল্লকে প্রথমে তিনি গৃহে স্থান দিতে সম্মত না হলেও পরে পুত্রবধূর 'চাঁদমুখ' দেখে তাঁর হৃদয় দ্রাবিত হয়েছে। স্বামীকে সম্মত করাবার যথাসাধ্য চেষ্টাও তিনি করেছিলেন কিন্তু তার প্রয়াস সফল হয় নি। স্বাভাবিক সহৃদয়তা

১৬। দেবী চৌধুরাণী: ৩য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।

১৭। দেবী চৌধুরাণী: ৩য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।

এবং স্নেহ অথচ স্বামীর নির্দেশের কাছে একান্ত নিরুপায় বাঙালী পুরাঙ্গনার একটি স্বাভাবিক রূপ এই চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি।

সীতারাম ঃ

গঙ্গারাম

গঙ্গারাম 'সীতারাম' উপন্যাসের দ্বৈতনায়ক। পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রীকে কেন্দ্র করে সীতারাম আর গঙ্গারামের ভাগ্য বিধাতাপুরুষের এক নির্মম কৌতুকের মত একসঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থিবন্ধনের মূলে শ্রী। গ্রন্থিচ্ছেদন করেছে শ্রীর বিধিলিপি।

গঙ্গারাম বীর্যবান পুরুষ, সীতারামের বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য সেনাপতি বিশেষতঃ সীতারামই তাঁর প্রাণরক্ষা করে আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। কিন্তু ম্যাকবেথের লোভের বীজ গঙ্গারামের চরিত্রে। রূপলালসার রন্ধ্রপথে কি করে একটি চরিত্রবান বলিষ্ঠ বীর চরিত্র অধঃপতনের একটি একটি করে ধাপ দ্রুতবেগে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের শেষ সম্বলটুকু বিসর্জন দিয়ে নারকীয় জীবে পরিণত হয়, গঙ্গারাম তারই প্রতিচ্ছবি। গ্রন্থের প্রথমাংশে গঙ্গারামের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয়, শেষাংশে রমার রূপের আগুনে দগ্ধ পতঙ্গ গঙ্গা-রামের ভস্মাবশেষ।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার

ইনি রাজা সীতারাম রায়ের গুরু ও রাজকার্যের উপদেষ্টা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁর চরিত্রে আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদ্যা, নিষ্ঠা; সংযম, সততা ও ত্যাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, রাজনীতিজ্ঞের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কৌশল এবং রাজমন্ত্রীর সুগভীর বিশ্বস্ততা, যা রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনায় স্থির ও সজাগ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন— "·········বামুনগিরির সমান সব আছে। ·········আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।"[১৮]

১৮। সীতারাম: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাধর স্বামী

হস্তিগুম্ফাবাসী ত্রিকালজ্ঞ ধ্যানমগ্ন যতিপুরুষ। বাইরের সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে গুহামধ্যে তিনি আত্মস্থ ও 'মৌনী হয়ে আছেন।' নিস্পৃহ বিরাগী এই পরমহংসও হিন্দুধর্মের, দেশের মঙ্গলচিন্তায় বিরত নন, উপরন্তু তাঁর ত্রিকালদর্শিতা তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছে। অত্যন্ত স্বল্প-ভাষী ইনি, ধ্যানভঙ্গ হলে প্রয়োজনীয় সামান্য কথা সংস্কৃত ভাষায় বলেন। তাঁর সেই স্বল্পভাষণের মধ্য দিয়েই তিনি শ্রী ও জয়ন্তীকে সীতারামের নিকট যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, সেই অনুচ্চারিত উদ্দেশ্য হয়ত সীতারামের কল্যাণ, হিন্দুরাজ্যের কল্যাণ।

শাহ্ সাহেব

মুসলমান ফকির। অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী এবং হিংস্রপ্রকৃতির। ফকিরের সম্মান ও স্বীকৃতি সর্বত্র। দেশের শাসনশক্তি তাঁর ইচ্ছাধীন। সন্ন্যাসের প্রতি ভারতীয়ের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ দেশের মুসলমান হিন্দু সকলের নিকটই ফকির সম্মানিত। মানুষের শ্রদ্ধা ফকিরকে যে অমিতশক্তি দান করেছে, শাহ্ সাহেব তার অপব্যবহার করে নিরপরাধ গঙ্গারামকে কাজীর সাহায্যে মৃত্যুর পথে পাঠাতে চেষ্টা করেছেন।

চাঁদ শাহ্

ফকির চাঁদ শাহ্ সীতারামের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। এঁর প্রকৃতি শাহ্ সাহেবের বিপরীত। নিঃস্বার্থ, নিরাসক্ত এঁর ব্যক্তিত্ব, সর্বপ্রকার মানুষের মঙ্গলপ্রয়াসই চাঁদশাহের লক্ষ্য। এই ফকিরের চরিত্রে একটি আশ্চর্য বিশ্বস্ততা আমাদের মুগ্ধ করে। ফৌজদার তোরাব খাঁ এবং সীতারাম উভয়ের কাছেই চাঁদ শাহের যাতায়াত এবং উভয়ের সঙ্গেই হৃদ্যতা। কিন্তু এই ধর্ম-প্রাণ মানুষটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সীতারামেরই নগররক্ষক গঙ্গারাম যখন প্রভু এবং আত্মীয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তোরাব খাঁর সহায়তায় উদ্যত হ'লে অন্যায়কারীর সে অপরাধকে চাঁদ শাহ্ ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না—ধর্মপ্রাণ ও উন্নতচরিত্রের মানুষমাত্রেই

যে জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁর শ্রদ্ধার্হ ছিলেন, চাঁদ শাহের মধ্য দিয়ে এই সত্যটিও আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

রমা

রাজা সীতারামের কনিষ্ঠা মহিষী। রমার সৌন্দর্য, সরলতা, স্নেহমুগ্ধতা সবই বিস্ময় জাগায়। বঙ্কিম বলেছেন, "রমা যেন জলে ধোওয়া যুঁই ফুলটি।" সংসারানভিজ্ঞা এই অতিসরলা বালিকাটি একসময়ে সীতারামের বড আদরের ছিল। রাজমহিষীর দার্ঢ্য তাঁর ছিল না। স্বামী আর সন্তানের প্রতি মমতায় অন্ধ তাঁর মনে রাজ্য, প্রজা, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে কোন চেতনাই ছিল না। অতি সাধারণ একটি পল্লীবধূর মমতা, ভীরুতা আর অজ্ঞতায় সে আচ্ছন্ন। তার অতুলনীয় সৌন্দর্য আর এই প্রকৃতিই তাঁর সর্বনাশের সূচনা করল। স্বামীপ্রেমের ঐশ্বর্য হারিয়ে মৃত্যুবরণেই রমার সকরুণ পরিণতি, রাজমহিষীর ভুলের সুকঠিন প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্গতঃ সতীশ মিত্র মহাশয়ের "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" সীতারামের যে স্ত্রীদের সংবাদ পাওয়া যায় হয়ত রমা তাদেরই একজনের স্মরণে সৃষ্ট।

(যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নন্দা

নন্দা সীতারামের দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথমা পত্নী শ্রী বিবাহের পরেই পরিত্যক্তা, সুতরাং নন্দাই রাজমহিষীর পদে বৃতা। বীর্যবান ও ধর্মিষ্ঠ হিন্দুরাজার যোগ্যা মহিষী নন্দা। রাজঅন্তঃপুরের রক্ষয়িত্রী তিনি। সেখানকার সমস্ত কর্তব্য তিনি ঈর্ষাবিহীন উদার অন্তরের পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে পালন করেছেন। রমা সপত্নী হলেও নন্দার যথোচিত সেবা, যত্ন ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন নি। রাজার নির্মম অবহেলা সত্ত্বেও স্বামীর সেবাপরায়ণতা থেকে নন্দা কখনও বিচ্যুত হন নি। কঠিন বিপদের দিনেও এই ধৈর্যশীলা নারীর বিশেষ ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখা যায় নি, উপরন্তু অপরকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে আপন হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে দৃঢ়ভাবে সংযত করেছেন। নন্দার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র রাজমহিষী রূপকেই পরিস্ফুট করেছেন, রমণীহৃদয়কে রেখেছেন যবনিকার অন্তরালে।

ইন্দিরা :

রমণবাবু

'ইন্দিরা' উপন্যাসে ইন্দিরার আশ্রয়দাত্রী পরম গুণবতী, রূপসী ও দয়ার্দ্রচিত্তা সুভাষিণীর স্বামী। উচ্চশিক্ষিত সুহৃদয় যুবক—সুভাষিণীর সঙ্গে তাঁর রাজ-যোটক হয়েছে বলা যায়। জীবিকায় তিনি উকিল। একান্ত পত্নীপ্রাণ ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামী উপেন্দ্রের পুনর্মিলন ব্যাপারে স্ত্রীর কৌশলে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন। বুদ্ধিমান, সুরসিক, পরোপকারী। 'ইন্দিরা' উপন্যাসের কাহিনী-পরিণামে তাঁর কৃতিত্ব ও গুরুত্ব অনেকখানি। রমণবাবুর চরিত্রটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শিক্ষিত ও রুচিবান তৎকালীন যুবকের মনোজ্ঞ প্রতিকৃতি করেছেন—একটি আদর্শ দাম্পত্যজীবনও আভাসিত হয়েছে।

হরমোহন দত্ত

'ইন্দিরা' উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরার পিতা। 'বুনিয়াদী বড় মানুষ'। নিজের ঐশ্বর্য সম্পর্কে অহঙ্কারী, তাই বিবাহিতা কন্যা উনিশ বৎসরে পদার্পণ করলেও তাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নাবস্থার শ্বশুরালয়ে পাঠাতে রাজী হন নি : "আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক……এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি ?"[১১] হরমোহনের এই দাম্ভিকতার সঙ্গে পিতৃস্নেহের অন্ধতাও মিশেছে।

জামাতা বিদেশে গিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে ফিরে এলে এবং বধূকে নেবার জন্য সুসজ্জিত পাল্কী ও ভোজপুরী দারোয়ান পাঠালে হরমোহন "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" বলে বিদ্রূপ করেছেন। স্বল্প ইঙ্গিতের সাহায্যেই বঙ্কিমচন্দ্র হরমোহনের মধ্যে ঐশ্বর্যাভিমানী ধনী জমিদারের চরিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন।

রামরাম দত্ত

রামরাম দত্ত কলকাতার একজন ধনী গৃহস্থ। তাঁর পুত্রবধূ সুভাষিণীর সহৃদয়তাতেই ইন্দিরা শেষ পর্যন্ত তাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। 'অতি ভদ্রলোক'

১১। ইন্দিরা : ১ম পরিচ্ছেদ।

তাঁর সম্পর্কে সংশয়বাতিকগ্রস্তা প্রৌঢ়া গৃহিণীর কিছু আশঙ্কা থাকলেও তিনি 'জিতেন্দ্রিয়'। নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপ্রিয় এবং পরোপকারী মানুষ। তা ছাড়া সুরসিক, গৃহিণীর দুর্বলতা জেনে মধ্যে মধ্যে তাঁকে একটু ক্ষ্যাপাতেও ভালোবাসেন: "ও কালোরূপ আর রাতদিন ধ্যান করিতে পারা যায় না।"[২০]

রামরাম-গৃহিণী

ইন্দিরা উপন্যাসের একটি চমৎকার চরিত্র। এই বয়স্কা মহিলাটির কিঞ্চিৎ সন্দেহ-ব্যাধি আছে—অত্যন্ত অকারণেই তিনি সংযতচিত্ত মার্জিতরুচি প্রৌঢ় স্বামী সম্পর্কে শঙ্কিতা। এই বাতিকের জন্যই তিনি সুন্দরী এবং যুবতী ইন্দিরাকে প্রথমে গৃহে স্থান দিতে আপত্তি করেছিলেন। অথচ অতিশয় পুত্রবৎসলা এবং স্নেহপরায়ণা, যেহেতু তাঁর পুত্র বামন-ঠাকরুণের রান্না মুখে দিতে পারেন না সেজন্য ইন্দিরাকে আশ্রয় দিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া পুত্রবধূর বুদ্ধি ও বিবেচনায় তাঁর আস্থা আছে। এক সংশয়ব্যাধির জন্যই ইন্দিরার মতে, "কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি ভরা"[২১] এখানে ইন্দিরার বর্ণনাটি উপভোগ্য। "...পাটীর ওপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি (কালির) বোতলটির টিনের ঢাকনির মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।"[২২]

রামরাম-গৃহিণীর আর একটি দুর্বলতাও আছে। মাথায় রাশিরাশি পক্ককেশ সত্ত্বেও নিজের বয়স তিনি স্বীকার করতে চান না: "আবার বেটীরা বলে, সব চুলই পাকা"।[২৩] শেষ পর্যন্ত কলপের জাদুমন্ত্রে ইন্দিরা তাঁকে বশ করেছে। "তিনি নিজের বহুকাল পরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বালা "ইন্দিরা" কে 'বকশিস' দিয়েছেন।"[২৪] লেখক দত্তগৃহিণীর মধ্যে কৃপণতা, নির্বুদ্ধিতা ও বাতিকগ্রস্ততার একটি রসায়িত সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চরিত্রটি জীবন্ত, স্বাভাবিক

২০। ইন্দিরা: ৭ম পরিচ্ছেদ।
২১। ইন্দিরা: ৭ম পরিচ্ছেদ।
২২। ইন্দিরা: ৭ম পরিচ্ছেদ।
২৩। ইন্দিরা: ১৯ পরিচ্ছেদ।
২৪। ইন্দিরা: ১৯ পরিচ্ছেদ

সময়। অবস্থাপন্ন বাঙালী অন্তঃপুর সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিজ্ঞতায় একটি সুন্দর
।

কামিনী

'ইন্দিরা' উপন্যাসের নায়িকা 'ইন্দিরা'র কনিষ্ঠা ভগিনী। বয়স সতের। সুরসিকা। উপন্যাসের প্রথম অংশে এই চরিত্রটির কোন দায়িত্ব নেই। রামরাম দত্তের গৃহ থেকে স্বামী উপেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দিরার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কামিনীর সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে সাক্ষাৎ হয়। কামিনী একটি কৌতুকোজ্জ্বল চপল চরিত্র। হাসি কৌতুক এবং বাকচাতুর্যে সে উপযুক্তভাবে রসিকা শ্যালিকার কর্তব্যপালন করেছে। কামিনী বাংলাদেশের সেই আদর্শ শ্যালিকা, যার কণ্টক এবং মাধুর্য যে কোন ভগ্নীপতির কাছে একাধারে পরম আকর্ষক এবং একান্ত আতঙ্কজনক।

বিশেষতঃ বাসরদৃশ্যে কামিনী তার নিজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

হারাণী

'ইন্দিরা' উপন্যাসের ছোটবড় দুই সংস্করণেই হারাণীকে ইন্দিরার দূতীরূপে দেখা যায়। ছোট 'ইন্দিরা'র ব্যাপারটা তেমন নির্দোষ নয়। তবে সেখানে ইন্দিরার সুভাষিণী সখীর অভাবে ইন্দিরাকেই একাই মামলা তদ্বিরের সব ভার নিতে হয়েছে, হারাণী "রামরামদত্তের পরিচারিকা" রূপে এই প্রণয় ব্যাপারে দূতির কাজ করেছে।

কিন্তু গৃহস্থবাড়ীতে এরূপ ঝি থাকা দূষণীয়; বড় 'ইন্দিরা'য় হারাণী চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন করে দিলেন। এই পরিবর্তনটি হারাণী চরিত্রকে একটি সুন্দর মাধুর্য ও তেজস্বিতায় বিশিষ্ট করে সাধারণ দাসীচরিত্র থেকে উন্নীত করেছে।

বড় 'ইন্দিরা'য় সে সুভাষিণীর 'খাস ঝি'। সুভাষিণী প্রয়োজন হলেই তাকে দিয়ে রমণবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। গৃহস্থঘরের দূতীগিরি এই পর্যন্তই চলে। যদিও হারাণী মালিনীর মত, "চল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল তাতেই হাসি, একটু তিরবিরে।"[২৫] কিন্তু ইন্দিরা অপরিচিত ভদ্রলোকের

২৫। ইন্দিরা: ৮ম পরিচ্ছেদ।

(নিজের স্বামীর) সংবাদ আনবার কথা তাকে বলামাত্র হারাণী "একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল।"[২৬] হারাণী দৃঢ়স্বরে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বসল। শেষে ইন্দিরার কান্নায় বিচলিত হয়ে বৌঠাকুরাণীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে বুঝলো 'দোষ নেই।' সেই বিশ্বাসেই হারাণী ইন্দিরার পত্রহারী দূতী হল এবং হেসে ইন্দিরাকে বলে গেল—"যদি এ জন্মের (স্বামী) হন, তবে আমি পাঁচশত টাকা বক্‌শিস্ নিব, নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।"[২৭] তারপর হারাণীর সহায়তায় ইন্দিরার অভিসার যাত্রা।

আখ্যায়িকার শেষ অংশে গ্রন্থকার হারাণীর দোষ স্খালনের জন্য আবার সুভাষিণীর মারফত আমাদের গোচর করেছেন। "হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম। কিন্তু এরকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মন্দেই রাজি হই।"[২৮]

"হীরা, মালতী গোয়ালিনী, ফুলমণি নাপিতানী, মুরলা প্রভৃতির সহিত তাহার চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়।"[২৯]

এই চরিত্রবল তার আছে বলেই সে সুভাষিণীর দাসী হতে পেরেছে এবং উপেন্দ্র-ইন্দিরার মিলন ব্যাপারে সুভাষিণী তাকে দৌত্যকার্যে নিয়োজিত করেছেন।

রাজসিংহ ঃ

মাণিকলাল সিংহ

রাজসিংহ উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা আকর্ষক এক অপূর্ব কর্মোদ্যোগী, শৌর্যবীর্য, প্রভুভক্তি এবং চাতুর্যে মাণিকলাল তুলনারহিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ধর্মাধর্ম অনাবশ্যক'—মাণিকলাল এই বাণীটির মূর্ত বিগ্রহ। আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে

২৬। ইন্দিরা ঃ ৮ম পরিচ্ছেদ।

২৭। ইন্দিরা ঃ ১৩শ পরিচ্ছেদ।

২৮। ইন্দিরা ঃ উপসংহার, ২২শ পরিচ্ছেদ।

২৯। সখী ঃ শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের সর্পিলক এবং 'দশকুমার চরিতের' বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে মাণিকলালের তুলনা করা চলে। সর্পিলক মদনিকাকে বলেছিলেন, "অপণ্ডিতে! সাহসে শ্রী প্রতিবসতি" এবং এই সাহস সিদ্ধির জন্য যে কোন কর্মপন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে, ধর্মাধর্ম সেখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। মাণিকলাল সিংহ এই ঐতিহ্যেরই সার্থকনামা উত্তরপুরুষ।

ইংরাজীতে যাকে 'কুইক্ অ্যাক্সন' বলে মাণিকলাল তারই পক্ষপাতী। দস্যুতা থেকে রাজভৃত্য হতে তার কয়েক মুহূর্তমাত্র সময় লাগে। বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে নিজ অঙ্গুলিচ্ছেদনে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে না, এমন কি প্রেম ও বিবাহের মত জটিল ব্যাপারও সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পত্তি করে ফেলে। অনায়াস লঘুতার সঙ্গে নির্বোধ নূর মহম্মদ খাঁকে তক্তপোষের তলায় মূষিকদংশনের স্বর্গসুখ দান করে, তার পোষাক, হাতিয়ার, অশ্ব অপহরণ করে। তারপর যথারীতি দিল্লীযাত্রিণী চঞ্চলকুমারীর শিবিকার পশ্চাতে স্থান করে নিয়ে নিপুণভাবে হরণ কার্যটির সমাধা করে এবং যথোচিত চাতুর্যের সঙ্গে মোগলভক্ত বিক্রমসোলাঙ্কীর সৈন্যকে মোগলের উপরই লেলিয়ে দেয়। বস্তুতঃ রাজসিংহ উপন্যাসে মাণিকলাল সর্বাপেক্ষা সক্রিয় এবং সজাগ চরিত্র। তার দিল্লীর দৌত্য এবং যথাকালে পলায়ন, মৃত্যুমুখী মবারকের প্রাণরক্ষা এবং গিরিকন্দরে যুদ্ধের সময় অতুল বীরত্ব এবং ধূর্ততার সহযোগে ঔরংজেবের সমগ্র হারেমকে রাজসিংহের অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সে যেন অঘটনসংঘটক। একদিকে এই বুদ্ধিচাতুর্য এবং বীরত্ব ও অন্যদিকে মাতৃহীনা কন্যার প্রতি স্নেহ, অবিচল প্রভুভক্তি এবং পত্নীপ্রেম সমস্ত মিলে মাণিকলাল চরিত্রটি অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই বীরপুরুষটির মধ্য দিয়ে যেমন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই চাণক্য-নীতির সম্যক্ উদাহরণ দেখিয়েছেন, অন্যদিকে ঔদার্য, মহত্ত্ব ও স্নেহপ্রেমের সমাবেশে তার মধ্যে এক মহৎ মানবতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মাণিকলালকে সম্যক্ অনুধাবন করতে হলে মবারকের প্রাণরক্ষার দৃষ্টান্তগুলি স্মরণ করলেই যথেষ্ট।

দরিয়াবিবি

রাজসিংহ উপন্যাসের একটি জটিল ও নাটকীয় চরিত্র। তরুণী রূপসী দরিয়াবিবি বাহ্যতঃ দিল্লীনগরে সুগন্ধির পসারিনী, মূলতঃ মোগল অবরোধে সংবাদ বিক্রয়কারিণী। মনসবদার মবারক আলি খাঁর সে বিবাহিতা পত্নী, স্বামীর নিয়ত কল্যাণপ্রার্থিনী। সে সুন্দরী সুগায়িকা, বহুগুণবতী। কিন্তু মবারক মধুপান তৃপ্তভৃঙ্গের মতো তাকে পরিত্যাগ করে জেব-উন্নিসার লালসা ও রূপবহ্নিতে মৃত্যুমুখী। সম্রাটকন্যার বিষাক্ত প্রণয়ের পাশমুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত দরিয়া ও মবারকের পুনর্মিলনও সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু চক্রান্ত ও ঘটনাচক্র তাঁকে নিয়ে গেল সর্পপিঞ্জরে। নবজীবন-লব্ধ মবারকের জীবনে পুনঃপ্রবেশ ঘটল অনুতাপবিদ্ধা জেব-উন্নিসার। নাটকের শেষাঙ্কে যবনিকা পড়ল উন্মাদিনী দরিয়ার নিক্ষিপ্ত গুলিতে মবারকের মৃত্যুতে।

প্রবল প্রতাপান্বিতা সম্রাটনন্দিনী ও দীনদরিদ্রা আতরওয়ালীর এই প্রণয়দ্বন্দ্বে জীবনের মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত হয়েছে—রচিত হয়েছে এক প্রবল নাটক। দরিয়া কোনও বিশেষ সামাজিকতার প্রতিনিধি নয় এক বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নারী-হৃদয়ের যন্ত্রণাই তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত। দরিয়ার চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দরিয়া যে কোনও উচ্চাঙ্গের বিষাদান্ত নাটকের নায়িকার সঙ্গে তুলনীয়া।

কমলাকান্তে রদপ্তর ঃ

প্রসন্ন গোয়ালিনী

'কমলাকান্তে'র একটি চমৎকার চরিত্র। ক্বচিৎ সাধু ঘোষের পত্নী—মঙ্গলা নামে একটি দুগ্ধবতী গাভীর অধিকারিণী এবং দই-দুধ-ক্ষীর বিক্রয় তার উপজীবিকা। এই প্রসন্ন ভবঘুরে কমলাকান্তকে একাধারে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে, বিনামূল্যে অহিফেনের অণুপান দুগ্ধও সরবরাহ করে। অবশ্য কখনো কখনো কলহভরে মূল্যও দাবি করে থাকে, কিন্তু সেটা আন্তরিক নয়।

প্রসন্ন চরিত্রটি দপ্তর, পত্র এবং জোবানবন্দিতে নানা ভাবে আবির্ভূত। বিশেষতঃ জোবানবন্দির গরু চুরির মোকাদ্দমায় তার এবং কমলাকান্তের অন্তর্গত সস্নেহ সম্পর্কটি অতি সুন্দর ও সরসভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'কমলাকান্ত' ভাবাশ্রয়ী ও প্রতীকধর্মী রচনা, তাই চরিত্রগুলি প্রায়শঃ পূর্ণ নয়। তারা আভাসমাত্র। তথাপি প্রসন্ন অনেকাংশে জীবিত—সে মুখরা এবং কলহকুশলা হয়েও যে অন্তরে স্নেহশীলা ও কমলাকান্তের প্রতি ভক্তিমতী, দপ্তর-পত্র জোবানবন্দীতে তা পরিস্ফুট। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও অর্ধ-সচেতনভাবে জীবন-স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন।

পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে নিরীহ পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন, "প্রসন্ন গোয়ালিনী কল্পিত"—এই রকম জনশ্রুতি আছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না গিয়েও এই চরিত্রটির সরল সৌন্দর্যই স্বয়ং দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মদেব খোশনবিশ

বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তরে' ভীষ্মদেব খোশনবীশ বার বার উল্লিখিত। কমলাকান্ত বিবাগী হওয়ার সময় এই ভীষ্মদেবকেই তাঁর অমূল্য দপ্তরটি 'বখশিস্' দিয়ে যান এবং এই ব্যক্তিই 'বঙ্গদর্শনে' দপ্তর নিয়মিত প্রকাশ করে কমলাকান্তকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। 'কমলাকান্তে'র ভূমিকায় ভীষ্মদেব শুধু কমলাকান্তের পরিচয়ই দেন নি, সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।"৩০

ভীষ্মদেব খোশনবীশ (জুনিয়র)

ভীষ্মদেবের পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর বিদ্যাবত্তার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেছেন (দ্রষ্টব্য—'কমলাকান্তের পত্র' 'কি লিখিব ?')। ইনিই 'ইউটিলিটি' শব্দের আশ্চর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "ইউ টিল ইট"—অর্থাৎ 'তোমরা চাষ করিয়াই খাও।' ইনি পরে কৃতবিদ্য হয়ে এম. এ পাশ করেছেন। তারপর এঁর বিদ্যা অঘটনঘটনপটীয়সী রূপ ধারণ করেছে। 'কি লিখিব' প্রসঙ্গে সেই দুরন্ত বিদ্বানের অলৌকিক প্রতি-ভার একটি দীর্ঘ তালিকা আছে, তার অংশবিশেষ এই রকম :

"তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ-পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক

৩০। কমলাকান্তের দপ্তর : শ্রীভীষ্মদেব খোশনবিশ।

একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে কোমত ও হার্বর্ট স্পেন্সারের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারউইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।"৩১

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ অন্তঃসারশূন্য তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কি মতবাদ পোষণ করতেন, এই চরিত্রই তার উদাহরণ।

সখ্য ও সৌহার্দ্যের সমাবেশ

এই পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে একটি উপবিভাগের আবশ্যকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রধানা নারীদের সহচরীরূপে, নায়কচরিত্রের সুহৃদ্‌রূপেও কিছু উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিদ্যমান। কেবল সামাজিক পর্যায়ে বিন্যস্ত করেই এদের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না। সখা বা সখীর ভূমিকায় এই সব চরিত্রে যে মাধুর্য ও সৌন্দর্যের একটি অতিরিক্ত দীপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে, তা থেকে এরা স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই একটু পৃথক্ ভাবে এদের পরিচয় দেওয়া হল।

সহৃদয় সহচর অথবা সহচরী মানুষের মনের ভাবনা-বাসনার ছায়াকে বহন করে। পাঠকের কাছে সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করবার সহায়তা করে সখী বা সুহৃদের সঙ্গে তাদের সংলাপ ও সাহচর্য। সুতরাং কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকাও বিশিষ্ট চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করবার জন্য সখী ও সুহৃদ্‌শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সাহিত্যে সখীর প্রয়োজনীয়তা নানা ভাবে হতে পারে তার একটি পর্যায়-ভাগও চলতে পারে।

ক) নিছক বয়স্যা হিসাবে দুর্গেশনন্দিনীর আশমানী ও বিষবৃক্ষের মালতী গোয়ালিনী প্রভৃতিকে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আশমানীর অন্যতর পরিচয়ও আছে। বিমলার সঙ্গে সুদীর্ঘদিনের সম্বন্ধের ফলে সে তার সুখদুঃখের সমভাগিনী।

৩১। কমলাকান্তের দপ্তর : ১ম সংখ্যা।

খ) অনেকক্ষেত্রে সখী সুখ-দুঃখের ভাগিনী শুধু নয় সহোদরার মত হয়ে উঠেছে। ইন্দিরায় সুভাষিণী, দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা, সীতারামে জয়ন্তী প্রভৃতিকে সখীত্বের এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে, ভিখারিণী গিরিজায়া প্রীতি ও সহৃদয়তায় ধনীর দুলালী মৃণালিনীর সখী ও ভগিনীস্থানীয়া।

গ) পরিচারিকা হয়েও নায়িকার বান্ধবীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এমন কয়েকটি চরিত্র পাই। কপালকুণ্ডলায় পেশমন্, চন্দ্রশেখরে কুলসম, মৃণালিনীতে গিরিজায়া প্রভৃতিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এই জাতীয় চরিত্র-গুলির অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ঘ) ইন্দিরায় সুভাষিণী, রাজসিংহে নির্মলকুমারী, মৃণালিনীতে গিরিজায়া প্রভৃতি নায়িকার সঙ্কল্পসিদ্ধির বিশেষ সহায়িকা। নায়িকার প্রতি এঁদের স্নেহপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ অসাধারণ।

ঙ) আরও কয়েকটি নারীচরিত্র পাওয়া যায় যারা আত্মীয়তার সূত্র ধরে নায়িকার অন্তরঙ্গ সখী হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর চরিত্র কমলমণি; শ্যামাসুন্দরী, বিমলা, নিমাইমণি প্রভৃতি।

বঙ্কিম-উপন্যাসে সুহৃদ্ বা বন্ধুশ্রেণীর পুরুষচরিত্র দুই-একটিই আছে। সেইজন্য অপ্রয়োজনবোধে তাদের পর্যায়ভুক্ত করা হল না।

পরবর্তী অংশে পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাদের স্বকীয়তা এবং কাহিনীতে তাদের দ্বারা কোন প্রয়োজন কতখানি সাধিত হয়েছে, উপন্যাসে তারা কি স্থান অধিকার করে আছে এবং তাদের ভূমিকা সেখানে মুখ্য বা গৌণ প্রভৃতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

লুৎফ-উন্নিসা

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবি বা পদ্মাবতীর আগ্রার পোষাকী নাম লুৎফ-উন্নিসা। উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তনে চরিত্রটি প্রতিনায়িকায় পরিণত হয়েছে। যদিও তিনি সেলিমের রাজপুতমহিষীর সহচারিণী ছিলেন কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে বহুদূরে অগ্রসর করে দিয়েছিল। "লুৎফা উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী"[৩২] ছিলেন। চক্রান্ত এবং

৩২। কপালকুণ্ডলা: ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

ক্ষমতাপ্রিয়তা তাঁর স্বভাবধর্ম, এ ব্যাপারে তিনি খসরু-জননীর সহায়িকা, সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার মিলন যাতে না হয়, সে সম্পর্কেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। এইরকম স্বার্থপর কূটবুদ্ধি চরিত্র সখীত্বগুণে কখনও বিকশিত হতে পারে না—লুৎফ-উন্নিসাও পারে নি।

মৃণালিনী

"মৃণালিনী"তে নায়িকা মৃণালিনী মথুরায় রাজকন্যার সখী ছিলেন। মৃণালিনী রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না। এ 'সখীত্বে'র কোন চিত্র নেই, কেবল মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে জলবিহারে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন হেমচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করেন।

মণিমালিনী

উপন্যাসের আখ্যানাংশে সখীত্বের কাল সর্বব্যাপী হলেও এই সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা বিভিন্ন ঘটনায় বোঝা যায়। হৃষীকেশের গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ও মৃণালিনী সখীসম্ভাষণ না করে যেতে পারেন নি এবং মণি-মালিনী সেদিন সরোষে দুশ্চরিত্র ভ্রাতাকেই ভৎর্সনা করেছিলেন। এই কোমলহৃদয়া স্নেহশীলা নারীকে মৃণালিনী কখনই ভুলতে পারেন নি; তাই উপন্যাসের 'পরিশিষ্টে' জানা যায়: "মৃণালিনী…মণিমালিনীকে আপন রাজ-ধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরীমধ্যে মৃণালিনীর সখীস্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।"

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মৃণালিনী ও মণিমালিনীর সখীত্বের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করেছেন:

"১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই 'দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন' ও কথোপকথন করিতেছিলেন। সংস্কৃতসাহিত্যে বহুনায়িকা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে আখ্যা-য়িকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও এক্ষেত্রে মৃণালিনীর চিত্রবিদ্যাপটুতার বেলায় সংস্কৃতসাহিত্যের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইংরেজী সাহিত্যে অনেক স্থলে নায়িকাকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী দেখা যায়।"[৩৩]

৩৩। সখী: শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণিমালিনী ও মৃণালিনীর সখীপ্রীতির চিত্র ক্ষুদ্র হলেও হৃদয়গ্রাহী ও উজ্জ্বল মধুর।

রত্নময়ী

মৃণালিনী নবদ্বীপে যখন পাটনীর গৃহে বাস করতেন, তখন পাটনীর যুবতীকন্যা রত্নময়ীর সঙ্গেও সখীত্বে আবদ্ধা হয়েছিলেন। তবে সামাজিক অবস্থার তারতম্যে রত্নময়ীর হৃদ্যতা গিরিজায়ার সঙ্গেই বেশী হয়েছিল।

'পরিশিষ্টে' দেখা যায়, রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিয়ে করে হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়ে বাস করতে থাকে। "মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল 'সই' 'সই' রহিল।"

চাঁপা

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চাঁপা ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুন্দনন্দিনীর জীবনে একমাত্র বান্ধবী। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পরে এই সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী চাঁপাই কুন্দের মানসিক দুর্ভাবনার ভার গ্রহণ করেছে—কুন্দ তার কাছে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বর্ণনা করে নিজের সারল্য এবং বিশ্বাসপরায়ণ মনটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গঙ্গাজল

মালতী গোয়ালিনীর সঙ্গে হীরার সখীত্বের 'গঙ্গাজল' সম্পর্ক। মালতীর চরিত্র বিশেষ উজ্জ্বল নয়—অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপারেও সে দৌত্যে প্রস্তুত। হীরার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তার 'গলায় গলায় ভাব।' কিন্তু এই সম্পর্ক যে কত অগভীর এবং স্বার্থকলুষিত, মালতীর সুকৌশলে হীরার ঘরে কুন্দর অবস্থান জেনে নিয়ে দেবেন্দ্রের কাছে সেটি প্রকাশ করে দেওয়ার মধ্যেই তা প্রকাশিত হয়।

হরদেব ঘোষাল

নগেন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ হরদেব ঘোষাল। দূরদেশে ইনি বাস করতেন।

কাহিনীতে এই চরিত্রটিকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই না। কুন্দ সম্পর্কিত নগেন্দ্রনাথের মুগ্ধতাও ক্রমশঃ তাঁর চিত্তদ্বন্দ্ব এই ঘোষাল মহাশয়ের কাছেই একমাত্র নগেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথের আত্মকথনের প্রয়োজনেই সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র অদৃশ্য হরদেব ঘোষালকে সৃষ্টি করেছিলেন।

হরদেব ঘোষালের একটি উত্তর আছে নগেন্দ্রের পত্রের। হরদেব নিস্পৃহ, মুক্তদৃষ্টি, নগেন্দ্রচরিত্রের সমস্ত অনুরাগ, বিরাগ, বিকৃতি তাঁর মনের দর্পণে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। হরদেবের এই চিঠির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বিশ্লেষণই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুরেন্দ্রনাথ

জমিদার দেবেন্দ্রনাথের মাতুলপুত্র এবং একমাত্র সুহৃদ্। স্ত্রী হৈমবতীর দুর্ব্যবহারে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ যখন অধঃপতনের চরমসীমায় অবতরণ করতে লাগলেন তখন এই সুরেন্দ্রনাথই তাঁর একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে বার বার তাঁকে সুপথে ফেরানোর চেষ্টা করেন। একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের সমবেদনা ও সদুপদেশেই দুশ্চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের চিত্তবিকারে অনুতাপের ছায়া পড়ত। সুরেন্দ্রের মদ ত্যাগ করার ব্যাকুল অনুরোধে দেবেন্দ্র একবার অশ্রুসজল চোখে বলেছিলেন—

"আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব।"[৩৪]

এই যুবক ধনবান্ হলেও অত্যন্ত সহৃদয় এবং গুণবান্, মদ্যাদির প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর স্নেহবশতঃই মদের জন্য মদ্যপকে ত্যাগ করতে পারেন নি। দেবেন্দ্র মনুষ্যত্বহীন হলেও সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে তার অনুরাগ গভীর। কিন্তু পরস্পরের এই গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রের কুন্দর প্রতি পাপ আকর্ষণের ফলে সুরেন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

৩৪। বিষবৃক্ষ : ১০ম পরিচ্ছেদ

সুন্দরী

"সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী।"[৩৫] শৈবলিনীর প্রতি সুন্দরীর সুগভীর ভালবাসা, অসীম মমতায় ও উদার ক্ষমায় তাকে সর্বপ্রকার দুঃখ, বিপত্তি, লজ্জা থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের মুগ্ধ করে। এই গ্রাম্যবধূ যদিও স্বভাবতঃই ভীরু-স্বভাবা, কিন্তু দুরন্ত শৈবলিনীকে ভালবেসে তাকেও দুঃসাহসিকা নাপিতানী হ'য়ে ইংরেজের নৌকায় উঠে শৈবলিনীকে রক্ষার চেষ্টা করতে হয়েছে। এই নারী অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাষিণী কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত মধুরস্বভাবা ও স্নেহশীলা। শৈবলিনী গৃহত্যাগ করবার পর সুন্দরী রাত্রিদিন শৈবলিনীর মৃত্যুকামনা করেও তারই রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট, আবার গৃহপ্রত্যাগতা উন্মত্তা শৈবলিনীকে সেবা দিয়ে মমতা দিয়ে সুস্থ করবার জন্য একান্ত ব্যাকুলা।

বসন্তকুমারী

বসন্তকুমারী রাধারাণীর প্রিয়সখী। উভয়ে সমবয়স্কা। রাধারাণীর পিতৃবন্ধু কামাখ্যানাথবাবুর কন্যা বসন্ত অত্যন্ত সহৃদয়া, কৌতুকপ্রিয়া ও বুদ্ধিমতী। পিতামাতার মৃত্যুর পর একান্ত নিঃসহায়া বালিকা রাধারাণীকে স্বগৃহে নিয়ে এসে কামাখ্যানাথ যখন কন্যার সঙ্গে সমান যত্নে ও স্নেহে শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন, তখন বসন্তর স্নেহ, মমতা, সহৃদয়তাই রাধারাণীর জন্য ছায়া ও শান্তির নীড় রচনা করেছে। সুরসিকা ও দরদী এই সখীরই সহৃদয় সহায়তায় রুক্মিণীকুমার ও রাধারাণীর ঈপ্সিত মিলন সম্ভব হয়েছিল।

চিত্রা

"রাধারাণী ও রুক্মিণীকুমার যে মুহূর্তে মালাবদল করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল। রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শাঁক বাজাইল কে?"[৩৬] তাঁহার একজন দাসী চিত্রা, উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি!"...চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।" বলা বাহুল্য যে তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী

৩৫। চন্দ্রশেখর : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৩৬। রাধারাণী : ৮ম পরিচ্ছেদ।

তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল। "ইহার পূর্বে বা পরে চিত্রার আর কোন প্রসঙ্গ নাই। এটুকু বাদে সে রাধারাণীর শিক্ষামত করিল, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নহে, তথাপি ইহাতে একটু মাধুর্য্য একটু চমৎকারিত্ব আছে।"[৩৭] এই ছোট ঘটনাটুকু থেকে মনে হয়, চিত্রা দাসী হলেও কিছু রসবোধসম্পন্না এবং একান্ত নিঃসঙ্গ ও একাকিনী রাধারাণীর মনের কিছুটা কাছাকাছি চিত্রা একটা স্থান করে নিতে পেরেছিল। চিত্রার প্রতি রাধারাণীর মনোভাবের মধ্যে দাসীত্বের সঙ্গে সখীত্ব যুক্ত হয়েছিল।

দিবা ও নিশি

'দেবী চৌধুরাণী'তে রূপান্তরিতা প্রফুল্লের দুই সহচরী, দিবা ও নিশা। এরা দেবীর পরিচর্যা করেছে, সঙ্গদান করেছে, সহধর্মিণীও হয়েছে।

এদের মধ্যে দিবার চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভ, সে পরিচারিকার সীমাতেই প্রধানতঃ আবদ্ধ, অশিক্ষিতা, দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাও তেমন নিবিড় নয়। পক্ষান্তরে নিশার সঙ্গে দেবীর হৃদয়সংযোগ নিবিড়—সেই প্রকৃত সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। নিশা বিদুষী, কৌতুক-পরায়ণা "প্রফুল্লর একপ্রকার সহাধ্যায়িনী" আবার শিক্ষয়িত্রীও ছিল।" সব চাইতে বড় কথা—নিশার এবং প্রফুল্লর আত্মিক ঐক্য একটি নিবিড়তর সূত্রে রচিত—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণা, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে দীক্ষিতা।

এদের সম্পর্কে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: "এই যুগলসখীর আবির্ভাব আমাদিগকে শকুন্তলার যুগলসখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।"[৩৮]

সীতারামের অন্যতমা পত্নী শ্রী "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হওয়ার আশঙ্কায় অজানার পথে পদক্ষেপ করল। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের পথে পাণ্ডার উপদ্রবে যাত্রীর দল পরিত্যাগ করে নিঃসহায়া শ্রী আত্মহত্যায় উন্মতা, তখন তার জীবনে

৩৭। সখী: ৩১ পৃষ্ঠা, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৮। সখী: শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর আবির্ভাব ঘটল।

দুইজন যেন পারস্পরিক প্রয়োজনেই সখীত্বে আবদ্ধ হল: "সন্ন্যাসিনী বিরাগিনী প্রব্রাজিতা। অনেকদিন হইতে তাহার সুহৃদ্ নাই। আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রাজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইল।"[৩৯]

এই সখীত্ব 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী এবং পরিণামে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

জয়ন্তী শ্রীকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছে, তার মনের কথা জেনেছে। তার "সহায়িনী ও সঙ্গিনী" হয়েছে। তারপর কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যায়ে শ্রীর জীবননাট্যে অংশ নিয়েছে। পরিশেষে "ভ্রাতৃশোকাতুরা" শ্রীকে সান্ত্বনা দান এবং তার দুঃখে সহায়তা করবার পর দুজনে একযোগে লোকালয় পরিত্যাগ করেছে। এর পরে শ্রী ও জয়ন্তীর সখীত্বের বিবরণ উপন্যাসে অনুল্লিখিত। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার জগতে তারা নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে এমন অনুমান করা যেতে পারে।

বঙ্কিম উপন্যাসে অনেক সন্ন্যাসীর ভীড়ে একমাত্র নারী সন্ন্যাসিনী। এই সন্ন্যাসিনীর মধ্যে লেখক শুধু তাঁর চিরন্তন সন্ন্যাসের আদর্শকেই পরিস্ফুট করেন নি; নারীর শক্তি আর আত্মিক ঐশ্বর্যের একটি সৌন্দর্যদীপ্ত তেজস্বিনী মূর্তি অঙ্কন করেছেন; এই অভিনব শক্তিময় সৌন্দর্যের সঙ্গে অলৌকিকতার ছায়া জয়ন্তীকে পরম রহস্যময়ী করে তুলেছে। বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসী বারবার এসেছেন কিন্তু কাহিনীতে তাঁদের আদর্শায়িত ব্যক্তিরূপের ছায়ামাত্র দেখতে পাই। কিন্তু সীতারাম উপন্যাসে জয়ন্তী শুধু দৈবী গুণে মহিমান্বিতা নয়, মানবিক দুর্বলতায় প্রাণবন্ত। চরমলজ্জার নির্মম আঘাতে সন্ন্যাসের নির্বিকার আসক্তি-শূন্যতার গোপন দম্ভকে লোকালয়ের আলোয় চূর্ণ করতে দ্বিধা করেন নি লেখক।

মনে হয় প্রফুল্ল বঙ্কিমসৃষ্ট অনুশীলনতত্ত্বের গৃহলক্ষ্মীরূপ আর জয়ন্তী অনুশীলনতত্ত্বের সন্ন্যাসিনীরূপ।

৩৯। সীতারাম: ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।

সুভাষিণী

ইন্দিরা ও সুভাষিণী প্রথম সাক্ষাতেই সখীত্ব রচনা করেছে। যেখানে আশ্রয়দাত্রী এবং আশ্রিতার মধ্যে উচ্চম্মন্যতা এবং হীনম্মন্যতার একটা দূরত্বই স্বাভাবিক ছিল, সেখানে সুভাষিণীর অপূর্ব সহৃদয়তায় ইন্দিরা মর্যাদার সঙ্গে পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছে। নামতঃ পরিচারিকা হলেও বস্তুতঃ ইন্দিরা সুভাষিণীর সখীত্ব ও শুভেচ্ছায়, তারই প্রয়াসে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পেরেছে, তার দুঃখরাত্রির অবসান ঘটেছে।

ইন্দিরা ও সুভাষিণীর সম্পর্ক বাংলাসাহিত্যে মধুরতম সখীত্বের উদাহরণ। সুভাষিণীর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত পরিবারের একটি সহৃদয়া বধূর অনন্ত অন্তরৈশ্বর্যের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এইরকম একটি সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান—এই সুহৃদয়া, গৃহকল্যাণী এবং সুরসিকা অন্তঃপুরিকাদের তিনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। এঁরাই বাঙালীসংসারের অন্তর-লক্ষ্মী, তাকে স্নিগ্ধ করেন—তার সংকট মোচন করেন। সখী সুভাষিণী এই কল্যাণদীপ্তিতে উজ্জ্বল। চরিত্রটি আমাদের বিষবৃক্ষের কমলমণিকে মনে পড়িয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—

"এক হিসাবে সুভাষিণীর সখীত্ব কমলমণির সখীত্ব অপেক্ষাও বড়, কেননা কমলমণির সখীত্ব নিজের ভাজের সঙ্গে, আর সুভাষিণীর সখীত্ব নিতান্ত নবপরিচিতার (অজ্ঞাতকুলশীলা বলিলেও চলে) সঙ্গে এই তুলনার কথা ছাড়িয়া দিলেও সুভাষিণী প্রথম শ্রেণীর সখীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, তাহা নিঃসন্দেহ।"[৪০]

নির্মলকুমারী

সখীরূপে বঙ্কিমের উপন্যাসসাহিত্যে দুটি চরিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল। এ দুটি হল যথাক্রমে ঐতিহাসিক উপন্যাসের নির্মলকুমারী এবং সামাজিক উপন্যাসের সুভাষিণী।

রাজসিংহ উপন্যাসের এই চরিত্রটি প্রথমদিকে রাজসখীর মতোই রঙ্গে

৪০। সখী: শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসে, যৌবনে উজ্জ্বল। কিন্তু উপন্যাস যখন ইতিহাস এবং নিয়তির দ্বৈত-তাড়নায় 'বজ্রস্তনিত রবে ফেনাইয়া ফেনাইয়া চলিয়াছে'। তখন নির্মলকুমারী ও চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সেই ভাগ্যস্রোতে, নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—গৃহকপোতীর মত বিলাপ করে নি। তার চাতুর্য, তার সাহস, তার উপস্থিত বুদ্ধি, সূর্যচন্দ্র নিষিদ্ধ মোগল অবরোধের বাসনা কামনা চক্রান্ত হিংস্রতার মধ্যেও নিজের জন্য সুমসৃণ গতিপথ রচনা করেছে, এমনকি বিশ্বত্রাস অপনিন্দেয় আলমগীর পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েছেন। নির্মলকুমারীর বিচিত্র কর্মোদ্যম এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যেও তার অন্তরে একটি ধ্রুব সঙ্কল্প অচঞ্চল হয়ে থেকেছে, তা হল চঞ্চলকুমারীর প্রতি শুভৈষণা; সখীর জন্য জীবনের সব সুখ, সব স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি আত্মপ্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া তার কাছে তুচ্ছ। সখীত্বের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাহিত্যে দুর্লভ।

এই গ্রন্থে অন্যপ্রসঙ্গে আলোচিত কয়েকটি চরিত্রের অতুলনীয় সৌহার্দ্যের কথাও এখানে স্মরণ করি।

আয়েষা কতলু খাঁর কন্যা। তিলোত্তমা কতলু খাঁর বন্দিনী, আয়েষার সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তবু আয়েষা তিলোত্তমার সবচেয়ে দুর্দিনে পরমবিশ্বস্তা প্রিয়সখীর কাজ করেছেন। তিলোত্তমা যখন কারাগারে জগৎসিংহের রূঢ় ব্যবহারে মূর্চ্ছিতা তখন জগৎসিংহের আহ্বানে সেখানে এসে তিলোত্তমার পরিচয় পেয়ে 'তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন, আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাতপাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।' লেখক আয়েষার এই মহৎ ব্যক্তিত্বে 'চমৎকার কারিণী পরহিত মূর্তিমতী'র করুণা, উদারতা ও ঈর্ষাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবি বা পদ্মাবতীর আগ্রার পোষাকী নাম লুৎফ-উন্নিসা। উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তনে চরিত্রটি প্রতিনায়িকায় পরিণত হয়েছে। যদিও তিনি সেলিমের রাজপুতমহিষীর সহচারিণী ছিলেন কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে বহুদূরে অগ্রসর করে দিয়েছিল। 'লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষ যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী' ছিলেন। চক্রান্ত এবং ক্ষমতাপ্রিয়তা তাঁর স্বভাবধর্ম, এ ব্যাপারে তিনি খসরুজননীর সহায়িকা

সেলিমের সঙ্গে মেহের-উন্নিসার মিলন যাতে না হয়, সে সম্পর্কেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। এইরকম স্বার্থপর কূটবুদ্ধি চরিত্র সখীত্বগুণে কখনও বিকশিত হতে পারে না—লুৎফ-উন্নিসাও পারেন নি।

'মৃণালিনী'তে নায়িকা মৃণালিনী মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। মৃণালিনী রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না। এ 'সখীত্বের' কোন চিত্র নেই, কেবল মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে জলবিহারে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন হেমচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করেন।

কমলমণি সূর্যমুখীর ননদিনী, অতএব উভয়ের মধ্যে সম্পর্কসিদ্ধ সখীর পাঠ প্রত্যাশিত; কিন্তু প্রণয়বেদনাজর্জরিতা কুন্দের হৃদয়ে কমলমণি ক্ষণ-সখীত্বের শান্তিবারি সেচন করেছেন। এই সখীত্বের পরিধি ব্যাপ্ত নয়, কিন্তু কমলের মধুর চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে মধুরতর হয়েছে।

উপন্যাসের চরিত্রচিত্রশালায় শ্রেণীবৈচিত্র্য

বঙ্কিমসাহিত্য 'চরিত্রচিত্রশালা'। সামাজিক জীবনভূমির সর্বপ্রান্তকেই তিনি স্পর্শ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভা এবং মানবচেতনা দুইই অসাধারণ। এই দ্বৈতপ্রেরণায়, কথাসাহিত্যের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে শিল্পভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু একদিকে ইতিহাসের ঐতিহ্য ও রাজকীয় গরিমায় সমুজ্জ্বল চরিত্রগোষ্ঠী তাঁর লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে কিছু শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মনের অন্তঃপুরেও তিনি আশ্চর্য কৌশলে অনুপ্রবেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরিজীবনের অভিজ্ঞতাও এই ভাণ্ডারকে আরো ঋদ্ধ করে তুলেছিল।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, সমাজ অথবা রোমান্স-এর যে উপাদানই অবলম্বন করুন না কেন তাদের প্রায় প্রতিটিকেই তিনি শিল্পোৎকর্ষে মণ্ডিত করতে পেরেছেন। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্ররচনা, অন্তর্বিশ্লেষণ এবং কবি ও দার্শনিকের সম্মিলিত দৃষ্টি এই সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণ বটে, কিন্তু এ ছাড়াও বঙ্কিম প্রতিটি উপন্যাসের অনুপুঙ্খ (details) নির্মাণেও সমান সজাগ ছিলেন। কারণ যে কোন সার্থক উপন্যাসই সমগ্রভাবে একটি ঐকতান—প্রধান-অপ্রধান প্রতিটি চরিত্রই একই সুরে যদি সমন্বিত না হয় তাহলে কাহিনীর মাধুর্য অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়ে যায়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন পটভূমি পরিবেশের প্রতিটি তুচ্ছ বিষয় সম্পর্কেও সচেতন তেমনি বিভিন্ন গৌণ ও প্রাসঙ্গিক চরিত্রের নির্মাণেও তিনি সজাগ রূপকার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে মূল চরিত্র ছাড়াও সংখ্যাতীত নরনারী উপস্থিত। এরা কখনও অভিজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে প্রত্যক্ষ, কখনও বা অসামান্য কল্পনায় সৃষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষবৎ। সামাজিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা জাজ্জ্বল্যমান, ঐতিহাসিক উপন্যাসে বা কপালকুণ্ডলা জাতীয় রোমান্সে, এরা কল্পনার দ্বারা সত্যরূপে প্রতিভাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাত্মক সমাজদৃষ্টির পরিচায়করূপে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে সংগৃহীত বিচিত্র চরিত্রের শ্রেণীবৈচিত্র্য আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

এই চরিত্র আলোচনার মধ্যে আমরা পর্যায়ভাগ করার রক্ষা চেষ্টা করেছি।

প্রথম ভাগটিতে উচ্চবিত্ত পর্যায়ের, দ্বিতীয় ভাগটিতে মধ্যবিত্ত পর্যায়ের চরিত্রসমাবেশ লক্ষ্য করা যাবে। পরবর্তী ভাগগুলিতে সর্বত্রই উপন্যাসের ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র ঊর্মিলাদেবী যোধপুরসম্ভূতা রাজপুত কন্যা। মানসিংহের তৎকালীন নবোঢ়া মহিষী। দিল্লীতে বাস করতেন। ইনি নানারকম কলাবিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণা ছিলেন। ঊর্মিলাদেবীর সহায়তায় ও সহৃদয়তায় বিমলা তাঁর সহচারিণীরূপে বিশেষ সুখী হয়েছিলেন। "বহু সৎ গুণ-বিশিষ্টা এই মহিষীর সম্বন্ধে বিমলার বিশেষ মুগ্ধতা ছিল।"[১]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে দিল্লীর মোগলরাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্ন এক পাঠান মুসলমান ওসমানের বাল্যকালে একবার বঙ্গদেশ থেকে দিল্লী গমনকালে কাশীধামে নৈশ আশ্রয়ের প্রয়োজনে বিমলার মাতার কুটীরে আশ্রয় পান ও বালিকা বিমলার সহায়তায় শিশুপুত্র ওসমানকে বালকচোরের হাত থেকে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞতাবোধে সহৃদয় এই পাঠানের সহায়তাতেই বিমলা পরে পিতার সন্ধান পান।

'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার শর্মার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তমদর্শনে যাওয়ার পথে পাঠানদস্যু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হয়ে পরে রাজপ্রাসাদে উচ্চপদস্থ হ'বার আকাঙ্ক্ষায় সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করে রাজধানী রাজমহলে গিয়ে বাস করেন।

'মৃণালিনী'তে শান্তসীল গৌড়ের ধর্মাধিকার পশুপতির 'দক্ষিণহস্ত', কোনো বিশিষ্ট সেনানায়ক। পশুপতির সঙ্গে বখ্‌তিয়ারের চক্রান্তে অন্যতম প্রধান চক্রী—সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করেছে, পশুপতির দৌত্যে তৎপর থেকেছে। এই ব্যক্তি লোভী, স্বার্থপর এবং বিবেকবর্জিত। মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কাম সিদ্ধ ক'রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

১। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

পশুপতির রাজ্যলাভের জন্য যে ব্যাপক ষড়যন্ত্র, তাতে রাজসভাস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কিভাবে সাহায্য করেছেন শান্তশীল, তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে মদন সেনের সহায়তার কথাও উল্লেখ করেছেন লেখক। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্লোক রচনা করে পুরাতন গ্রন্থে কৌশলে সংযোজিত করা হয় তাতে ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপ বর্ণিত হয়েছে। সম্প্রতি কাশী প্রত্যাগত মদনসেন যবনরাজপ্রতিনিধির যে বর্ণনা দিলেন, তা শ্লোকানুরূপ হওয়াতে যবনভীত বৃদ্ধরাজার বখ্‌তিয়ারকেই তাঁর গৌড়বিজেতা বলে স্থির বিশ্বাস হল। মদনসেন জ্ঞাতেই হোক অজ্ঞাতেই হোক এইভাবেই পশুপতির ষড়যন্ত্রের সহায়ক হল।

'বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেন্দ্রের ভগ্নীপতি কমলমণির স্বামী কলিকাতার কোন সাহেবী হৌসের মুৎসুদ্দী। একটি পত্নীপ্রাণ ভদ্রব্যক্তি, বন্ধুগণের মতে কিঞ্চিৎ 'স্ত্রৈণ'। স্ত্রী এবং শিশুপুত্র সতীশকে নিয়ে যে সুখের সংসার তিনি রচনা করেছেন, তা যেন নগেন্দ্রনাথের অভিশপ্ত পারিবারিক জীবনের একটি বৈপরীত্যবোধক (contrast) চিত্র। নগেন্দ্রের চরম দুঃসময়ে তিনি তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও সহায়তা দেবার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। তাঁকে অনেকখানি 'রজনী'র রমনবাবুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

হৈমবতী বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শঠচরিত্র দেবেন্দ্রনাথের ভার্যা। দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথেরই জ্ঞাতিভ্রাতা, দেবীপুরের জমিদার। ইনি হরিপুর জেলাবাসী জমিদার গণেশবাবুর কন্যা।

এই নারীর দুর্মুখ স্বভাবের জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শুভবৃত্তি নিয়েও সমূলে ধ্বংস হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই হৈমবতীর গুণব্যাখ্যা করেছেন। "—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা।···সুখ, দূরে থাকুক, দেবেন্দ্র দেখিলেন যে হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার।"[২]

নারীর চরিত্রবৈচিত্র্যই অনেকক্ষেত্রে পুরুষের জীবন নিয়ন্তা। হৈমবতী সেই জাতীয় দুঃসহপ্রকৃতির রমণী যাদের দুর্দান্তপ্রকৃতিতে পুরুষের পক্ষে গৃহ অরণ্য হয়ে ওঠে। তার শুভবুদ্ধি লুপ্ত করে তাকে নৈরাশ্য ও বিকৃতির পথে চালিত করে।

২। বিষবৃক্ষ : ১০ম পরিচ্ছেদ।

'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে তাম্রলিপ্তের অধিপতি ন্যায়বান ও বিচক্ষণ রাজারূপে এই উপন্যাসের নাট্যাংশে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জ্যোতির্গণনার ফলে শ্রেষ্ঠীদম্পতি হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের যে বিবাহোত্তর পঞ্চবার্ষিকী আবশ্যিক বিচ্ছেদ, তার পরবর্তী অধ্যায়ে উভয়ের মিলনের অংশে তিনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে হিরণ্ময়ীর সতীধর্ম পরীক্ষা করেছেন—হিরণ্ময়ী এবং পুরন্দরকে যথাকালে পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজসুলভ মর্যাদাবোধের সঙ্গে উপচিকীর্ষা এবং সরসতার সংমিশ্রণে মদনদেবকে আদর্শ নৃপতিরূপে নির্ণয় করা যায়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে রূপসী চন্দ্রশেখরের ভগ্নী, প্রতাপ রায়ের স্ত্রী। কাহিনীতে রূপসীর কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই কিন্তু শৈবলিনীর হৃদয়ে কণ্টকক্ষতের মত তাঁর স্মৃতি জাগরূক কারণ যে প্রতাপ তাঁরই একান্ত, সে রূপসীর হ'ল, তাঁর কেউ নয়। বাংলার নবাবের কাছে সেই নালিশই জানানোর আকাঙ্ক্ষা তাঁর "হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"[৩]

শৈবলিনী ফষ্টর কর্তৃক অপহৃতা হ'বার পর রূপসী ও সুন্দরীর সংলাপ থেকে রূপসীর মধ্যে একটি স্নিগ্ধ মধুর প্রকৃতির নারীকে আমরা পাই, তার মধ্যে একটি কৌতুকদীপ্ত বুদ্ধিরও আভাস ফুটে ওঠে।

'রাধারাণী'তে রাধারাণীর পিতৃবন্ধু, কর্মিষ্ঠ, ধনবান পুরুষ কামাখ্যাবাবু। ইনি অত্যন্ত সহৃদয়, পরোপকারী, সৎ, বন্ধুবৎসল।

রাধারাণীর মা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়েও আত্মীয়ের চক্রান্তে অত্যন্ত দীনদশা যখন প্রাপ্ত হন তখন তাঁর পক্ষে হাইকোর্টের উকিল কামাখ্যানাথ-বাবু বিশেষ সচেষ্ট হ'য়ে সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন। রাধারাণীর রুগ্না মায়ের মৃত্যুর পর তাকে নিজের কাছে রেখেই সযত্নে সুশিক্ষা দিয়ে তার সম্পত্তিকে যত্নে রক্ষা করে ইনিই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

"কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক", সুতরাং রাধারাণীকে বাল্যবিবাহ না দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ও বিষয় পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

৩। চন্দ্রশেখর : ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

কামাখ্যাবাবুর চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত আদর্শ ভদ্রলোক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার পরিচয় পাই। "কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক।"

'রজনী' উপন্যাসে রামসদয় মিত্রের প্রথমা স্ত্রী চিররুগ্না, কাহিনীর নায়ক শচীন্দ্রনাথের মাতা। উপন্যাসে তিনি নেপথ্যেই বিরাজিতা। রজনী কৌতুক-ছলে তাঁকে বলেছে—"আধখানা গৃহিণী", তাঁর কণ্ঠস্বরের 'শাঁই শাঁই' শব্দে রজনীর তাঁকে 'ভুবনেশ্বরী' নাম দিতে ইচ্ছে হত।

প্রথমা স্ত্রীর পিতৃদত্ত অর্থের জোরেই বাঞ্ছারামের ত্যজ্যপুত্র রামসদয় মিত্র অর্থসম্পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

বাঞ্ছারাম মিত্র রামসদয় মিত্রের পিতা। ইনি পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, দরিদ্রপিতার পুত্র হ'লেও নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। এই তেজস্বীপুরুষ বিষয়ী হ'লেও অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিবেচক, নিজের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে বিপুল বিভব বাঞ্ছারাম অর্জন করেছিলেন তাতে প্রকৃত সহায়ক ও তাঁর পরম হিতৈষী বন্ধু মনোহর দাস। পুত্র রামসদয় তাঁকে অপমান করাতে পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি মনোহর দাস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের উইল করে দান করেন। রজনী উপন্যাসের মূল কাহিনীর বিস্তার ও পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই উইল। নিজের পরিশ্রমে ধন অর্জন করেছিলেন বলেই হয়ত বাঞ্ছারাম সাধারণ সম্পদশালী ব্যক্তিদের অপেক্ষা ভিন্নচরিত্রের।

বাঞ্ছারামের চরিত্রে নিজের বিত্তের প্রভাবের চেয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বড়। এই জন্যই উচ্চবিত্ত বাঞ্ছারাম বিত্তে নয়, স্বীয় অন্তরধর্মে বিশিষ্ট মানুষ।

যামিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যে অসীম মমতা, ভগ্নীর জন্য সমবেদনায় কোমল যে নারীপ্রকৃতি, তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ভ্রমরের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষাকারিণী যামিনীর মধ্যে।

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বাভাবিক চরিত্র।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলালের মায়ের চরিত্রসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে

মন্তব্য করেছেন, "আমার এমন বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকারমাত্রে এ কালো মেঘ উড়িয়া যাইত।"[৪] গোবিন্দলাল-জননী জানতেন যে পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু সুগৃহিণীর নৈপুণ্য তাঁর ছিল না; তদুপরি পুত্র বর্তমানে পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হওয়ায় তাঁর অন্তরযন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মিলনরচনার প্রয়াস দূরে থাক, পুত্রবধূর অন্নদাসী হওয়ার কাল্পনিক আশঙ্কায় তিনি কাশীবাসে চলে গেলেন এবং কাহিনীর বিপর্যয় ত্বরান্বিত হল। পুত্রবধূ সম্পর্কে যে ঈর্ষা, বাঙ্গালীর সংসারে বহু দুর্বিপাক ঘটিয়েছে, গোবিন্দলালের মাতা তার অন্যতম নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই চরিত্রের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'তে রাজলক্ষ্মীকে রচনা করেছেন।

শচীকান্ত গোবিন্দলালের "বয়ঃপ্রাপ্ত" ভাগিনেয়। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে শচীকান্তই তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তিভার গ্রহণ করেন।

শচীকান্ত সেই জাতীয় স্বল্পসংখ্যক নির্লোভ সহৃদয় ব্যক্তিত্ব, যাঁরা ঘটনাচক্রে পরধনে ধনী হলেও সম্পদাসক্ত হন না। সেইজন্য সমবেদনাশীল হৃদয়ের মমতায়, শ্রদ্ধায়, শচীকান্ত ভ্রমরের স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করেছেন বারুণীর উদ্যানে, এবং নিরুদ্দিষ্ট গোবিন্দলালের সন্ধান পাওয়ামাত্র তাঁর সম্পত্তি প্রত্যর্পণে উৎসুক হয়েছেন।

কৃষ্ণকান্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে হরিদ্রাগ্রামের জমিদার। তাঁরই উইল রচনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির ঘটনাচক্র আবর্তিত হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত ছিলেন তেজস্বী এবং ন্যায়নিষ্ঠ। এই ন্যায়পরায়ণতা ও তেজস্বিতার জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে যেমন ন্যায্যপ্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাননি, তেমনি পরবর্তীকালে রোহিণী-সম্পর্কিত জনশ্রুতি এবং গোবিন্দলালের চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ দেখে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তি ভ্রমরের নামে লিখে দিয়েছেন। এর ফলে কাহিনীতে আরও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিচার-বিবেচনা সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের মধ্যে এক সত্যনিষ্ঠ, সংসারাভিজ্ঞ এবং বিবেচক গ্রাম্য ভূস্বামীর প্রতিমূর্তি রচনা করেছেন। প্রবল

৪। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৩০ তম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপান্বিত জমিদার কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ের স্নেহের উৎসটিও প্রয়োজনমত মুক্ত করে দিয়ে একটি স্বাভাবিক ও সুন্দর চরিত্র পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত করেছেন লেখক।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ভবঘুরে ভাবুক ব্রাহ্মণ কমলাকান্তের আশ্রয়দাতা এক জমিদার, কমলাকান্তের জন্য আফিঙের যোগান দিতেন। তাঁর বৈঠকখানায় বসে কমলাকান্ত মানবচরিত্রের বহু-বৈচিত্র্য (মনুষ্যফল, 'বসন্তের কোকিল') এবং জীবনের পতঙ্গ-বৃত্তি (পতঙ্গ) ইত্যাদি লক্ষ্য করেছেন। নসীবাবুর মৃত্যুর পরেই কমলাকান্ত আশ্রয়বর্জিত, তখন 'ভোজনং যত্র তত্র'— শয়ন কখনো 'হট্টমন্দিরে' কখনো প্রসন্নের গোয়ালে। "সেখানে মঙ্গলা থাকে, আমিও থাকি।"[৫]

কুসুমলতা কমলাকান্তের আশ্রয়দাতা জমিদার নসীরামবাবুর কন্যা। 'ফুলের বিবাহে' এই পুষ্পরূপিণী বালিকাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কমলাকান্ত যখন নসীবাবুর উদ্যানে অহিফেন প্রসাদাৎ স্বপ্নঘোরে ফুলের বিবাহ দেখছিলেন, তখন এই কুসুমলতা বাস্তবভাবে সেই বিবাহ নিষ্পন্ন করছিল, বিবিধ পুষ্প আহরণে মালা গাঁথছিল ঃ

" 'আমিও যে ফুলের বিয়ে দিয়েছি।'

'কই ?'

'এই যে মালা গাঁথিয়াছি।' দেখিলাম সেই মালায় আমার বরকন্যা রহিয়াছে।"[৬]

'দুর্গেশনন্দিনী'তে (২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) গড় মান্দারণে পাঠানের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ করবার পর জগৎসিংহ যখন ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় তখন বন্দী অবস্থায় কতলু খাঁর দুর্গে আনীত হন। সেখানে তাঁকে বিশেষ যত্নপূর্বক চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে হাকিম। সেই মরণান্তিক কঠিন ব্যাধিতে এই চিকিৎসকের অক্লান্ত নিপুণতা ও সুদক্ষ অভিনিবেশে জগৎসিংহ প্রাণলাভ করেন।

৫। কমলাকান্তের দপ্তর।

৬। কমলাকান্তের দপ্তর।

আয়েষার আশ্চর্যসেবার সঙ্গে এই চিকিৎসকের সযত্ন চিকিৎসাই জগৎসিংহকে আরোগ্যলাভে সহায়তা করেছে।

তিলোত্তমার মাতামহী দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা। গড় মান্দারণের অধিবাসিনী। এঁর স্বামী কার্যোপলক্ষে প্রায়ই প্রবাসী থাকতেন। বিমলার পিতা শশিশেখর ভট্টাচার্যের ঔরসে এই রমণীর যে পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ :করেন সেই কন্যাই বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী, তিলোত্তমাজননী। কন্যার জন্মের পর বৈধব্য ঘটলে কায়িক পরিশ্রমেই তিনি জীবিকার সংস্থান করেন। লোভহীনতা এবং চারিত্রিক নিষ্ঠা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

বিমলার মাতা কাশীধামে শশিশেখর ভট্টাচার্যের গৃহের নিকটস্থ এক শূদ্রীর নবযুবতী সেবাপরায়ণা কন্যা। এই শূদ্রীকন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে বিমলার জন্ম। ইনি শশিশেখরের বিবাহিতা স্ত্রী নন। এই রমণী দরিদ্রা হ'লেও নির্লোভ, তেজস্বিনী, নিষ্ঠাবতী ও সহৃদয়া ছিলেন। শৈশবে ও প্রথম কৈশোরে এই শূদ্রীমাতার নিকটই বিমলা প্রতিপালিতা এবং এই নিঃসহায় জননীর পরিশ্রমার্জিত অর্থেই উভয়ের উদরান্নের সংস্থান হয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সূচনায় তীর্থযাত্রীবাহী নৌকা যখন কুয়াসায় পথভ্রষ্ট, তখন এক বৃদ্ধকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখা যায়। পরকালের চিন্তায় পুণ্যলোভে ইনি সাগরতীর্থযাত্রী, কিন্তু এখন ঝড়ের মুখে পড়ে বাড়ী ও বিষয়চিন্তায় বিব্রত। তিনি দ্রুত গৃহপ্রত্যাবর্তনে উৎসুক, কারণ—"বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"[৭] ঘোর বৈষয়িক এবং স্বার্থপর গ্রাম্যচরিত্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য অথবা তীর্থদর্শনের মহিমা দুই-ই তাঁর কাছে অর্থহীন। ইনিই আবার গ্রামে ফিরে ব্যাঘ্রের হাতে নবকুমারের প্রাণনাশের কাল্পনিক কাহিনীতে নিজের মিথ্যা বীরত্ব ঘোষণা করেছেন।

নারীজাতি সহজে দুর্বলা। বিশেষতঃ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য কম থাকাতে বিপদে ধৈর্যহীন। সাগরতীর্থ থেকে ফিরবার পথে যখন কুয়াসা আর দুর্যোগের ঘনঘটায় দিক্ আচ্ছন্ন তখন কপালকুণ্ডলার তীর্থযাত্রিণীদের রোদন কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ। তারই মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, এক গ্রাম্য

৭। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রিণী ধৈর্যের প্রতিমার মত স্থির নির্বাক। সংস্কারাচ্ছন্ন মনের মোহে আপন সন্তানকে রোগমুক্তির আশায় তিনি গঙ্গাসাগরে দিয়েছিলেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সেই সন্তান ফিরে পান নি। কঠিনতম দুঃখ যখন মানুষ পায়, তখন অন্য দুঃখ-বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ হয়ে যায়। সন্তানহননের সীমাহীন মূঢ়তার বেদনায় এই মৃতবৎসা জননী স্তম্ভিতা, তাই আত্মপ্রাণহানির ভীতি আর তাকে বিচলিত করতে পারে নি।

শ্যামার স্বামী একটি বিশেষ যুগের কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। স্ত্রীর জন্য মমতা, প্রেম এঁদের পক্ষে বাহুল্য। শত শত কুলীন কন্যার সীমন্তে সিন্দুর স্বাক্ষর দিয়ে এঁরা স্বামীর ইতিকর্তব্য সমাপ্ত করে শ্বশুরবাড়ীর অর্থ-শোষণের একটি কায়েমী অধিকার স্থাপন করে নিতেন। কোন কোন নির্বোধ যুবতী এই স্বামীদের বশ করবার চেষ্টা করতেন মন্ত্রতন্ত্র ও ওষধির সাহায্যে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে আমরা শ্যামার স্বামীকে প্রত্যক্ষ করি না কিন্তু স্বামীকে বশীভূত করে তাকে একদিনের জন্য প্রাপ্তির আকুলতা শ্যামাসুন্দরীর মধ্য দিয়ে কৌলিন্যের অভিশাপকে মূর্ত করে তুলেছে। আর সেইসঙ্গে কুলীনকুল-র্ষভের চরিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্যামাসুন্দরী নায়ক নবকুমারের অনুজা। মৃন্ময়ীরূপিণী কপালকুণ্ডলার সুরসিকা সংসারাভিজ্ঞা ননদিনী। এই শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। বনবিহঙ্গী কপালকুণ্ডলা গৃহপিঞ্জরবন্দিনী হয়ে সুখী হতে পারেন নি—সাংসারিক সুখ, সন্তান, দাম্পত্যজীবন সবই তাঁর কাছে তাৎপর্যবিহীন।

শ্যামাসুন্দরীর পরম দুর্ভাগ্য এই যে তিনি কুলীনকন্যা। তৎকালীন কুলীনেরা নির্বিচারে ও অর্থলোভে শত শত কন্যার পাণিগ্রহণ করতেন—দু চারজন ব্যতীত অবশিষ্ট পত্নীরা বিবাহের পর কখনো পতি-সন্দর্শন লাভ করতেন কিনা সন্দেহ। সমগ্র জীবনে যদি দিনেকের জন্যও স্বামীদেবতার আবির্ভাব ঘটত স্ত্রী যথাসর্বস্ব দিয়ে তাঁর পরিতোষ বিধান করতে চাইতেন—তাঁকে বশীভূত করবার প্রাণপণ প্রয়াস পেতেন।

শ্যামাসুন্দরীর মধ্যেই এই দুর্ভাগিনী কুলীনদুহিতার দীর্ঘশ্বাস। তাঁরই পতিবশীকরণের ওষধিসন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করে নিশিরাত্রে কপালকুণ্ডলা মতিবিবির সাক্ষাৎ পান এবং উপন্যাসের পরিণতি নিয়তি-নিয়ন্ত্রিতের মত অগ্রসর হয়।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে হৃষীকেশ লক্ষ্মণাবতী নগরের ব্রাহ্মণগুরু মাধবাচার্যের নির্দেশে মৃণালিনীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দুরাচার:পুত্র ব্যোমকেশ মৃণালিনী সম্পর্কে অন্যায় ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে নিজ অপরাধ গোপন করার মানসে ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে দুশ্চারিণীরূপে অভিযুক্ত করে। স্নেহান্ধ হৃষীকেশ সত্যাসত্য বিচার না করেই ক্রোধবশে নিরপরাধা মৃণালিনীকে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেন।

হৃষীকেশ অবিবেচক ও স্নেহমুগ্ধ সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের প্রতিনিধি।

ব্যোমকেশ মৃণালিনীর আশ্রয়দাতা লক্ষ্মণাবতীনিবাসী ব্রাহ্মণ হৃষীকেশের পুত্র, ঘোর মূর্খ ও দুশ্চরিত্র। মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে প্রাপ্তি-সম্ভাবনা না দেখে বলপ্রকাশের সঙ্কল্প করেছিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বখ্‌তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ জয় করলে মুসলমান সৈন্যের হাতে তার মৃত্যু ঘটে।

ব্যোমকেশের শঠতার জন্যই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ করেছিলেন। মৃত্যুকালে ব্যোমকেশ সে সন্দেহের নিরসন ঘটিয়ে যায়।

তারাচরণ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর স্বামী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "টপ্পাগাওয়া টেরিকাটা মাস্টার।" সে দেবেন্দ্রদত্তের সৌখীন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে আসবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু কুন্দনন্দিনীর দিকে দেবেন্দ্রের দৃষ্টি পড়াতে সভয়ে পশ্চাদপসরণ করে। কুন্দের সঙ্গে তারাচরণের প্রণয় প্রসঙ্গে লেখক নীরব এবং ইঙ্গিতে যা বলেছেন তাতে মনে হয় একটা পোষা বানরীর প্রতি তার অনুরাগ ছিল। মোটের উপর স্বল্পায়ু তারাচরণ ভীরু এবং ব্যক্তিত্বহীন একটি পুরুষচরিত্র এবং এই কারণেই কুন্দনন্দিনীর স্মৃতিতে কোথাও তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। তারাচরণ সূর্যমুখীর পিতৃগৃহের দাসী শ্রীমতীর পুত্র। শ্রীমতী কুলত্যাগিনী হলে নিরুপায় তারাচরণ সূর্যমুখীর সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত পালিত হয়।

চাঁপা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে পিতার মৃত্যুর পর কুন্দনন্দিনীকে সঙ্গদানে আগতা প্রতিবেশিনীর বালিকা কন্যা। কুন্দের সমবয়সী এবং সঙ্গিনী। কুন্দ তাকে আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে। নগেন্দ্রকে দেখবার পরে—ইনি যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ, সে কথাও জানায়।

রামকৃষ্ণ রায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গ্রামীণ কবিরাজ। গ্রামে তাঁর চিকিৎ-সায় সুনাম আছে। বৈদ্যশাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসকের

মত রোগসম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অর্থগৃধ্নুতা এঁর নেই। নিরাশ্রিতা রোগে মুমূর্ষু অবস্থায় ব্রহ্মচারী যখন সূর্যমুখীকে হরমণির কুটীরে নিয়ে শুশ্রূষা করেন তখন এই রামকৃষ্ণ রায়ই তাঁর চিকিৎসা করেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে এঁর যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় বাংলাদেশের গ্রামে যে স্বল্প-সংখ্যক সুবিজ্ঞ সহৃদয় বৈদ্যের সন্ধান পাওয়া যেত ইনি তাঁদেরই একজন।

ডাক্তার এখানে কোন চরিত্র হয়ে ওঠে নি, বিষপানের ফলে কুন্দর মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তিনি যথারীতি পরীক্ষা করে মৃত্যুলক্ষণ দেখে বিষণ্ণমুখে চলে গেলেন, ওষুধ আর দিলেন না। এই ডাক্তারের বিদ্যার স্বরূপ বুঝতে পারি যখন হীরার হিষ্টিরিয়ার ওষুধ হিসাবে হীরার আয়িকে ক্যাস্টর অয়েল দেন এবং তাকে গরম রাখার উপদেশ দেন অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাতুড়ে চিকিৎসক।

কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশিনী স্বাভাবিক কর্তব্য বুদ্ধিতে সে রাত্রে কুন্দের কাছে থেকে তাকে সান্ত্বনা ও সাহস দান করেছেন।

প্রতিবেশীদের চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সামাজিক কর্তব্যপরায়ণতা এঁদের যথেষ্টই আছে। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দাহকার্যাদি সম্পন্ন করতে অনেকেই এঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, অবশ্য তারও পেছনে নগেন্দ্রনাথের অনুরোধ এবং আনুকূল্যও ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের আর্থিক ভরসায়ও কুন্দর দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করতে রাজী হল না। কোনো বড় দায়িত্ব অন্যের স্কন্ধে চাপাতে পারলে কেউ নিজে নিতে চায় না, বিশেষতঃ যেখানে ব্যয়ের ব্যাপার আছে। সকলেই স্বভাবতঃই স্বার্থসন্ধানী, স্বার্থত্যাগ কেউ সহজে করে না। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্যটি নিরাবরণ—

"নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।"[৮]

শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্রপ্রাপ্তির পর নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীর অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন, তখন পথিমধ্যে একগ্রাম্য বৃদ্ধকে শিবপ্রসাদের সন্ধান জিজ্ঞাসা

৮। বিষবৃক্ষ : ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

করায় সে উত্তর দিয়েছিল : "আজ্ঞে মশাই ছেলেমানুষ আমি অত জানি না।"

কথাটি বলবার হেতু আছে। ভদ্র পোশাকধারী কোনো বহিরাগতকে দেখলে সেকালের গ্রামের লোক মনে করত—হয় মামলায় সাক্ষী দেওয়াবে অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিশু হয়ে থাকাই নিরাপদ।

সেকালের যে কোনো ধনাঢ্য পরিবারে বহু আশ্রিত আশ্রিতা বাস করত, এঁরা অনেকে নিকট আত্মীয়া, অনেকে সুদূর, অনেকে মাত্র সম্পর্কিত। কেউ কেউ বা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিরহিত। ধনী পরিবারেরা তৎকালীন অন্ন-প্রাচুর্যের যুগে অকাতরে এঁদের স্থান দিতেন এবং সংসারের বিভিন্ন কর্মভার এঁদের উপরে অর্পিত হত। বিশেষভাবে অন্তঃপুরের মহিলামহলই ছিল সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক :

"মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসি, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কল কল করিত।"[১] এঁরা পরিবারের বিচিত্র জীবননাট্যে মধ্যে মধ্যে অংশ গ্রহণ করতেন, কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে। তা ছাড়া পরচর্চা, কলহ, মন্ত্রণাদান, গৃহভেদ ইত্যাদিতেও এঁদের সবিশেষ ভূমিকা থাকত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কুন্দনন্দিনীও অবস্থাচক্রে এই আশ্রিতাদেরই অন্যতমা। অন্যান্য চরিত্রগুলি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র পটভূমিটিকে সরস ও সজীব করতে সক্ষম হয়েছেন—জমিদার বাড়ীর অন্দর মহলের একটি নিখুঁত চিত্রণও এদের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়েছে। বিশেষভাবে 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র অন্তঃপুরে প্রবেশ অংশটি স্মরণীয়।

নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তি পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানজীর। ইনি বিশেষ কর্তব্যনিষ্ঠ, সহৃদয়,, রাশভারী এবং দত্ত পরিবারের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী। ইনি বিশ্বাসী এবং শুভার্থী জনৈক কর্মচারীর প্রতীক।

কুন্দের রূপমোহে নগেন্দ্রনাথ যখন বিবেকবুদ্ধিহীন হতে বসেছেন এবং বিষয়সম্পত্তির দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন তখন দেওয়ানজীই বিষয়ের অবস্থাসম্বন্ধে সূর্যমুখীকে সচেতন করেছেন। আবার বিবাহের পর কুন্দ যখন অবহেলিতা, দেওয়ানের কাছে লেখা নগেন্দ্রর পত্রই তার একমাত্র সম্বল তখন কুন্দর অবস্থা বুঝে পত্রগুলির নকল রেখে কুন্দকে পড়তে দিতেন আর

১। বিষবৃক্ষ : সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফেরত চাইতেন না। কুন্দর প্রতি হীরার অত্যাচারের প্রতিবাদও তিনি করেছেন, অবশ্য শেষপর্যন্ত অপমানের ভয়ে চুপ করতে হয়েছে।

'রাধারাণী' উপন্যাসে রাধারাণীর মা ধনীগৃহিণী হয়েও স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে সম্পত্তিচ্যুতা হ'লেন। তারপর কঠিন দারিদ্র্যকষ্টে ও মানসিক ক্লেশে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তাঁর অবলম্বন একমাত্র বালিকা রাধারাণী। নিষ্ঠুর নিরন্ন দিনগুলিতে বালিকা বনফুলের মালা বিক্রীর সামান্য অর্থে কখনও মায়ের জন্য একটু পথ্যের সংস্থান করে। তথাপি এই তেজস্বিনী আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারী দারিদ্র্যের অভিমানেই মাথা উঁচু করেছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। কারও সহায়তা গ্রহণ করেন নি। স্বামীর বন্ধু সম্পদশালী ও সহৃদয় কামাখ্যানাথ অনেক চেষ্টা করেও মাতাকন্যাকে স্বগৃহে আনতে পারেন নি।

অল্পকথায় দারিদ্র্যগ্রস্তা অথচ আভিজাত্যবোধসম্পন্না মহিলাটির পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটেছে।

পদ্মলোচন লাহা বস্ত্র ব্যবসায়ী। রাধারাণীর মার কুটীরের পাশেই এর দোকান। বিদেশী রুক্মিণীকুমার রাধারাণীর জন্য দুখানা শাড়ীর দাম পদ্মলোচনকে দিয়ে শাড়ী রাধারাণীকে পৌঁছে দিতে বলে যান। এই সুযোগে পদ্মলোচন তার ব্যবসায়িক কৌশলটি ব্যবহার করতে ছাড়ে নি। এ প্রসঙ্গে লেখকের ছোট মন্তব্যটি লক্ষণীয়—

"পদ্মলোচন চারিটাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন।"[১০]

'রাধারাণী' উপন্যাসে একজন নরম বিশ্বস্ত দেওয়ানকে নহে। কামাখ্যানাথের যত্নে রাধারাণী যখন তার পূর্বসম্পত্তি আরও বর্দ্ধিতাকারে লাভ ক'রে সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণীরূপে প্রতিষ্ঠাতা হলেন, তখন এই দেওয়ানই সমস্ত দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে কার্যভার গ্রহণ করলেন। রাধারাণী অভিভাবক-হীনা এবং কুমারী যুবতী। রাধারাণীর বিবাহকালে অভিভাবকের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য এই দেওয়ানজীই রাধারাণীর নির্দেশে পালন করেন।

১০। রাধারাণী : ১ম পরিচ্ছেদ।

চাঁপা 'রজনী' উপন্যাসে গোপালবাবুর স্ত্রী। এই গোপালের সঙ্গেই লবঙ্গলতা রজনীর বিবাহ স্থির করেছিলেন। চাঁপার সন্তানাদি না হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে অর্থলোভবশতঃ গোপাল বিংশতিবর্ষীয়া অন্ধ রজনীকে বিবাহে সম্মত হয়। কিন্তু গ্রাম্য মুখরা স্ত্রী চাঁপা স্বভাবতঃই সপত্নীলাভে ইচ্ছুক নয়। বিবাহে রজনীরও অসম্মতি জেনে চাঁপাই নিজগুণের ভ্রাতা হীরালালের সঙ্গে রজনীর সাময়িক পলায়নের ব্যবস্থা করে।

হীরালাল 'রজনী' উপন্যাসে একটি চমৎকার চরিত্র। 'রজনী'র প্রস্তাবিত বিবাহের পাত্র গোপালবাবুর শ্যালক, চাঁপার ভাই। হীরালাল দুশ্চরিত্র, মদ্যপ ও গঞ্জিকাসেবী। কদর্য সংবাদপত্র এবং অশিক্ষিতপ্রায় নিম্নশ্রেণীর লেখকে দেশ ভরে গিয়েছিল। হীরালাল এই 'সাংবাদিক'দের একজন। অশ্লীলতার দায়ে পুলিশের দৃষ্টি পড়লে কাগজ ফেলে হীরালাল উধাও হয় এবং সামর্থ্যানুযায়ী নাটক লিখতে আরম্ভ করে—'নাটক একথানিও বিক্রয় হইল না।' নিরুপায় হয়ে সে চাঁপার কাছে আশ্রিত। নানা দিক থেকে তার 'এগজাম্পল সেট করার' বিশেষ বাসনা ছিল—শেষপর্যন্ত রজনীকে সে বিবাহ করতে উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু রজনী সম্মতি না দেওয়ায় অন্ধ মেয়েটিকে সে নদীর চড়ায় নামিয়ে দেয় এবং যষ্ট্যাহত হয়ে কদর্যতম গালাগালিতে গঙ্গাবক্ষ কলঙ্কিত করতে করতে প্রস্থান করে। আপাতঃদৃষ্টিতে হীরালাল একজন গ্রাম্য দুর্জন মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন স্বল্পশিক্ষিত এবং ইতররুচিসম্পন্ন একটি তথাকথিত 'সাংবাদিক-সাহিত্যিকে'র চরিত্র এর মধ্যে রূপায়িত করে তুলেছেন বলেই এর বিশেষ মূল্য আছে। হীরালালের মার্জিত ও উন্নত সংস্করণ বর্তমানকালেও সম্ভবতঃ বিরল নয়।

গোবিন্দকান্ত দত্ত কাশীধামের কোন সচ্চরিত্র অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। এরই কাছে পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গে রজনীর নাম অমরনাথ প্রথম শুনতে পান।

রাজচন্দ্র 'রজনী'র মেসোমহাশয়—তার পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি। কলিকাতায় ফুলের ব্যবসায়। এরই সংসারে রজনী কন্যারূপে লালিতা। নিরীহ স্বল্পায়ী ব্যক্তি। রজনীর সম্পত্তিলাভে তিনি স্বভাবতঃই আনন্দিত। রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবে ততোধিক আনন্দিত। একটি সরল নির্বিরোধ চরিত্র।

মালীবৌ রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। ভগ্নীকন্যা রজনীকে নিজ দুহিতার মত লালন-পালন করেছেন। রজনী বিষয়ের অধিকারিণী হবে, অমরনাথের সঙ্গে তার

বিবাহ হবে এই আশাতীত সৌভাগ্যে কিঞ্চিৎ গর্বিতা। দরিদ্র হলেও তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্ব আছে—লবঙ্গলতার সঙ্গে মালী বউয়ের আলাপে তা পরিস্ফুট। মিত্র বাড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাবোধও চরিত্রটির মধ্যে বিদ্যমান। অমরনাথ তাঁদের সবিশেষ উপকার করলেও মালী বউ-এর স্বামীর মতোই বাসনা: রজনী ও শচীন্দ্রের বিবাহ হোক। লবঙ্গের ভাষায় "মোটা বুদ্ধি" হলেও চরিত্রটি স্নিগ্ধ ও সহজ, রজনীকে কন্যারূপে গ্রহণ করার মধ্যেই তার সুকোমল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামসদয় মিত্রের পিতা বাঞ্ছারাম মিত্রের পরম হিতৈষী বন্ধু মনোহর দাস। মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ, এজন্য বাঞ্ছারাম তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়ই সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। মনোহর নির্লোভ, নিষ্ঠাবান্, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও কৌশলে বাঞ্ছারাম প্রভূত বৈভবের অধিকারী হয়েছেন কিন্তু নিজে কোন ধনসঞ্চয়ের চেষ্টা না করে নিজের স্বল্প অবস্থা নিয়েই তৃপ্ত থাকতেন। মনোহর দাসের একটি নীরব তেজস্বিতা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ আছে। বাঞ্ছারামের পুত্র রামসদয় যখন কোন কারণে তাঁকে 'সহনাতীত অপমান করে', তখন বাঞ্ছারামের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করেই মনোহর সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। বাঞ্ছারাম পরে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী মনোহর দাস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের করে গিয়েছিলেন কিন্তু সে সংবাদ মনোহর দাসের জীবিতাবস্থায় তাঁর কাছে পৌঁছায় নি।

কেবলরাম মিত্র বাঞ্ছারামের পিতা। ইনি দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। ভবানীনগর গ্রামেই এঁদের আদি বাসস্থান ছিল। কেবলরাম মিত্রের প্রপৌত্র শচীন্দ্রনাথই কাহিনীর নায়ক।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ দেখা যায়, "ডাকঘরে অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনেরো টাকা বেতনভোগী একটি ডেপুটি পোষ্টমাস্টার বিরাজ করিতেছিলেন।" মাত্র দু-তিনটি রেখায় দীন গ্রাম্য পোষ্টমাস্টারের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি পনেরো টাকা পান এবং পিয়ন সাত টাকা পায়—অতএব পিয়ন অপেক্ষা পোষ্টমাস্টারের মর্যাদা যে বেশী এ সম্পর্কে তিনি অতি সচেতন। লোকটি 'বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর।' এই 'বাঙাল' পোষ্টমাস্টারকে

প্রথমে উৎকোচ, পরে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়েছেন। স্বল্পাক্ষরে রচিত এই চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক গ্রাম্য পোষ্টমাস্টারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দানেশ খাঁ ওস্তাদ গায়ক। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের বাড়ীতে যখন রোহিণী ছিলেন তখন দানেশ খাঁ তাঁকে গান শেখাতেন। ইনি একজন মুসলিম সঙ্গীতশিক্ষক।

এ উপন্যাসে যশোহরের একজন সুদক্ষ ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টরের চরিত্র পাই। আরও পাই সেশনে বিচারের সরকারী উকিল। গোবিন্দলালের রোহিণী খুনের বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজে ইনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটও পাই। সুবিচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রশংসিত। এখানে গোবিন্দলালের বিচারের ভারপ্রাপ্ত। একজন জজের চরিত্র পাই। গোবিন্দলাল রোহিণীকে খুন করার বিচারের ভার ছিল এই জজের উপর।

ব্রহ্মানন্দ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের একজন দরিদ্র আত্মীয় এবং তাঁর একজন কর্মচারী। কাহিনীর দ্বিতীয়া নায়িকা রোহিণী তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী। কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইলের লেখক ছিলেন ব্রহ্মানন্দ এবং সেই সুযোগে পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে হরলাল তাঁকে উইল পরিবর্তনে প্ররোচিত করেন। নিম্নবিত্ত ব্রহ্মানন্দ লুব্ধতা বশে রাজী হন এবং ভীরুতাবশে ব্যর্থ হ'ন। কিন্তু তাঁর এই সাময়িক প্রলোভন রোহিণীকে কাহিনীর মধ্যে আকর্ষণ করে এবং সর্বনাশের সূত্রপাত হয়।

ব্রহ্মানন্দ সাধারণ বাঙালী নিম্নবিত্ত গৃহস্থ। তিনি দোষেগুণে মানুষ। কাহিনীর গতিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভূমিকাও স্বাভাবিক, চরিত্রটি বঙ্কিমের বাস্তবদৃষ্টির পরিচয়।

বিনোদিনী, সুরধনী—এরা ভ্রমরের প্রতিবেশিনী। এরকম প্রতিবেশিনী আরও অনেককেই দেখা গিয়েছিল ভ্রমরের দুঃখের দিনে। কালো ভ্রমরের এত সুখে তাদের রাত্রিদিন গাত্রদাহ হ'ত। গোবিন্দলালের রোহিণী সম্পর্কিত দুর্বলতার সংবাদটুকু আঁচ করবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবেশিনীরা গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হ'ল তারপর জনে জনে ভ্রমরকে সেই গল্প জানিয়ে তার সরল বিশ্বস্ত অন্তরে সংশয়ের বীজ বপন ক'রে তার যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি করল। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন প্রতিবেশিনী গ্রাম্য

রমণীদের মনের সঙ্কীর্ণতা, চরিত্রের আশ্চর্য দৈন্য ও হিংস্রতা। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কারও অধিক সুখ এদের অসহনীয়। দুঃখিনী প্রতিবেশিনীর দুঃখ বাড়িয়ে তুলতে এদের নিষ্ঠুর আনন্দ। লেখকের এ প্রসঙ্গে বর্ণনা—

"পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া. কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন। ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে। কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।"[১১]

সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষ্ণকান্ত রায়েরও দেওয়ান আছেন একজন। গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে কিন্তু কোন বিশিষ্টতা লাভ করেনি চরিত্রটি।

'আনন্দমঠে' জীবানন্দ গোস্বামীর অনুজা—নাম নিমাইমণি ভৈরবীপুরে (ভরুইপুরে) বাস করত। এই বিবাহিতা ভগ্নীর গৃহেই জীবানন্দ মহেন্দ্রের কন্যা সুকুমারীকে রেখে এসেছিলেন। নিঃসন্তানা নিমাইমণি মাতৃস্নেহে কন্যাটিকে বুকে টেনে নিয়েছিল। সন্তানব্রতধারী জীবানন্দের অনাদৃতা পত্নী শান্তিও নিমাইয়ের কাছেই থাকত।

স্নেহ, মমতায় এবং সরলতায় চরিত্রটি অনুপম। তারই উদ্যোগে এই গৃহে শান্তি ও জীবানন্দের সাক্ষাৎ—জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ ও শান্তির নবীনানন্দ হওয়ার সঙ্কল্প। কাহিনীর শেষাংশে নিমাইয়ের কাছ থেকে মহেন্দ্রের কন্যা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অশ্রুতে সকরুণ।

বঙ্কিমের সহৃদয়তায় রচিত একটি সুকোমল পল্লীবধূ—নিমাইমণি।

উপন্যাসে অনুপস্থিত নিমাইমণির স্বামীর চরিত্রটিকে পরোক্ষভাবে যতটুকু জানা যায়, তাতে তাকে পরোপকারী ও পরম সজ্জন বলে অনুমিত হয়। দুর্ভিক্ষের দিনেও সে অকাতরে অন্যকে চাউল দিয়ে সাহায্য করে।

কল্যাণীর প্রাণদানের পর অর্ধবয়স্কা কালো মোটাসোটা বিধবা গৌরীদেবীর গৃহে ভবানন্দ কল্যাণীকে এনে রেখেছিলেন। এই মহিলাটির নিজের বয়স ও চেহারা সম্বন্ধে হাস্যকর অজ্ঞতা ও বিবাহের আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্য করে ভবানন্দের গৌরীদেবীর সঙ্গে রসিকতা উপভোগ্য। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে গৌরীদেবীর নিরতিশয় কৃপণতাও লক্ষণীয়।

১১। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ।

'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর মা অনাথা ব্রাহ্মণবিধবা। যথাসাধ্য ব্যয় করে পরমাসুন্দরী গুণবতী কন্যাকে ধনাঢ্য হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহকালে বরপক্ষীয়দের অধিক আদর আপ্যায়ন করায় গ্রামবাসিগণ রুষ্ট হয় এবং প্রফুল্লর মাতার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে। ফলে, প্রফুল্ল স্বামিপরিত্যক্তা হয়—কোনোমতে চরকা কেটে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে মাতা ও কন্যার জীবিকানির্বাহ চলতে থাকে।

নিরুপায় হয়ে পরিশেষে কন্যাকে নিয়ে জননী বেহাইগৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু ব্রজেশ্বরের জননী পুত্রবধূর পুনর্গ্রহণে কঠিন-হৃদয় স্বামীকে সম্মত করাতে পারেন নি —ব্রজেশ্বরও পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ হন। আশাহতা দুঃখিনী জননী কন্যাকে নিয়ে দরিদ্রকুটিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেদনা ও মনোভঙ্গজনিত পীড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক অত্যাচারের এক নিষ্ঠুর রূপ প্রফুল্লজননীর জীবনে প্রকটিত হয়েছে। গ্রাম্য কুটিলতা অসহায়ের উপর কী নির্যাতন করতে পারে —এ তারই একটি করুণ দৃষ্টান্ত।

রঙ্গরাজ 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে দস্যুপতি ভবানী পাঠকের প্রধান অনুচর। পরবর্তীকালে দেবীচৌধুরাণীর বিভিন্ন অভিযানে নিত্যসঙ্গী। এই দস্যুর চরিত্রেও শৌর্য-বীর্য-সরসতার বেশ সমন্বয় ঘটেছে। বিশ্বস্ততায় ও বীরত্বে রঙ্গরাজ স্মরণ-যোগ্য। দেবীর সখী দিবানিশি এঁকে 'দাঁড়িবাবা' বলে ডাকতেন।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত দস্যুনেতা রবিন হুডের মতোই বাংলাদেশের একদা দুর্জনপীড়ক ও দরিদ্রবান্ধব একদল দস্যুর আবির্ভাব ঘটেছিল জানা যায়। 'রঘু ডাকাত', 'বিশে ডাকাত' ইত্যাদি বিখ্যাত দস্যুরা সেই ইতিহাস-চিহ্নিত। ভবানীপাঠক এবং তাঁর দক্ষিণহস্ত রঙ্গরাজ এই ধারারই অন্তর্গত।

ব্রজেশ্বরের কোন সম্পর্কিত ঠাকুরমা ব্রহ্মঠাকুরাণী। নিরাশ্রিতা ও নিঃসহায়া এই বৃদ্ধা হরবল্লভের সংসারেই বাস করেন ও রন্ধনাদি করেন। চরিত্রটি স্নিগ্ধমধুর, রহস্যপ্রিয়। স্নেহে, সরলতায় তিনি গৃহের সকলেরই প্রিয়পাত্রী। বালিকাবধূ সাগরের দৌরাত্ম্যই এই বৃদ্ধার ওপর সর্বাধিক। সাগরের চরকা-ভাঙা, রূপকথা শোনা প্রভৃতি চাঞ্চল্য সম্বন্ধে বৃদ্ধার স্নেহপূর্ণ অনুযোগ, ব্রজেশ্বরকে তার প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্লকে কেন্দ্র করে তার 'বাগ্দী' আখ্যা নিয়ে রসিকতা প্রভৃতি উপভোগ্য। এই সহৃদয়া বৃদ্ধার সমবেদনা প্রফুল্লর অভাবে ব্রজেশ্বরের ক্লিষ্ট হৃদয়কে স্নিগ্ধতার স্পর্শ দিয়েছে।

ব্রহ্মঠাকুরাণীর চরিত্রটি প্রাণবন্ত। বৃহৎ পরিবারের এককোণে স্নেহশীলা পিতামহীর একটি মমতাস্নিগ্ধ ছবি ফুটে উঠেছে এই বৃদ্ধার চরিত্রটির মধ্যে।

দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্তী 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা। ফুলমণি নাপিতানীর সঙ্গে সে প্রফুল্লকে অপহরণের চক্রান্ত করে রাত্রিযোগে প্রফুল্লর হাতমুখ বেঁধে পালকিতে চাপিয়ে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে কাল্পনিক দস্যুর ভয়ে পালকি রেখে সকলের পলায়ন, ফলে দুর্লভের লোভের গ্রাস থেকে প্রফুল্লর দৈবত্রাণ।

দুর্লভ গ্রাম্য নায়েবগোমস্তাদের একটি বিশেষ ও বাস্তব প্রতিমূর্তি। এইসব জমিদার কর্মচারীর অধিকাংশই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত—কোনো অন্যায় কাজেই তাদের কুণ্ঠা ছিল না। বিবেকহীন, অসচ্চরিত্র এবং একান্ত ইতরশ্রেণীর ব্যক্তিত্বরূপেই দুর্লভ উপন্যাসে প্রতিফলিত!

'সীতারাম' উপন্যাসে সীতারামের রূপোন্মত্ততা দেখে শ্রী যখন চিত্তবিশ্রাম ত্যাগ করে পলায়ন করলেন তখন ক্রোধে, তৃষ্ণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য সীতারাম রাজ্যের কুলবধূ কুলকন্যা অপহরণ করে বলপূর্বক ভোগের উপকরণ করে তোলেন। সীতারামের চিত্তবিভ্রান্তির ফলে তাঁর স্বাধীন হিন্দুরাজ্য যখন মুসলমানের করতলগত হ'বার উপক্রম তখন বিলাসিনীদের ত্যাগ করে শেষবারের মত তিনি জেগে উঠলেন। যেন নিদ্রোত্থিত সুপ্তসিংহের মৃত্যুপণ। সেইসময় আমরা শুনতে পাই ভানুমতী আর অন্যান্য বিলাসিনীদের বিদ্রূপপূর্ণ কলহাস্য-তীব্র শ্লেষে তিক্ত বাক্যরাশি—

"মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্মনাশ করিয়াছ। মনে করিয়াছ কি। তার প্রতিফল নাই?..."[১২]

এই নারীদের ভবিষ্যৎ দিক্‌চিহ্নহীন এক অতল অন্ধকারে আক্ষিপ্ত। অপমানিত নারীত্বের দুঃসহ জ্বালা নির্মম প্রতিবাদের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের কণ্ঠে।

রায়চাঁদ শ্যামচাঁদ এইসব নামগুলো কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, সীতারাম রায়ের রাজ্যের সাধারণ মানুষ, যারা তাঁর অত্যাচারে শঙ্কিত হয়ে নলতা-ডাঙায় পলায়ন করে বসবাস করে। জনমত প্রকাশের জন্য লেখক এই চরিত্রগুলিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

১২। সীতারাম: ৩য় খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে *কৃষ্ণদাস বসু ইন্দিরার রক্ষাকারী বৃদ্ধ যাজক ব্রাহ্মণের যজমান। কৃষ্ণদাস বয়সে প্রাচীন, ভালোমানুষ। ইনি ধনাঢ্য না হলেও সঙ্গতিপন্ন সহৃদয় ভদ্রলোক। সপরিবারে কলকাতা যাত্রার সময় বিপন্না ইন্দিরাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুভাষিণীর পাতান মাসীমাটি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না মহিলা। তিনি তাঁর সাংসারিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অনাথা ইন্দিরা সম্পর্কে একটা সমাধান করতে চেয়েছেন—তার জন্য সুভাষিণীর বাড়ীতে দাসীবৃত্তি ঠিক করে দিয়েছেন। পরের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য একজন সাধারণ বাঙালী গৃহিণীর পক্ষে যা স্বাভাবিক, কৃষ্ণদাসগৃহিণী তাই করেছেন।

দস্যুকর্তৃক দুর্দশাগ্রস্ত ইন্দিরা বনমধ্যে পথভ্রষ্টা হয়ে চলতে চলতে এক প্রাচীনা গ্রামবাসিনীর সাক্ষাৎ পেয়ে প্রথম তাঁর গৃহেই আশ্রয়লাভ করেন। তাঁর মমতাপূর্ণ যত্নে সামান্য সুস্থ হ'য়ে—তাঁরই কাছে পথের নির্দেশ গ্রহণ করে ইন্দিরা আবার মহেশপুরের সন্ধানে যাত্রা করেন। ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীনা দরিদ্রা গ্রাম্যনারী। সাধারণ পল্লীবধূর স্বভাবসিদ্ধ করুণা ও সহৃদয়তা এই নারীটির মধ্য দিয়ে প্রকটিত।

ইন্দিরার পিতৃগৃহের এক প্রতিবেশিনী, তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, রং কালো, স্থূলাঙ্গিনী। ইন্দিরার প্রত্যাবর্তনের পর মহিলাদের যে আনন্দবাসর বসেছিল, তিনি সভানেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ নয়—"নদীরূপা মহিষী" সম্ভাষণে তাঁর ক্রোধেই তার প্রমাণ।

আরও একজন প্রতিবেশিনী, বয়স পঞ্চষষ্ঠী, জাতিতে বৈদ্য, পঁচিশ বৎসর বৈধব্যে কেটেছে, কুচরিত্রা। গ্রাম্য যুবতীদের সম্বন্ধে ঠানদিদি। এককালে তাঁর 'তেলি' অপবাদ ছিল, এইজন্য যে কেউ 'তেলি' সম্পর্কিত কোন রসিকতা করলেই তিনি ক্রুদ্ধ হ'তেন।

রঙ্গময়ী ইন্দিরার সমবয়সী যুবতী। বুদ্ধিমতী, কথা কম বলে কিন্তু মাঝে মাঝে সভাস্থ অন্য প্রতিবেশিনীদের তটস্থ করে দুই একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে।

যমুনা ঠাকুরাণীর 'ভাইঝি' চঞ্চলা ইন্দিরার গৃহবাসরে ঘোমটার আবরণ রেখে পেছনে বসেছিলেন। চঞ্চলা লজ্জাশীলা গ্রাম্যবধূ হ'লেও রসবোধ ও

*ইন্দিরা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

প্রগল্‌ভতাও আছে। ঘোমটার আড়াল থেকে তার বাক্যবাণগুলি বেশ উপভোগ্য।

রসিকা যুবতী অনঙ্গমোহিনী দাসী ছদ্মবেশ ধারণে সুদক্ষ। গ্রাম্য রসিকতার পদ্ধতিতে ইন্দিরার স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে গ্রাম্য মহিলাদের সভা বসেছিল। সেই সভায় অনঙ্গমোহিনী মোগল সেজে এসে উপেনবাবুকে প্রতারণা করেছিল।

ব্রজসুন্দরী দাসী বড়মানুষের স্ত্রী। ইনিও দীনদরিদ্রার ছদ্মবেশে এসে উপেনবাবুর কাছ থেকে অর্থভিক্ষা লাভ করেন। আবার ইন্দিরা ও কামিনীর রসিকতায় একবারে মিষ্টি খাওয়ার জন্য ষোলটাকা বের করতে দ্বিধা করেন নি। ইনি শুধু নিজের পোষাকে বড় মানুষ নন মেজাজেও বড়মানুষ।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে আগ্রার তসবীরওয়ালী বৃদ্ধার পুত্র খিজির শেখ, তসবীর আঁকত, দিল্লীতে তার দোকান ছিল, মাঝে মাঝে আগ্রায় স্বগৃহে বাস করত। তসবীরওয়ালী রূপনগর থেকে ফিরে চঞ্চলকুমারী কর্তৃক অওরংজেবের তসবীর ভাঙার কাহিনী গোপন করতে না পেরে পুত্রের কাছে বলে দেয়। খিজির শেখ কৌতূহলী, সাংসারিক লাভালাভ সম্বন্ধে সচেতন। নিজের আর্থিক লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ তার কাছে তুচ্ছ। এই সংবাদ অওরংজেবের নিকট পৌছলে রূপনগরী রাজকন্যার পক্ষে যত ক্ষতিকরই হোক না কেন খিজির শেখের সমূহ লাভ, কারণ সংবাদ মূল্যবান। সুতরাং নিজের বিবি ফতিমার সাহায্যে শাহী বেগমমহলের সংবাদ বিক্রয়িত্রী দরিয়ার কাছে খিজির শেখ এটি প্রেরণ করে ক্ষান্ত হ'ল।

খিজির শেখের বিবি দিল্লীতে বাস করত। খিজির শেখের অর্থ উপার্জনে ফতিমা বিবি নানাভাবে সহায়তা করত মনে হয়।

উদয়পুরের এক জ্যোতিষী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে এঁর কাছে সর্বদাই ভবিষ্যৎজিজ্ঞাসু মানুষের ভীড়। নির্মলকুমারী এই জ্যোতিষীর কাছে চঞ্চলকুমারীর ভাগ্যগণনা করতে যান। এই জ্যোতিষীই বলেছিলেন—"যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্যা করে, তখন বিবাহ হইবে।"[১৩]

দিল্লীর চাঁদনী-চৌকে জ্যোতিষীগণ রাজপথে আসন পেতে, পুঁথি-পাঁজি

১৩। রাজসিংহ: ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

নিয়ে গণনা করতে বসে। তারই মধ্যে একজন সুদক্ষ জ্যোতিষী সেবার এসে বসেছিলেন। ভবিষ্যৎজিজ্ঞাসুর সংখ্যা সেখানেই অধিক। এঁরই কাছে দরিয়াবিবি মবারককে জোর করে ভাগ্যগণনা করাতে নিয়ে যায়। এই জ্যোতিষী মবারককে বলে "আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।"[১৪] এই সংবাদটিকে দরিয়া পরে মবারকের প্রণয়িনী জেব-উন্নিসার কাছে বিক্রয় করে; ও জেব-উন্নিসার মনে মবারক সম্বন্ধে আক্রোশের সৃষ্টি করে।

মবারকের ভাগ্যগণনার সময় দরিয়ার নেপথ্য মন্তব্যগুলি জ্যোতিষীকে চকিত করেছিল। এই জ্যোতির্বিদ মবারকের হস্তরেখার লক্ষণের সঙ্গে দরিয়ার কথাগুলির মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন—সমগ্র ব্যাপারটি তাঁর অলৌকিকবৎ বোধ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।"

এক বৃদ্ধা পিসি মাণিকলালের একমাত্র আত্মীয়া, যার কাছে সময়ে অসময়ে মাতৃহীনা শিশুকন্যাটিকে মাণিকলাল রেখে যেতে পারেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত ধূর্ত, অর্থলোভ প্রবল, স্নেহমমতা তার চরিত্রে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু মোহরের লোভে বৃদ্ধা কন্যাটির দায়িত্ব সাময়িক ভাবে নিতে সম্মত হয়েছেন এবং মাণিকলাল জানেন যতদিন আশরফির আশা আছে ততদিন বৃদ্ধার কাছে কন্যাটির অযত্ন ঘটবে না।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' যশোদা দেবী মুচিরাম গুড়ের মা। পুত্র সম্বন্ধে অন্ধমোহে ইনি অনেক স্বপ্নই দেখেছেন। পুত্র বিদ্বান্ হবে এই আশায় শাস্ত্রমতে হাতেখড়ি দিয়ে তার বিদ্যারম্ভের আয়োজন করলেন। পুত্র কিন্তু শিক্ষা ও পৌরোহিত্য ছাড়া অন্য সমস্ত বিদ্যাতেই পারদর্শী হয়ে উঠল। সুতরাং যশোদাদেবীর প্রতিদিনই অশ্রুধারায় স্বপ্নভঙ্গ হতে লাগল। অবশেষে স্বামীর মৃত্যুর পর ধান ভেনে যশোদাদেবীকে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করতে হল। এদিকে মুচিরাম যাত্রাদলে ভিড়ে যাবার পর বহুদিন তার সংবাদ না পেয়ে, শোকে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অবশেষে প্রাণত্যাগ করলেন।

সফলরাম গুড় মুচিরামের পিতা। মোহনপল্লীতে কয়েকঘর মাত্র কৈবর্ত

১৪। রাজসিংহ : ৫ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

বাস করত। সফলরাম সেখানে একমাত্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং কৈবর্তের পৌরোহিত্যই তাঁর একমাত্র পেশা। এতে লাভ তাঁর মন্দ হত না। সফলরাম নিজে লেখাপড়া জানতেন না। তিন পুরুষের মধ্যে ও কর্ম বিশেষ কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। যশোদাদেবীর পুত্রকে বিদ্যার্জনে ব্রতী করার সাধ সফলরামের বিশেষ অশান্তির কারণ হয়ে উঠল। নবম বৎসরে মুচিরামকে সন্ধ্যাহ্নিক শিখিয়ে পৌরোহিত্যে সুশিক্ষিত করবার একটা বাসনা সফলরামের হয়েছিল, সে বিষয়েও বিফলমনোরথ হয়ে অবশেষে ওলাওঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে বাঁচলেন।

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভব কায়স্থ। একশত টাকা বেতনে ফৌজদারী অফিসের হেড কেরাণী। ঈশানবাবু বড়লোক নন এবং বড়লোক হবার মত বুদ্ধিমানও নন, কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্ব আছে। অধিকারীর অত্যাচারে যাত্রার দল পরিত্যাগী মুচিরামকে ঈশানবাবু আশ্রয় দিলেন এবং মুচিরামের মত অকর্মা বুদ্ধিহীনকে প্রাণপণে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ঈশানবাবু বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। মুচিরামের বিদ্যালাভের অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে তাকে দশ টাকার মুহুরিগিরিতে ঢুকিয়ে আলাদা বাসার ব্যবস্থা করে দিয়ে, পেন্সনলাভের পর সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

মুচিরামের যোগ্য শ্যালক ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী। ভজগোবিন্দ বুদ্ধিমান, কর্মঠ, কালেক্টরীর অফিসে সে তাইদনবিশের কাজ করত, বারো বছর ধরে সে কালেক্টরী অফিসের কাজকর্ম ভালো করেই শিখেছিল কিন্তু সুবুদ্ধির অভাবে এবং উন্নতির কলাকৌশল মুচিরামের মত আয়ত্ত করতে না পারাতে তার বেশী উন্নতি হল না। মুচিরাম নিজের উন্নতির পর থেকে ভজগোবিন্দকে কাছে রেখে পরে মুহুরিগিরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুচিরামের বিষয়সংক্রান্ত সমস্ত সমৃদ্ধি, ধনসম্পদবৃদ্ধি এবং জমিদারী ও এইসব বিষয় আশয়ের যথোপযুক্ত পরিচালনা এই ভজগোবিন্দই করেছেন। মুচিরামের মত নির্বোধ বড়লোককে ভাঙ্গিয়ে ভজগোবিন্দ বড়লোক হতে পারতো কিন্তু সে অসৎ ছিল না। মুচিরামের স্বার্থপরতার চরম প্রকাশিত হল যখন ভজগোবিন্দের পুত্রবিবাহের সংবাদে মৌখিক আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না।

ভদ্রকালী মুচিরামের স্ত্রী। চতুর্দশবর্ষীয়া ভদ্রকালীর দৌরাত্ম্য এবং জেদের

মান রক্ষা করেই মুচিরাম রায়বাহাদুরকে চলতে হয়। স্ত্রীর বিষ খাওয়ার ভয়ে চট্টগ্রামের ডেপুটিপদে যোগ না দিয়ে মুচিরাম চাকরী ছেড়ে দিল। তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করাসংযোগ পূর্বক অম্লে ভদ্রকালীর বিশেষ রুচি। স্ত্রীর বেনামীতে মুচিরাম অনেক জমিদারী পত্তনি নিয়েছিল। ফলে অল্পকাল মধ্যেই ভদ্রকালী জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হ'ল। স্বর্ণলঙ্কারও তার লাভ হল অনেক। কিন্তু সেই অলঙ্কারে সেজে সবাইকে দেখাতে না পারলে সুখ পরিপূর্ণ হয় না। এইজন্যই কলকাতায় গিয়ে বাস করতে ভদ্রকালীর এত উৎসাহ। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখলেন, অলঙ্কারে সেজে যারা রাজপথ কলুষিত করে, ভদ্রকালী তাদের শ্রেণীভুক্ত হবার ইচ্ছা রাখেন না। অন্যত্র—"দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব ঘুচিয়া গেল।"[১৫] সুতরাং ভদ্রকালীর কলকাতায় আসা একদিক থেকে বৃথা হল।

কৈবর্তদের বারোয়ারীপুজোয় যে যাত্রার দল এসেছিল, সেই দলের কর্তা হারাণ অধিকারী। নিজের ব্যবসায় অধিকারী ভালোই বুঝতেন এবং যেখানে অর্থাগমের সম্ভাবনা সেখানে তার চক্ষু কর্ণ সজাগ। এইজন্যই মুচিরামের সুকণ্ঠ তাকে আকর্ষণ করেছিল—"মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কানের ভিতর গেল। কানে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ করিল।"[১৬] অধিকারী যাত্রার জন্য ছেলে জোগাড় করেন, তাদের যথাসম্ভব দোহন করে নেন। সুতরাং যাত্রা করবার সখের পরিবর্তে মুচিরামের লাভ, প্রাণধারণোপযোগী কিছু খাদ্য, অধিকারীর বেত, উপরন্তু "অধিকারীর কানমলায় দুই কানে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়।"[১৭]

১৫। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ১২শ পরিচ্ছেদ

১৬। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ২য় পরিচ্ছেদ।

১৭। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ৩য় পরিচ্ছেদ।

সেকালের যাত্রাদলের অধিকারীদের একটি সরস রেখাচিত্র চরিত্রটির মধ্যে বিদ্যমান।

* * * * *

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। বাংলাদেশের কোমল মৃত্তিকার আবেগধর্মিতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ নিবিড়তর। এই দেশের গৃহজীবনের পাশে পাশে সন্ন্যাসচর্যার সাধনা। ধর্মের বিচিত্র মত ও পথের অনুস্থতি দেখা গেছে বিভিন্ন শতাব্দীর ধর্মীয় বিপ্লবের মধ্যে। সন্ন্যাসীদের সাধনাধারা ও লক্ষ্যও তাই ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তা পাশ্চাত্যমনীষীদের চিন্তার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে বঙ্কিমমানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সমন্বয়ী ধর্মচিন্তার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের সৃষ্টি। তাঁর ভগবদ্গীতাভাষ্যে নিষ্কামকর্মযোগের মৌলিক ব্যাখ্যা, তাঁর স্বকীয় অধ্যাত্মচিন্তার ফলশ্রুতি। এই গ্রন্থগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ও চিন্তাধারা লক্ষ্য করলে মনে হয় আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ নেই, তাঁর মন্ত্র "জগদ্ধিতায়" আর "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"[১৮] অনুশীলনের মাধ্যমে দেহমনের সমস্ত বৃত্তির উৎকর্ষসাধন করতে হবে, কিন্তু আত্মমুক্তি নয়, জগতের মঙ্গলসাধন, মানুষের কল্যাণচেষ্টা এই হবে লক্ষ্য। সন্ন্যাসী হবেন নিরাসক্ত নিষ্কাম কর্মের সাধক, তাঁর ভোগ হবে ত্যাগপূত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে দেখা যায় তাঁর কৈশোর ও কৈশোরোত্তর জীবনে সন্ন্যাসের প্রভাব পড়েছে নানাভাবে। বিপদে, দুর্দিনে দৈবী আশীর্বাদের মত সন্ন্যাসীর করুণা তাঁদের পরিবারকে রক্ষা করেছে বার বার। সন্ন্যাসীর স্বতঃস্ফূর্ত মানবকল্যাণচেষ্টা ও অলৌকিক শক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বহুবারই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্কিমজীবনী'র এই একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

"বৈতরণীর খেয়াঘাটে নীত মৃতপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র আকস্মিকভাবে আগত তেজোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী কর্তৃক পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেন। এই সন্ন্যাসী পরে যাদবচন্দ্রকে বৈতরণী তীরে দীক্ষা দেন।"

"বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাগোঁয়াতে বদলি হইয়া

১৮। ঈশোপনিষদ—১ম শ্লোক।

গেলেন।······এই নাগোঁয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিকদর্শন পাইয়াছিলেন।"

এই কাপালিকের দর্শন বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবারই লাভ করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মন বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল যার প্রভাব তাঁর পরবর্ত্তী 'কপালকুণ্ডলা'তে দেখতে পাই। এছাড়াও স্বীয় পরিবারে সন্ন্যাসীর প্রভাব ভারতীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে সাধুসন্ন্যাসী সম্বন্ধে উৎসুক ক'রে তুলেছিল। সংসারবিরাগী অথচ লোককল্যাণব্রতী কখনো কখনো অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন এই সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুরাগ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। এই চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় "আত্মণঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" দুই একটি ক্ষেত্র ভিন্ন প্রায় সকলেরই এই লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কামধর্মে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই সন্ন্যাসীদের নিষ্কাম পরহিতার্থীরূপে গঠন করে তাঁদের মধ্যে অনুশীলনতত্ত্বকে অনেকাংশে বিকশিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ মনোভাবটি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বিচিত্র জাতের সন্ন্যাসীচরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। উপন্যাসগুলি থেকে আহরিত এই জাতীয় চরিত্রগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করব।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে অভিরামস্বামী নামক সন্ন্যাসী চরিত্রটি কিঞ্চিৎ বিচিত্র এবং রহস্যময়। প্রথম যৌবনে পদস্খলিত ব্রাহ্মণ শশিশেখর ভট্টাচার্য্য উত্তরকালে অনুতপ্ত হৃদয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও সামাজিকভাবে তিনি বিমলার এবং তিলোত্তমার মাতার জনক। তাই জামাতা বীরেন্দ্রসিংহের পরিবার সম্পর্কে তাঁর শুভৈষণা মাত্র সন্ন্যাসীর উপচিকীর্ষাই নয়, এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিক সম্বন্ধবোধও জড়িত।

অভিরামস্বামী তেজস্বী পুরুষ হ'লেও তাঁকে ঠিক আদর্শ সন্ন্যাসীর পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। সন্ন্যাসী পূর্বাশ্রম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হন। পারিবারিক কোন বন্ধনকেই তিনি আর স্বীকৃতি দেন না। কিন্তু অভিরামস্বামীর ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। তিনি সংসারবিরাগী সাধকমাত্র, যথার্থ সন্ন্যাসী নন, তাই পূর্বাপর বীরেন্দ্রসিংহের পরিবারে মঙ্গলসাধনাতেই তাঁকে প্রয়াসী দেখা গিয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা যে বনে বাস করতেন, সেই বনের অভ্যন্তরস্থ দেবমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজারী 'অধিকারীর' বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত। কর্ণে কিছু বধির। ইনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করতেন। তাঁর বংশপরিচয় এবং কিভাবে কাপালিকের আশ্রয়ে তাঁকে প্রতিপালিত হতে হয় অধিকারী তা জানতেন। ইনি সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়াতে কপালকুণ্ডলার হিত বিবেচনা করে পিতার মমতা ও শঙ্কা-সাবধানতা নিয়ে নবকুমারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রদান করে নিশ্চিন্ত হন। নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধনও তাঁকে দিতে এই মহৎচরিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্বিধা করেন নি।

'মৃণালিনী'তে নবদ্বীপে অবস্থানকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনার্দন মনোরমার পিতার গুরু। ইনিই মনোরমাকে প্রতিপালন করেন এবং মৃত শিষ্যের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুসারে মনোরমার নিকট তার বিবাহসংক্রান্ত প্রকৃত পরিচয় গোপন করেন। এই ব্রাহ্মণের কর্ণবধিরতা ও সরলতা কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত দামোদরের পাণ্ডিত্যের চেয়ে প্রতারণার বুদ্ধিই বেশী লক্ষিত হয়। পাণ্ডিত্যকেই ইনি রাজাকে প্রবঞ্চনার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

দুর্গাদাস, পশুপতির অষ্টভুজার মন্দিরে দেবীর নিত্যসেবার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণ। এই পুরোহিত ব্রাহ্মণ সৎ, নিষ্ঠাবান ও স্বীয় প্রভুর প্রতি সর্ব অবস্থাতেই কর্তব্য ও নিষ্ঠায় অটল। স্বজনবিহীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে মৃত পশুপতিকে দুর্গাদাসই পুত্রসহ ভস্মস্তূপ থেকে উদ্ধারপূর্বক যথারীতি গঙ্গাতীরে হিন্দুসংস্কার অনুসারে দাহকার্য সমাপন করেন।

দুর্গাদাসের পুত্রও দুর্গাদাসের মতই প্রভুভক্ত, পিতৃকার্যে একান্ত সহায়ক।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যঙ্গাত্মক মূর্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরকার এক পরমরসিক শিল্পী উল্লেখ্য চরিত্রটির চিত্রায়ণের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গজপতির রূপ, বুদ্ধি, বিদ্যালাভের প্রয়াস সবকিছুর মধ্যেই যে এক পরম নির্বুদ্ধিতা প্রকট হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে ব্যঙ্গ যতই থাক একটা স্নিগ্ধ কৌতুক সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

অতীতকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংসারানভিজ্ঞতা সম্পর্কে বহু কৌতুককর

গল্প চলিত আছে। এর সঙ্গে মূর্খতা যুক্ত হ'লে তার যে কী পরিণতি ঘটতে পারে, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ৩৪শ পরিচ্ছেদে পথিমধ্যে রোগপীড়িতা মুমূর্ষু সূর্যমুখীকে যিনি উদ্ধার করে আশ্রয় দেন এবং নগেন্দ্রকে সংবাদ পাঠান, তিনিই শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা ও সেবাব্রতের প্রতিমূর্তি। চরিত্রটি স্বল্প আয়তনে রচিত, কিন্তু শুচিতা ও শুভৈষণায় বঙ্কিমচন্দ্র এই যৎসামান্য ব্রহ্মচারীর মধ্যেও সন্ন্যাসব্রতীর অন্তর-মহিমা অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আনন্দমঠে'র ধীরানন্দ স্বামী জীবানন্দ ভবানন্দের মতোই আনন্দমঠের অন্যতম সন্তান—একজন বিশিষ্ট ও বীর যোদ্ধাও বটেন। রণক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় আছে। সত্যানন্দ স্বামীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি—তাঁর গোপনীয় দৌত্যে নিয়োজিত। সন্তানদলের মধ্যে ধীরানন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বিদ্যমান।

বালক সন্ন্যাসীবেশে গৃহপলাতকা শান্তি যে পর্যটক সন্ন্যাসীর দলে যোগদান করেছিল, তাঁর সন্ন্যাসী অধ্যাপক সেই দলের একজন। যৌবনপ্রাপ্তা শান্তিকে নারী বলে বুঝতে পেরে তার রূপলাবণ্যে এই সন্ন্যাসীর চিত্তবিকার ঘটে। শান্তিকে সংস্কৃতকাব্য পড়ানোর ছলে তিনি "আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন।"[১৯] পরে আর একটু অগ্রসর হলে বলশালিনী শান্তির একটি অমোঘ মুষ্ট্যাঘাতে তাঁর সংজ্ঞালোপ হয় এবং শান্তি সন্ন্যাসীদল পরিত্যাগ করে।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে 'সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়', এই চরিত্রটি তার ব্যতিক্রম। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই সকলের আসক্তিমুক্তি ঘটে না—মহর্ষিরও আত্মবিস্মৃতি ঘটে। শান্তির অধ্যাপক তারই নিদর্শন।

১৯। আনন্দমঠ : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে কৃষ্ণগোবিন্দ দাস কায়স্থের সন্তান। স্বচ্ছন্দেই দিনাতিপাত করত। কিন্তু অনেক বয়সে এক সুন্দরী বৈষ্ণবীর প্রভাবে ভেক নিয়ে বৈরাগী হয়। কিন্তু সুন্দরী পত্নীর উপর বিবিধ জনের দৃষ্টি ক্রমাগত আকৃষ্ট হতে থাকায় শেষে সপরিবারে অরণ্যবাসী হয়। বনমধ্যে একটি ভগ্ন অট্টালিকায় সে প্রভূত গুপ্তধন আবিষ্কার করে—কিন্তু বৈষ্ণবীকে জানায় না। বৃদ্ধের অন্তিম উপস্থিত হ'লে বৈষ্ণবী পলায়ন ক'রে। এই সময় ঘটনাবিড়ম্বিতা প্রফুল্ল কৃষ্ণগোবিন্দের সমক্ষে উপস্থিত হ'য়ে সেবাযত্ন করলে বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লকে কুড়ি ঘড়া মণিমাণিক্য স্বর্ণ ইত্যাদি গুপ্তধন দান করে যায়।

উক্ত বৈষ্ণবীচরিত্রটিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সুতীব্র কটাক্ষ করেছেন। ১ম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে এই ক্ষুদ্র চিত্রটির মধ্যে বৃদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস ও তাঁর সুন্দরী বৈষ্ণবীর একটি সংক্ষিপ্ত ও মনোরম জীবননাট্য বিকশিত। বাংলা দেশের তথাকথিত নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের নৈতিকরূপ বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে দেখেছিলেন, সুন্দরী বৈষ্ণবীকে নিয়ে কৃষ্ণগোবিন্দের অরণ্যবাস, ধনপ্রাপ্তি গোপন করা এবং বৃদ্ধের অন্তিমকালে তার যথাসর্বস্ব হরণ করে বৈষ্ণবীর পলায়ন—এ তারই একটি বাস্তব চিত্র, এ চিরকালের এক মানবিক ইতিহাসও বটে।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে এক দয়ালু দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহৃদয়তা ও সহায়তায়ই দস্যুলাঞ্ছিতা ইন্দিরার প্রাণ ও মান রক্ষা পায়। ইন্দিরা দস্যুহস্তে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণমাত্র সম্বল করে মহেশপুরে ফিরে যাবার পথে দিগ্‌ভ্রান্ত। তখন এই ব্রাহ্মণের করুণায়ই তাঁর গৃহে সে আশ্রয়লাভ করে এবং ইনিই নিজ যজমান কৃষ্ণদাস বসুর সঙ্গে ইন্দিরাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

এই যাজক ব্রাহ্মণের পত্নী সহৃদয়তায় ও নারীসুলভ মমতায় ব্রাহ্মণেরই যোগ্য। দুঃসহ কষ্টের পর দুর্দশার চরমে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ইন্দিরা তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও ব্রাহ্মণীর স্নিগ্ধ সেবা ও মমতাপূর্ণ যত্ন ইন্দিরার মনে ও দেহে ক্ষণিক শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

'রাজসিংহে'র মিশ্রঠাকুর চঞ্চলকুমারীর কুলপুরোহিত। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। নির্লোভ, স্নেহশীল এবং বুদ্ধিমান। অনন্তমিশ্রের সর্বাবয়বে ব্রাহ্মণের

দীপ্তি। স্নেহে, প্রসন্নতায় আর পবিত্রতায় দীপ্যমান এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলের ভক্তি ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। চঞ্চলকুমারীর প্রতি সুগভীর স্নেহে দুঃসাহসিক বিপদের মুখে অগ্রসর হতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। পথে নিজ সারল্যবশতঃ দস্যুহস্তে পতিত হ'লে রাণা রাজসিংহের কল্যাণে তাঁর বন্ধনমোচন হয় এবং অভীষ্ট পত্রটি যথাস্থানে পৌঁছোয়।

* * *

হিন্দু-মুসলিম, ইংরেজ রাজপুরুষ ও সৈনিক প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসে আছে। সামাজিক উপন্যাসেও এইরকম বিভিন্ন রাজপুরুষ, জমিদারী কর্মচারী, আদালতের আমলা পেয়াদা ও এ্যাটর্নি উকিল, মুৎসুদ্দি ইত্যাদি কাহিনীর প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উচ্চশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কর্মদক্ষতার গুণে বারবার তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। চাকুরীক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন রাজপুরুষ এবং আইন-আদালত সংক্রান্ত কর্মচারীদের বাস্তব-সান্নিধ্যে এসেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মুচিরাম গুড় যেমন জীবন্ত তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র হাকিম-উকিল-পেয়াদা অথবা কৃষ্ণকান্তের উইলের ডিটেকটিভ্ ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁ এবং তার তিনটি সাজান সাক্ষীও সমান প্রাণবন্ত। রাজসিংহ উপন্যাসের বক্সী, চন্দ্রশেখরের মীর মুন্সী, বরকন্দাজ, বকাউল্লা অথবা আনন্দমঠের ইংরেজসৈনিক লিণ্ডলে ইত্যাদি চরিত্র মানসপ্রসূত হ'য়েও কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতায় সত্য হয়ে উঠেছে। আমরা বঙ্কিমের এই পর্যায়ের চরিত্রগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ধরমসিংহ মানসিংহ কুমার জগৎসিংহের অধীনস্থ রাজপুত-সৈনিক। দুর্যোগের সন্ধ্যায় নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জগৎসিংহ যখন গড়মান্দারণের শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কর্তব্যনিষ্ঠ এবং প্রভুভক্ত এই সৈনিকই তখন অনুসন্ধান করে তাঁর সঙ্গে পুনরায় যোগস্থাপন করে।

খ্বাজা ইসা পাঠান নবাব কতলু খাঁর প্রধান রাজমন্ত্রী। কতলু খাঁর মৃত্যুর পর যখন কতলু খাঁর ইচ্ছানুসারে জগৎসিংহের চেষ্টায় মোগল পাঠান সন্ধিসম্বন্ধ হ'ল তখন নবাবপুত্রদের নিয়ে খ্বাজা ইসাই মানসিংহের শিবিরে গমন করেছিলেন।

বঙ্গপ্রদেশ শাসনের জন্য মানসিংহ সৈয়দ খাঁকে নিজের প্রতিনিধিস্বরূপ

নিযুক্ত করেছিলেন। পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য মানসিংহ বর্দ্ধমানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে সৈয়দ খাঁর দূতের মুখে শুনলেন, বর্ষার আগে সৈন্যসংগ্রহ করে তিনি আসতে পারবেন না। অগত্যা রাজাকে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করতে হ'ল।

'চন্দ্রশেখরে'র বকাউল্লা খাঁ তেলিঙ্গা সিপাহী, নিবাস গাজিপুরের নিকট। লরেন্স ফস্টর যে নৌকায় শৈবলিনীকে অপহরণ করে নিয়ে চলেছিল সেই নৌকায় প্রহরায় নিযুক্ত ছিল বকাউল্লা খাঁ। প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন, তখন তাঁর লাঠির ঘায়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। পরে শৈবলিনীর শিবিকা অনুসরণ করে অলক্ষ্যে থেকে প্রতাপের গৃহ চিনে এসে অমিয়ট্ সংবাদ দেয় এবং সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এর পরিণাম শৈবলিনীর পক্ষে যাই হোক, দলনীবেগমের জন্য এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের সূচনা করে।

ক্লাইভের সঙ্গে প্রথম যে সেনাদল মান্দ্রাজ থেকে বঙ্গদেশ এসেছিল তাদের তেলিঙ্গা বলত। পরে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজসেনাভুক্ত হয়েছিল। এইজন্য বকাউল্লা গাজিপুরের মুসলমান হলেও তেলিঙ্গা সিপাহীই তাকে বলা হয়েছে।

বকাউল্লা খাঁর নির্দেশমত শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহ থেকে পুনরায় বলপূর্বক নিয়ে আসবার জন্য কয়েকজন সিপাহীসহ জনসন ও গলষ্টন নামক দুজন ইংরেজকে অমিয়ট্ প্রেরণ করেন। এরা দুইজনই বীর, আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় অব্যর্থলক্ষ্য এবং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতে জানেন। এঁদের দুজনকেই সর্বদা অমিয়টের সঙ্গে দেখা যায়, তাঁর সর্বকার্যে এঁরা বিশেষ সহায়ক। ভারতীয়চরিত্র সম্বন্ধে এদের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার গর্ব আছে। তীব্র স্বজাত্যভিমানে ভারতীয়দের প্রতি এদের অবজ্ঞা প্রকট। "জনসন বলিল, অপেক্ষা কেন লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজী লাথিতে টিঁকিবে না।"[২০] এই হল এদের মনস্তত্ত্ব। এরাই শৈবলিনী বলে ভুল করে দলনী ও কুলসমকে নিয়ে যায়। পরে নবাবসেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অমিয়টের সঙ্গে মিলিত জনসন ও গলষ্টন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে প্রাণবিসর্জন করে, তাদের মৃত্যুকালীন স্বপ্ন ইংরেজের এদেশে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা।

২০। চন্দ্রশেখর : ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

মীরকাসিমের একজন বিশিষ্ট অমাত্য আমীর হোসেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত এবং নবাবের বিশেষ হিতৈষী। লরেন্স ফষ্টর যখন জন ষ্ট্যালকার্ট-এর ছদ্মবেশে নবাবের সেনাবিভাগে প্রবেশ করলেন তখন নবাবের আদেশে অপরাধী লরেন্স ফষ্টরকে ষ্ট্যালকার্টের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও আমীর হোসেন কুলসমের সাহায্যে গ্রেপ্তার করেন।

'রাধারাণী' উপন্যাসে রাধারাণীকে জিতিয়ে কামাখ্যানাথবাবু তাঁর সম্পত্তির দখল নেওয়ালেন। সে নাবালিকা থাকাতে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কালেক্টর রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু কামাখ্যানাথের কৌশলে তিনি নিরস্ত হন। কামাখ্যানাথ নিজেই সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার নেন।

'রজনী'তে পুত্র রামসদয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাঞ্ছারাম মিত্র মনোহর দাসের নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেন এবং যেহেতু মনোহর দাস নিরুদ্দিষ্ট সেইজন্য "বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন।"[২১] এই বিষ্ণুরাম বহু চেষ্টায় পূর্বে মনোহরদাসের সন্ধান পান নি। তারপর অমরনাথের অনুসন্ধিৎসায় যখন রজনী রামসদয়ের বিষয়ের প্রকৃত অধিকারিণী প্রতিপন্না হন তখন এই ব্যাপারে বিষ্ণুরামই অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থিত করেছিলেন।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে যশোহরের একজন সুদক্ষ ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর রোহিণী-হত্যার তদন্তে এসে তিনি চিঠিপত্র এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে গোবিন্দলালের পরিচয় আবিষ্কার করেন এবং বৃন্দাবনে পলাতক বৈষ্ণববেশী গোবিন্দলালকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন, সুতরাং সুপরিচিত পুলিশী কৌশলে তিনি তিনটি মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করেন, অবশ্য মাধবীনাথের কূটকৌশলে ও অর্থলোভে এই তিন সাক্ষীই শেষপর্যন্ত মামলাটি নষ্ট করে দেয় এবং গোবিন্দলাল খালাস পায়। আদালত-জীবনে অভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র একটি পুলিশ-

২১। রজনী: ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

কর্মচারীর বাস্তবচিত্রই এই ইনস্পেক্টর ফিচেল খাঁর মধ্যে প্রকটিত করেছেন।

গোবিন্দলালের হত্যাপরাধ প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তিনজন জাল-সাক্ষীকে ফিচেল খাঁ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু মাধবীনাথের কাছ থেকে হাজার টাকা উৎকোচলাভের বিনিময়ে এরা প্রত্যেকেই আদালতে পূর্বপ্রদত্ত জবানবন্দী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং বলে ফিচেল খাঁর প্রভাবে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়েছে এবং বলে "ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।"[২২] সুতরাং একজন ভ্রাতার সঙ্গে মারামারির দাগ এবং অপরজন রাংচিতার আঠাজাতীয় ঘা এবং তৃতীয়জন অনুরূপ কিছু দেখিয়ে মামলাটি ফাঁসিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে এই জাতীয় ভাড়াটিয়া সাক্ষীর নিদর্শন আদালতে প্রত্যহ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাদের তিনটিকে এখানে অতি সরসভাবে উপস্থিত করেছেন এবং এদের মধ্য দিয়ে পেশাদার গ্রাম্য সাক্ষীর একটি নিখুঁত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

এক উকিল রোহিণীহত্যার মামলায় ফিচেল খাঁর তিন সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরায় কোন লাভ হয় না। তিনজনেই বিপরীত সাক্ষ্য দেয় এবং সরকারী উকিল ক্ষুণ্ণচিত্তে মামলায় জয়ের আশা পরিত্যাগ করেছেন।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ডনি ওয়ার্থ শিবগ্রামে একটি রেশম কুঠির ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল। ইনি সন্তানদের দ্বারা বিশেষভাবে উৎপীড়িত হয়েছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাস এই ডনি ওয়ার্থেরই অতিথি হন এবং জনকয়েক দস্যুকে বিতাড়িত করে সন্তানসেনা বিধ্বস্ত হয়েছে এই আত্মগৌরবে মুরগী, মটন ও পনীর পরমানন্দে আত্মসাৎ করতে থাকেন ও ডনি ওয়ার্থকে ভরসা দিয়ে বলতে থাকেন—"বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস।"

সন্তানবিদ্রোহদমনে আগত এবং ডনি ওয়ার্থের কুঠিতে তার শ্মশ্রুল দ্বিতীয় দ্রৌপদীতুল্য বাবুর্চির রন্ধনে পরিতুষ্ট অতিথি ক্যাপ্টেন টমাস একজন দাম্ভিক ও বুদ্ধিহীন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ। ডনি ওয়ার্থের সঙ্গে শিকারে নির্গত হয়ে ইনি বনমধ্যে সন্ন্যাসীবেশিনী শান্তির সাক্ষাৎ পান এবং শান্তিকে তাঁর কাছে স্ত্রীরূপে বসবাস করার একটি মনোরম প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। অর্থাৎ

২২। কৃষ্ণকান্তের উইল: ২য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।

লোকটি চরিত্রহীনও বটে। এই নির্বুদ্ধিতা এবং অহঙ্কারের পরিণাম শেষপর্যন্ত কৌশলী সন্তানসেনার হাতে ইংরেজ সৈন্যের সর্বনাশ এবং টমাসের মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুকালে টমাস ইংরেজচরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ভবানন্দ তাকে হত্যা করতে উদ্যত জেনে টমাস বলেছেন 'তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার' এবং একজন আইরিশম্যানের গুলিতে তিনি প্রাণবিসর্জন করেছেন। এখানে সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্ববিজয়ী সাম্রাজ্যস্থাপনকারী ইংরেজের যথার্থ চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ক্যাপটেন হে এবং লেফটেন্যান্ট ওয়াট্সন সন্তানদের সঙ্গে টমাসের যুদ্ধে তার সহকর্মী। এঁরাও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, এবং যদিচ উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে লিখিত নয়, তথাপি অনুমান করা যায় এঁরাও টমাসের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন।

ক্যাপটেন টমাস নিহত হ'লে ওয়ারেন হেস্টিংস সন্তানদমনে যে দ্বিতীয় সেনাপতি প্রেরণ করেন তিনিই মেজর এডওয়ার্ডস্। ইনি অনেক চতুর ও বিচক্ষণ। বৈষ্ণবীবেশিনী শান্তি এঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে এবং এডওয়ার্ডস্ কৌশলে এঁর কাছ থেকে পদচিহ্নগড়ের সন্তানসংখ্যা জানতে চান। এঁর সঙ্গে শান্তি কিছু রঙ্গরসিকতা করেছে কিন্তু এডওয়ার্ডস্ টমাস নন, অত সহজে তিনি বিভ্রান্ত হন না। শান্তি লিণ্ডলেকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিয়ে পলায়ন করলে মেজর এডওয়ার্ডস্ সেই মুহূর্তেই সন্তানসেনা আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হন। আনন্দমঠের এই শেষ যুদ্ধে এডওয়ার্ডসের পরিণতি জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ ইনিও নিহত হয়েছিলেন।

লিণ্ডলে এডওয়ার্ডসের অধীনস্থ একজন যুবা এনসাইন। শান্তির রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ এই নির্বোধ ইংরেজ অশ্বপৃষ্ঠে শান্তিকে নিয়ে পদচিহ্নে যাবার পথে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে ঘোড়ার রেকাব থেকে পা তুলে নেয় এবং শান্তি তৎক্ষণাৎ তাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করে এবং লিণ্ডলে পা ভেঙ্গে পড়ে থাকে।

'সীতারাম' উপন্যাসে বন্দে আলি গঙ্গারামের পূর্বপরিচিত, তাঁরই অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হ'ল। এই ব্যক্তি একজন ছোট মুসলমান। একজন বড় মুসলমানের বিবিকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিল। ফলে বিবির পূর্বস্বামীর ভয়ে তাকে নিয়ে বন্দে আলি মহম্মদপুরে পলায়ন

করে বসবাস করতে লাগল।

বন্দে আলি গঙ্গারামের বিশেষ বিশ্বাসভাজন। সুতরাং একেই দূত করে গঙ্গারাম তোরাব খাঁর কাছে পাঠালেন, সীতারামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে নগর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব জানিয়ে। কিন্তু নদী পার হ'বার সময় নিরপেক্ষ এবং সীতারামের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে বন্দে আলির সাক্ষাৎ হওয়াতে চাঁদশাহ্ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে একটা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে অনুসন্ধিৎসু হলেন।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' কমলাকান্তের অফিসের সাহেব সুশিক্ষিত কমলাকান্তের ইংরেজী গুনে তাকে চাকুরীতে বহাল করেছিলেন কিন্তু কমলাকান্ত চাকুরী রাখতে পারেন নি কারণ সরকারী বইতে তিনি কবিতা লিখতেন, অফিসের চিঠিপত্রের উপর শেকস্‌পীয়রের বচন উদ্ধৃত করে রাখতেন, কিন্তু তাঁর চাকরী যায় অবশ্য অন্য কারণে। মাসকাবারীর পে-বিল তৈরী করতে গিয়ে তিনি একটি ছবি আঁকেন—একদল নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইছে আর সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে দুচারটি পয়সা ছুড়িয়ে দিচ্ছে। এই "যথার্থ পে-বিল" দেখে বুদ্ধিমান সাহেব মানে মানে কমলাকান্তকে বিদায় দেন। এই সাহেবের যথেষ্ট ভদ্রতা, গুণীর মর্যাদাবোধ এবং উদারতা আছে বলেই কমলাকান্তকে কিছুকালও সসম্মানে রাখতে পেরেছেন।

বাংলাসাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর সরস একাঙ্ক নাটিকা হিসাবে 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনাটিকে স্থান দেওয়া যায়। এর কিছু চরিত্র :—

ক) প্রসন্নর গরুচুরি মামলায় এক চাপরাশি কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলেছিল এবং তাঁর মৃদুহাসি দেখে ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁকে হলফ পড়তে বলেছিল।

খ) আদালতে এক মুহুরি কমলাকান্তকে হলফ পড়াতে আসেন কিন্তু কূটতার্কিক কমলাকান্তের যুক্তিতে নাজেহাল হন এবং শেষপর্যন্ত সক্ষোভে হাকিমকে জানান "ধর্মাবতার সাক্ষী বড় সেরকশ্।"

গ) প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুচুরির মামলার বিচারপতি হাকিম রসিক এবং সহৃদয়। কমলাকান্তের উল্টাপাল্টা কথায় মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হয়েছেন, একবার Contempt of Court-এর দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

কিন্তু কমলাকান্তের হাতে দুই উকিলের যে দুর্গতি হয়েছে তা দেখে প্রভূত কৌতুক অনুভব করেছেন।

ঘ) প্রসন্ন গোয়ালিনীর উকিল (১ নং), কমলাকান্তের কাছ থেকে জোবানবন্দী আদায় করতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছেন এবং কমলাকান্তের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েও নিজের সাক্ষীকেই hostile বলতে বাধ্য হয়েছেন। এই উকিলের সঙ্গে সরস সংলাপ এবং এর অপদস্থ হওয়ার কৌতুকটুকু হাস্যরসের দিক থেকে একান্ত উপভোগ্য।

ঙ) আসামী পক্ষের উকিলও (২ নং), নিয়মমাফিক কমলাকান্তকে জেরা অর্থাৎ cross করতে গিয়েছিলেন। কমলাকান্ত প্রথম উকিলকে "সমুদ্রলঙ্ঘনকারী হনুমান" বলেছিলেন। এই উকিলকে একাধারে কুমারবাহাদুর অঙ্গদ এবং গাভীরূপে সম্ভাষণ করলেন। উকিল বিরক্ত হয়ে বললেন 'হোপলেস্' এবং হাকিমের কাছে প্রার্থনা করলেন, "সাক্ষী বাতুল" একে বিদায় করে দেওয়া হোক।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' গঙ্গারাম সাহেব (Grongerham গঙ্গারহ্যাম) মুচিরাম গুড়ের আদালতে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট। লোকে ইংরেজী নামটা উচ্চারণ করতে পারত না তাই দেশীয় মতে একে গঙ্গারামে রূপান্তরিত করেছিল। অলস, সৎ এবং সহৃদয় মানুষ এই নিষ্ক্রিয় সরল সাহেবের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অসৎ উপায়ে মুচিরাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। গঙ্গারামের অনুগ্রহেই মুচিরাম "রুধিরে পরিপ্লুত" মীরমুন্‌শীর পদলাভ করে।

হোম সাহেব জেলার কালেক্টার, চাটুকারিতায় অনুরাগী। এর মনে "লর্ড ঘরানা" সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা ছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চাটুকার মুচিরাম বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে পেস্কার নিযুক্ত হয় এবং ফলে তার উপার্জনের আর সীমা থাকে না। শুধু সেলাম বাজিয়ে মুচিরাম কার্যসিদ্ধি করে নিত।

হোমসাহেব বদলি হ'য়ে গেলে তাঁর স্থানে রীডসাহেব আসেন। ইনি অতি বিচক্ষণ ন্যায়বান ও দয়াশীল সিভিলিয়ান। অচিরেই বুঝতে পারেন "মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর"—অকর্মা অথচ ভারীরকমের ঘুষখোর। ইনি মুচিরামকে তাড়াবার অন্য উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত করে দেন। ফলে মুচিরামের শাপে বর না হয়ে বরে শাপ হয়। কারণ, ডেপুটি কালেক্টারিতে পদোন্নতি আছে বটে কিন্তু ঘুষ খাওয়া বন্ধ—"ডিপুটিগিরি একপ্রকার আমলাদিগের বৈধব্য।"

রামচন্দ্র দত্তের হাতে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে, মুচিরাম কলকাতা ত্যাগ করে তার জমিদারীতে গেলে বহু প্রজা তাকে দর্শন করতে এবং প্রণামী দিতে আসেন। যারা দূরবর্তী গ্রামের প্রজা, তারা মুচিরামের বাগানেই বিশ্রাম ও আহারাদি করত। অঞ্চলটিতে দুর্ভিক্ষ থাকায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মীনওয়েল সাহেব ঘোড়ায় চড়ে প্রজাদের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন। মুচিরামের বাগানে অনেকগুলি লোককে আহার করতে দেখে, তাদের কাছে তার অপূর্ব বাংলা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে 'ভুড়ভেক্ষা' সম্বন্ধে যে তথ্য আহরণ করেন তার সেই কৌতুককর তথ্যলাভের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিনা খরচে মুচিরাম একাধারে পরম দানবীররূপে খ্যাতি এবং অন্যদিকে রাজবাহাদুর পদবী লাভ করেন।

*   *   *   *

বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় আভিজাত্যের দিকে তাকালে একথা মনে হয় না যে সমাজের নিম্নতরস্তরের অতিসাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান পেতে পারে অথবা স্থান পেলেও তাদের ছোট ছোট সুখদুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে লেখক এত সমবেদনার সঙ্গে শিল্পিত করতে পারেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের দাসদাসী ও শ্রমজীবী চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি চরিত্র তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এরা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ হলেও হৃদয়সামর্থ্যে ও সৌহার্দ্যগুণে সুহৃদ অথবা সখীত্বে অনেকটা উন্নীত হয়েছে। এদের প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া সমাজের নিম্নস্তরবর্তী যে সব সাধারণ নরনারী বঙ্কিমের উপন্যাসে উপস্থিত, তাদেরও পরিচয় এই প্রসঙ্গে দেওয়া হল।

'কপালকুণ্ডলা'র প্রারম্ভে সাগরযাত্রীরা যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন যে নাবিকদলের হাতে ছিল নৌকা, তারা সুদক্ষ নাবিক নয়, জলপথ যখন বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তখন নৌকা ঠিকপথে চালিয়ে নেবার তীক্ষ্ণবুদ্ধিও এদের নেই। নদীপথে কুয়াসায় যখন দিগ্‌বিদিক্ স্থির করা যাচ্ছে না তখন শঙ্কিত যাত্রীদের ভরসা দেওয়া দূরস্থান, এরা নিজেরাই ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। নবকুমারই সকলকে সাহস দিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশমত চলেই তরণী রক্ষা পেয়েছে; অথচ নবকুমার কাষ্ঠসংগ্রহ করতে গেলে যখন

জোয়ারের জন্য নৌকা ছেড়ে দিতে হ'ল, তারপর নবকুমারকে উদ্ধারের জন্য অকৃতজ্ঞ নাবিকেরা কিছুতেই ফিরে যেতে রাজী হল না।

'কপালকুণ্ডলা'র 'ভিক্ষুক' চরিত্রটি লেখক চমৎকার ফুটিয়েছেন। একটি ভিক্ষুকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমিত রূপ, লোভ, আশার অতীত প্রাপ্তিতে তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া ছবির মত ফুটে উঠেছে, কোথাও আতিশয্য নেই। কপালকুণ্ডলার পান্থের কাছে সামান্য ভিক্ষার প্রত্যাশায়ই সে গিয়েছিল, এত মূল্যবান রত্নালঙ্কার ভিক্ষা পাওয়া যেতে পারে এ তার কল্পনারও অতীত। কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বাস্তব এবং পরিণামবুদ্ধিসম্পন্ন ভিক্ষুক তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে বিলম্ব করে নি।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে আশমানি মানসিংহমহিষী উর্ম্মিলাদেবীর পরিচারিকা। তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে। সে বিমলার সখী ও বীরেন্দ্রসিংহের পরিচারিকা। বস্তুতঃ বীরেন্দ্রের ছদ্মবেশিনী পত্নী বিমলার আশ্রয়গ্রহণই তার পক্ষে স্বাভাবিক। বিমলারও পরিচারিকার ছদ্মবেশ। সুতরাং উর্ম্মিলাদেবীর গৃহে আশমানির সঙ্গে বিমলার পূর্বসখীত্ব ব্যাহত হয় নি।

দিল্লীতে বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলার গোপনপ্রণয়ে আশমানিই ছিল সমবেদনাশীলা এবং সহায়িকা।

বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরে বাসকালীন দিগ্‌গজসংক্রান্ত সরস উপাখ্যান ও বিমলার প্রহারে নৃত্য-পরীক্ষায় আশমানি ও বিমলার গভীর সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিলোত্তমার প্রতি নিবিড় অপত্যস্নেহে তার চরিত্রটিকে আরও স্নিগ্ধোজ্জ্বল করে তুলেছে।

রহিম শেখ পাঠান সৈনিক। কতলু খাঁর পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ যখন বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ করেন তখন বুদ্ধিমতী বিমলাকে নজরবন্দী রাখার প্রয়োজন বোধ করেন সবচেয়ে বেশী। ওসমান খাঁ বন্দিনী বিমলার প্রহরায় নিযুক্ত করেছিলেন পাঠান সৈনিক রহিম শেখকে। নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়পরবশ রহিমকে ছলচাতুরীর এক রমণীয় কৌশলে প্রতারিত করে বিমলা তিলোত্তমার রক্ষা হেতু এবং প্রণয়ালাপে রত জগৎসিংহকে পাঠান আক্রমণের সংবাদ জানানর জন্য পলায়ন করেন। বিমলা ও রহিমের সংলাপের ও

আচরণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মুসলমান সৈনিকের চারিত্রিক শৈথিল্য, ধনলোভ, নির্বুদ্ধিতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে হাস্যরসের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

এক অস্ত্রপ্রহরী বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে অস্ত্রশালার প্রহরায় নিযুক্ত। আম্রকাননে শত্রুপ্রবেশ করেছে দেখে জগৎসিংহের নির্দেশমত বিমলা এই প্রহরীর কাছে বর্শা চাইতে গেলে তার মনে কৌতূহল জাগল। বিমলার উত্তর অদ্ভুত হলেও সে অবিশ্বাস করে নি, কারণ, দুর্গস্থ ভৃত্য সকলেই বিমলার বাধ্য।

জগৎসিংহ কতলু খাঁর কারাগারে যে কক্ষে বন্দী, সেই কাফের প্রহরী, নিজের কর্তব্যে দৃঢ়, বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে কোন অবস্থাতেই কারাগৃহে কাউকে প্রবেশ করতে দিতে প্রস্তুত নয়। জগৎসিংহের রূঢ়তায় তিলোত্তমা কারাগৃহে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বার পর তাঁর অনুরোধে আয়েষা যখন দাসীসহ আসেন, তখন প্রহরী তাঁকে চিনতে না পারায় আয়েষাকে কারাগৃহে প্রবেশ করতে দেয় নি, পরে অবশ্য পরিচয় পেয়ে সসম্মানে প্রবেশপথ খুলে দেয়।

করিম বক্স ওসমান খাঁর অধীনস্থ একজন সৈনিক। বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ করে লুঠতরাজের পর যখন ওস্মান বিমলা ও তিলোত্তমাকে অনুসন্ধান করবার আদেশ দিলেন তখন পালঙ্কতলে এই সৈনিকই তাঁদের আবিষ্কার করে ও ওস্মানের নিকট সেজন্য পুরস্কার প্রার্থনা করে। করিম বক্স পূর্বে মোগলসৈন্য ছিল বলে তাকে সকলে রহস্য করে মোগলসেনাপতি বলে। অভিরামস্বামীর জ্যোতির্গণনা ছিল "মোগলসেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।" সেই কথা স্মরণ করে বিমলা শঙ্কিত হলেন।

কতলু খাঁর আদেশে বীরেন্দ্রসিংহকে বধ করেছিল যে জল্লাদ সে স্বভাবতঃই হৃদয়হীন। মানুষকে হত্যা করা এদের কাছে কর্তব্যমাত্র, মৃত্যুর বেদনা এদের হৃদয়কে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না। বীরেন্দ্রসিংহের বিদায়কালে বিমলার রোদন ও সামান্য আলাপের সুযোগ দিতেও জল্লাদ অধৈর্য হয়ে বলেছে—'আর বিলম্ব করিতে পারি না'। তারপর বীরেন্দ্রসিংহের অনুমতি পেতেই অবিচলিত চিত্তে বধকার্য সমাপ্ত করেছে। প্রসঙ্গতঃ 'সীতারাম' এর হিন্দু জল্লাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিচারবুদ্ধিহীন রাজার আদেশে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে সভামধ্যে বিবসনা করে বেত্রাঘাতের জন্য মঞ্চে উঠেও ধর্মভয়ে সে পলায়ন করে।

চরিত্রটি কতুল খাঁর প্রাসাদের একজন প্রহরীর, বুদ্ধিমান, ওস্মান খাঁর বিশেষ বিশ্বস্ত। সে ওস্মান খাঁর আদেশে তাঁর অঙ্গুরীয় চিহ্ন নিয়ে তিলোত্তমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিলোত্তমা কারাগৃহে জগৎসিংহের নিকটেই যান। তিলোত্তমা মোহাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তায় যখন গন্তব্যপথ সম্বন্ধে সংশয়ী, তখন এই প্রহরী নিজের বিপদের আশঙ্কায়ই হোক অথবা তিলোত্তমার জন্যই হোক দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে চালিত করেছে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়ও এর চরিত্রে আছে।

কতলু খাঁর অন্তঃপুর রক্ষার জন্য অন্যান্য নবাব-বাদশাহের প্রাসাদের মতোই খোজা প্রহরী নিযুক্ত। জগৎসিংহ কতলু খাঁর প্রাসাদ থেকে বিদায়গ্রহণের পূর্বে আয়েষার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট একজন খোজাকেই প্রেরণ করেছিলেন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখি "গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা ও ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত।"[২৩] এই চণ্ডালের স্বরূপ। এর কাছে যে বিষবড়ি তৈরীর উপকরণ হিসেবে, উদ্ভিজ্জ, খনিজ, সর্পবিষাদি নানাপ্রকার প্রাণসংহারক বিষ থাকে এ সংবাদ হীরার জানা ছিল বলেই হীরা শিয়ালের হাঁড়ি খাওয়ার গল্প বলে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এই চণ্ডালের কাছ থেকে বিষ কেনে। চণ্ডাল ধূর্ত, হীরার উদ্দেশ্য যে কারও প্রাণনাশ, তা বুঝতে তার দেরী হয় নি। একদিকে সামান্য বিবেকবুদ্ধি তদুপরি পুলিশের ভয়, অন্যদিকে অর্থলোভ চণ্ডাল এই দুই দ্বন্দ্বে প'রে, লোভের কাছেই হার স্বীকার করে, সে হীরার কাছে বিষ বিক্রয় করল, উভয়ত ব্যাপারটি গোপন রাখার সর্তে।

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর পাহারাদার ভোজপুরী দরওয়ান দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারী। পাকা বাঁশের লাঠি হাতে পেলে এরা মস্ত বীর। এদের একবার দেখা যায় হীরার নির্দেশমত দেবেন্দ্রনাথকে চোর ভেবে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে। চোরকে লাঠির নাগালের মধ্যে পেয়ে চিনতে পেরে তারা ছেড়ে

২৩। বিষবৃক্ষ : ১০ম পরিচ্ছেদ।

দিয়েছিল। বুদ্ধি এদের মোটা হ'লেও প্রভুবংশীয়ের প্রতি সম্মানবোধে এরা সচেতন।

আর একবার দেখা যায় গ্রামের ছেলের দল এদের কটাক্ষ ক'রে ছড়া কাটছে। দ্বারবানরাও 'অভিধান-ছাড়া শব্দে' তাদের আপ্যায়িত করতে তারা পলায়ন করল।

বৃদ্ধা মাতামহী হীরার একমাত্র আত্মীয়া, এরই সঙ্গে সে নিজের কুটীরে বসবাস করে। এই বৃদ্ধাকে নিয়ে লেখক একটি চমৎকার কৌতুকচিত্র রচনা করেছেন। হীরার মধ্যে পাগলামি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল দেখে হীরার আয়ি লাঠি ধরে নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় ওষুধ আনতে চলেছিল, পথে ছেলের দলের ছড়া কেটে পেছনে পেছনে চলা, প্রত্যুত্তরে কোপাবিষ্টা বৃদ্ধা কর্তৃক তাদের যমালয়ে প্রেরণ ও তাদের পিতৃপুরুষের অন্যায়রকম আহারাদির ব্যবস্থা বিশেষ উপভোগ্য।

পরে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের এবং হীরার বৃহৎ বংশাবলী কথনচেষ্টা, ডাক্তারের বিরক্তি, হীরার হিস্টিরিয়ার জন্য ক্যাষ্টর অয়েলের ব্যবস্থা—'ইস্টিরস কেষ্টরসে ভালো হয় কিনা,' এবংবিধ গবেষণা—সব মিলিয়ে স্বল্পবুদ্ধি গ্রাম্যবৃদ্ধার একটি চমৎকার চিত্র ফুটেছে।

অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারীর রোগ ও রোগের ওষুধ সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতার পরিচয় পাই হীরার আরেক প্রতিবেশিনীর হীরার রোগবিষয়ক সংলাপে।

"যুগলাঙ্গুরীয়ে'র কাহিনীতে পুরন্দরশ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের সমকালেই অমলার অবতারণা করা হয়েছে। রাত্রে যুবতী হিরণ্ময়ীর একা থাকা অনুচিত বলে হিরণ্ময়ী রাত্রে 'অমলার গৃহে শয়ন করিতেন।'

"অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল।—সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।"[২৪] সে মুরলা-যমুনা-মালতী-ফুলমণির মত দুশ্চরিত্রা নয়, হারাণী ও পাঁচকড়ির মার সঙ্গে তুলনীয়া। অমলা পুরন্দরের প্রত্যাগমনের সংবাদ হিরণ্ময়ীকে দিতে হিরণ্ময়ী চেষ্টাকৃত নিস্পৃহতা দেখিয়েছিলেন, নিজের মানোভাব তার কাছে প্রকাশ করেন নি। তথাপি হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরের মিলনে একটি বিশেষ ভূমিকা অমলার। রাজা মদনদেব যখন পরবর্তী অংশে

২৪। যুগলাঙ্গুরীয় : ৫ম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী ও পুরন্দরকে মিলিতে করবার দায়িত্ব নিয়ে ও উভয়ের পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যে রহস্যময় নাটকের অবতারণা করলেন সে নাটকের প্রাধান্য দূতীর ভূমিকা অমলার। সুতরাং অমলা প্রতিবেশিনী হিসেবে হিরণ্ময়ীর দাসী ও প্রায় সখী উভয় ভূমিকায় থাকলেও এই পর্যায়ে রাজা মদনদেবের প্ররোচনায় তার একটি চমৎকার লুকোচুরি চলতে লাগল। শেষে অবশ্য মদনদেবই রহস্যোদ্ভেদ করেছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপের ভৃত্য। কিন্তু মাত্র ভৃত্যরূপে তার পরিচয় পরিস্ফুট নয়। রামচরণ বীর, ধূর্ত, প্রতাপের যোগ্য অনুচর। 'ইণ্ডিল মিণ্ডিল' অর্থাৎ ইংরাজ সম্পর্কে তার মনোভাবের মধ্যে কিছু কৌতুক থাকলেও সেই সঙ্গে সত্যও আছে। ফষ্টরের বজরা থেকে শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারে তার সম্পর্ক কেবল প্রভু আর দাসেরই নয়, উভয়ের মধ্যে যেন সৌহার্দ্যেরও বন্ধনও রয়েছে। চরিত্রটি প্রাচীন বাংলাদেশের বীর্যবান বাঙালীর পরিচয়জ্ঞাপক। অপরপক্ষে সরসতায় ও বুদ্ধিমত্তায় রামচরণ অতিশয় আকর্ষণীয়।

ফষ্টর যখন শৈবলিনীকে তার গৃহে থেকে অপহরণ করে নিজের নৌকায় রাখে। তখন শৈবলিনীকে একদিনে বিবি বানান যাবে না এটি অনুধাবন করেই তার জন্য হিন্দুদাসী পার্বতীকে নিয়োগ করে। পার্বতী শৈবালিনীর জন্য নিয়োজিত প্রধানা দাসী। পার্বতী মুখরা প্রকৃতি, শৈবলিনীর দাসীত্বে নিয়োজিত হ'লেও তাকে কড়া কথা বলতে দ্বিধা করে নি, ফষ্টরের বজরায় প্রতাপ ডাকাতি করতে এলে, সুন্দরী 'নাপিতানি' বেশে শৈবলিনীকে আলতা পরাতে এলেও দেখা যায় পার্বতীর প্রবল প্রতাপ। প্রভুভক্তিতে সে অচলা। ফষ্টর কর্তৃক সে নিয়োজিত, সুতরাং ফষ্টরের ভালমন্দের সঙ্গেই সে নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করে। কালো ডাকাতের বজরা আক্রমণে স্বভাবতঃই সে ভয়কম্পিতা।

'রজনী' উপন্যাসে জনৈক নীচজাতীয় দুর্বৃত্তের চরিত্র পাই। অমরনাথের বর্ণনা —"একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতেছে।"

"দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।"

উপরের বর্ণনাই চরিত্রটির পরিচায়ক। হীরালাল কর্তৃক নির্জন নদীর চড়ায় পরিত্যক্তা এবং মনোভঙ্গে গঙ্গাবক্ষে স্বেচ্ছায় মজ্জমানা অচৈতন্যা রজনীকে যে নৌকাটি উদ্ধার করেছিল তারই অন্যতম যাত্রী। রজনীর রূপ-লাবণ্যে এই ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটে এবং তাকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে—বনমধ্যে নামিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে। অমরনাথের দৈবপ্রেরিত আবির্ভাবে রজনী রক্ষা পায়। দুর্বৃত্তের অস্ত্রাঘাতে অমরনাথ গুরুতর আহত হন।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সোনা ও রূপা গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের কুঠিতে দুই ভৃত্য। এরা রোহিণীর প্রতি বিন্দুমাত্র প্রসন্ন ছিল না। তাদের মতে "ও পাপ মলেই বাঁচি"[২৫] এবং "মুনিবঠাকুরুণ বড় হারামজাদা।।"[২৬] সুতরাং নিশাকর এই দুইজনকেই রোহিণীর সর্বনাশসিদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছেন রূপাকে বখশিস্ দিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ভালমানুষ সোনাকে অধিকবেতনের চাকরির লোভ দেখিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। সোনা রূপার সহায়তা ব্যতিরেকে নিশাকরের চক্রান্তে গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীর হত্যাব্যাপার সংঘটিত হত না। চরিত্রদুটির অন্য তাৎপর্যও আছে। যে রোহিণী কাহিনীর পূর্বভাগে তার বঞ্চিত জীবনের জন্য পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে, উত্তরপর্বে সেই রোহিণী যে কুৎসিত ও বিকৃত হয়ে উঠেছে, নিশাকরের কাছে সোনারূপার বিরূপ মন্তব্যে তা জানা যায়। অসন্তুষ্ট ও বিরূপ ভৃত্যের দুটি সুন্দর নিদর্শন।

হরিদাস বাবাজী হরিদ্রাগ্রামের ডিপুটি পোষ্টমাস্টারের একমাত্র পিয়ন—বেতন সাতটাকা। কিন্তু যেহেতু পোষ্টমাস্টার পনেরো টাকা বেতনধারী তিনি হরিদাসের সঙ্গে নিজের পার্থক্য আকাশপাতাল বলে বিবেচনা করেন এবং হরিদাস তাঁকে বিশেষ গণনীয় মনে করে না। মর্যাদার প্রশ্নে এই সরসতাটুকু পিয়ন, পোষ্টমাস্টারের চরিত্রদুটিকে উপভোগ্যতা দিয়েছে।

মাধবীনাথ গোপনে পোষ্টমাস্টারের সঙ্গে আলাপ করতে চান বলে হরিদাসকে তামাক সেজে আনতে বলেছিলেন। হুঁকোর সন্ধানে পিয়ন প্রায় অগস্ত্য যাত্রা করল। অতএব তার প্রাপ্য বক্‌শিসের টাকাটি ডাকবাবু নির্বিবাদে উদরস্থ করে নিলেন।

২৫। কৃষ্ণকান্তের উইল: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

২৬। কৃষ্ণকান্তের উইল: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল রায়ের সাধের বারুণীতীরস্থ উদ্যানের মালী। উড়িষ্যাদেশীয় এই ব্যক্তিটি সরল, বিশ্বস্ত, কর্মঠ এবং কিঞ্চিৎ ভীরুস্বভাববিশিষ্ট। প্রভুর আদেশে সে সব করতে পারে, কিন্তু সুন্দরী রোহিণীর অর্ধমৃত দেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য যখন তার সুন্দর ওষ্ঠাধরে ফুঁ দিতে গোবিন্দলাল আদেশ করলেন সে কল্পনায়ই মালী শিহরিত হয়ে উঠল। "সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কটকি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, 'মু সে পারিবি না অধবড়'।" অগত্যা সে মারাত্মক দায়িত্বটি পড়ল গোবিন্দলালের উপর। হাতদুটি ধরে নামানো ওঠানোর ভার নিল মালী। এই বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে মালীকে নিয়ে লেখকের রসিকতা উপভোগ্য।

হরিদ্রাগ্রাম পুলিশফাঁড়ির কনস্টেবল ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখিয়ে রোহিণীসংক্রান্ত সংবাদ আদায়ের জন্য, মাধবীনাথ ব্রহ্মানন্দের বাড়ীর নিকটস্থ বৃক্ষতলে বখ্‌শিসের লোভ দেখিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। নিদ্রাসিংহ তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়কই হয়েছে।

হরমণি ঠাকুরাণী কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ীর একজন পাচিকা। গোবিন্দলাল রোহিণী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে ভ্রমরের কাছে সদ্য মার খেয়ে ক্ষীরোদা ক্রুদ্ধভাবে বারুণীর ঘাটে স্নান করতে চলেছিল, এমন সময় হরমণির সঙ্গে সাক্ষাত ঘটল এবং এ বিষয়ে রসাল সংলাপ করে পরস্পরের গন্তব্যস্থানে গেল। এই সামান্য অংশটিতে এই জাতীয় নারীচরিত্রের দুর্বলতার ওপর লেখক চমৎকার আলোকপাত করেছেন। এই জাতীয় নারীচরিত্র স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রবিষয়ে কৌতূহলী, বিশেষতঃ যেখানে কিছু কোন্দল অথবা নিন্দনীয় কিছুর সন্ধান পায়। হরমণির চরিত্রেও ছবির মত সেই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে।

"হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, 'কি লো ক্ষীরোদা……?'"[২৭]

"আনন্দমঠ" উপন্যাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক ও কারুজীবীর দল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুঃসহ ক্ষুধায় নররাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর দস্যুতে পরিণত হয়েছে। আনন্দমঠের সুন্দর বনভূমিতে পলায়নরতা কল্যাণী ও পশ্চাতে দস্যুদের

২৭। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ২১তম পরিচ্ছেদ।

নরমাংসলোভী উল্লাসে মনুষ্যত্বের বীভৎস পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। বীভৎসতর চিত্র তারও আগে এই দস্যুর দল যখন ক্ষুধার তাড়নায় তাদের অনাহারশীর্ণ বৃদ্ধ দলপতিকে আঘাতে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার সংকল্প করল, তারপর কল্যাণীর শিশুকন্যার মাংস অধিক সুস্বাদু হ'বে বিবেচনা করে তাকেই আহারের বাসনায় সকন্যা কল্যানীর পশ্চাদ্ধাবন করল। এই দস্যুদের দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"শৃগাল-কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।" "এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" এদের তৎকালীন মূর্তি লেখক বর্ণনা করেছেন- "অতিশয় শুষ্ক শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত।"[২৮]

সন্তানদের জয়লাভের পর চতুর্দিকব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে কল্যাণী যখন একাকিনী পতিসন্দর্শনের জন্য পদচিহ্ন অভিমুখে যাত্রিণী, তখন এক সিপাহীই শঙ্কা এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাঁকে বলেছিল—"আজকা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"[২৯] কারণ এই পথে দস্যুভয়, কল্যাণী রূপবতী। কল্যাণীর রূপ সম্পর্কে লোকটি একটু রসিকতা করেছিল, কিঞ্চিৎ সঙ্গীত-চর্চার বাসনাও তার ছিল, কিন্তু কল্যাণী তাতে কর্ণপাত না করায় লোকটি মনঃক্ষুন্ন হল।

মঠের পরিচারক গোবর্দ্ধন—'সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান'। মঠের বড় বড় সন্ন্যাসীদের ঘরের ব্যবস্থাও তদারক করা তার দায়িত্ব। গোবর্দ্ধন নিজের কর্তব্যে দৃঢ়, সন্ন্যাসীনেতাদের কার কি ক্ষমতা ও যোগ্যতা সে সম্বন্ধে সে বিজ্ঞ। শান্তি যখন নবীনানন্দবেশে সন্তানদলে প্রবেশ ক'রে, মঠের ঘর নির্বাচন করছিল তখন গোবর্দ্ধনই প্রদীপ হাতে তাকে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী ঠাকুর যখন প্রফুল্লকে রাণীগিরির শিক্ষায় ব্রতী করলেন তখন তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ক'রে দেবার জন্য এই তিয়াত্তর বৎসর বয়স্কা গোবরার মা বৃদ্ধাকে পাঠালেন। বৃদ্ধা সম্পূর্ণ কালা না হ'লেও কানে বেশ কম শোনে। তার ফলে বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। প্রফুল্লর সঙ্গে গোবরার মার প্রথম পরিচয়পর্বে তার যে চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তা কৌতুকোদ্দীপক। গোবরার

২৮। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

২৯। আনন্দমঠ: ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

মায় কর্মদক্ষতার ফিরিস্তিটিও বেশ উপভোগ্য। চরিত্রটি ও সংলাপ লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির নৈপুণ্যকে প্রকাশ করে।

জমিদার গোমস্তা দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুগ্রহধন্যা ফুলমণি নাপিতানী দুশ্চরিত্রা, প্রফুল্লকে হরণের ব্যাপারে দুর্লভের প্রধানা সহায়িকা। গ্রাম্য কুট্টনী চরিত্র, মিথ্যাভাষিতা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচনায় পটীয়সী। ফুলমণি নিঃসহায়া প্রফুল্লর রক্ষাকারিণী সেজে রাত্রে তার নিকট শয়ন করত।

অলকমনি ফুলমণি নাপিতানীর অগ্রজা। প্রফুল্লর তিরোধান সম্পর্কে ফুলমণি যে 'আষাঢ়ে গল্প' রচনা করেছে, সেটির উপসংহারে বলেছে "এসকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস না—দেখিস্ আমার মাথা খাস।"[৩০]

দিদি বলিলেন, "না গো! একথা কি বলা যায়"[৩১]—বলেই অলকমনি চাল ধোয়ার ছলে ধুনুচি হাতে পাড়ায় বেরুলো এবং সর্বত্র সবিস্তারে ও প্রচুর কল্পনাযোগে প্রচার করতে লাগল। একটি অতি স্বাভাবিক ও সরস চরিত্র।

রামসিংহ ব্রজেশ্বরের বজরার অন্যতম দরওয়ান। এই দেবীরাণীর বরকন্দাজের দল ব্রজেশ্বরের বজরায় উঠে দরওয়ানদের নির্বিঘ্নে বেঁধে রেখেছিল। এতক্ষণ এরা ভয়ে শুদ্ধ হয়ে ছিল, এখন ব্রজেশ্বরের ডাক শুনে "ডাকাইতের ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্বরে নালিশ জানালে" ব্রজেশ্বর তাদের বিদ্রূপ করে উত্তর দিলেন তাদের বীরত্বে তিনি মুগ্ধ। অচিরাৎ ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িয়ে দেবেন।

অত্যন্ত ভীরু কাপুরুষ ব্রজেশ্বরের মাঝিমাল্লারা। দেবী চৌধুরাণীর বরকন্দাজ যখন ব্রজেশ্বরের বজরা অধিকার করল তখন নৌকার মাঝিমাল্লার দল বাধাপ্রদানের চেষ্টামাত্র না করে অথবা বজরা নিয়ে দ্রুত সরে না গিয়ে ভয়ে সকলে জলে পড়ে কাছি ধরে আত্মরক্ষা করতে লাগল। ব্রজেশ্বর কৌতূহলবশতঃ রঙ্গরাজের কাছে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব স্বীকার করবার পর এদের কটাক্ষ ক'রে বললেন—"এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইজ্জত সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁশিয়ার!"[৩২]

বিশ্বাসহন্তা হরবল্লভ রায় লেফটেন্যাণ্ট সাহেবকে দেবীর বজরা দেখিয়ে

৩০। দেবী চৌধুরাণী : ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।
৩১। দেবী চৌধুরাণী : ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।
৩২। দেবী চৌধুরাণী : ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য পৃথক ডিঙ্গিতে পলায়ন করে। সেই ডিঙ্গির মাঝি সিপাহীদের ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হলেও স্বকার্যে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী ; ঝড়ের মুখেও ডিঙ্গি নিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছুতে সে জানে।

মিশ্রঠাকুর রাজা সীতারাম রায়ের প্রাসাদস্থ একজন দরওয়ান। কোনো ধনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তাঁর দরওয়ান, ভৃত্য ভাণ্ডারী প্রভৃতিকে কিভাবে তোষামোদ করে প্রভুর কাছে সংবাদ পৌছে দিতে হয়, মিশ্রঠাকুর ভাণ্ডারী প্রভৃতির ব্যবহার তারই দৃষ্টান্ত। মিশ্রঠাকুরের মেজাজ ভালো, তবে অলসপ্রকৃতির। ভাণ্ডারীর তরকারীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে কিছু ভাগের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত পাঁচকড়ির মাকে ভাণ্ডারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিল না।

জীবন ভাণ্ডারী সীতারাম রায়ের প্রাসাদের ভাণ্ডারী। তার সাহায্য ছাড়া সীতারামের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। সুতরাং এই ক্ষমতাগর্বে, এই ক্ষমতায় সেও একটি ক্ষুদ্র নবাব। তার লোভের রসদ না জুগিয়ে কারও পক্ষে প্রভুর নিকট পৌছোন সম্ভব নয়। এইজন্যই পাঁচকড়ির মা শ্রীর সঙ্গে সীতারামের সাক্ষাৎ সংঘটনের জন্য ভাণ্ডারীকে বাড়ীর তরকারী উৎকোচস্বরূপ দেবার প্রস্তাব করল। অত্যন্ত রুক্ষস্বভাব এবং বয়স্ক ভাণ্ডারী অত সহজে ভুলল না। অবশেষে যখন তাকে পাঁচকড়ির মা শ্রীর ভিক্ষালব্ধ বস্তুর অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হল তখন জীবনভাণ্ডারীর কণ্ঠে মধু ঝরল এবং পাঁচকড়ির মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

পাঁড়ে ঠাকুর সীতারামের অন্তঃপুরের পাহারাদার দরওয়ান। ছোটরাণী রমার দাসী মুরলা সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। তাছাড়া মুখরা মুরলার রসনা এবং খ্যাংড়ার ঘা দুইয়েরই ভীতি তার আছে। এইজন্যই মুরলা যখন গঙ্গারামকে নিজের ভাই পরিচয় দিয়ে অন্তঃপুরে রমার কাছে নিয়ে যেতে চাইল, তখন পাঁড়ে ঠাকুর বাধা দিলেও মুরলার গর্জনে তাঁর আপত্তি ভেসে গেল। পরে স্বাভাবিক অর্থলোভবশতঃ এই দরওয়ান গঙ্গারামের কাছ থেকে কিছু অর্থলোভের চেষ্টাও করেছিল মুরলার পরামর্শে যদিও সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। পরে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার বিচারের সময়ে পাঁড়ে ঠাকুর সত্য প্রকাশ করে বলে—"তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনতেন ; তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।"[৩৩]

৩৩। সীতারাম: ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

নগরকোতোয়াল গঙ্গারাম ফৌজদার তোরাব খাঁর সঙ্গে চক্রান্ত করে সীতারামের রাজ্যনাশ ও রমাকে লাভের আশায় অনেক আয়োজন করেছিল। সকলের অজ্ঞাতে সীতারাম এসে জয়ন্তীর সহায়তায় গোলাবারুদ ও কামান পেয়ে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে শত্রুনাশ ও রাজ্যরক্ষা করেন। বিস্মিত গঙ্গারাম এই রহস্যজনক ব্যাপার দেখে সংবাদ জানবার জন্য এক জমাদ্দারকে নদীর ঘাটে পাঠিয়ে দেন। গঙ্গারামের কাছে তার নির্বোধ বর্ণনা এ প্রসঙ্গে উভয়ের সংলাপটিকে সরস করেছে। সে দূর থেকে তোপদাগা দেখেছে, কোন মানুষ দেখে নি। বর্ণনাও তদনুরূপ, রহস্য তাতে উদ্ঘাটিত হয় নি, মাত্র জমাদ্দারের নির্বুদ্ধিতাই কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে।

রাজা সীতারাম রায়ের আদেশে এক চণ্ডাল সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে বিবস্ত্র করে রাজসভামধ্যে বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে মঞ্চে উঠেছিল। কিন্তু চণ্ডালের ধর্মবোধ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, সেইসঙ্গে রাজভীতিও ছিল। সেইজন্য মঞ্চে উঠেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জয়ন্তীকে অমর্যাদা করতে পারছিল না। অবশেষে রাজভীতি অপেক্ষা ধর্মভীতিরই জয় হল। সন্ন্যাসিনীর নানাবিধ উৎসাহপ্রদান, রাজরোষে শূলে যাওয়ার ভীতি কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারল না। রাজার আদেশে সে মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত তথাপি এ কাজ করতে পারলো না রাজাকে একথা জানিয়ে সে মঞ্চ থেকে পলায়ন করল।

এক মুসলমান কসাই সীতারামের রাজ্য মহম্মদপুরে গোবধ করতে পারত না। নগরপ্রান্তে বকরি মেড়া কেটে বিক্রয় করত। অত্যন্ত বলবান্, কদাকার ও হৃদয়হীন এই ব্যক্তিকে রাজাজ্ঞায় তার অনুচরেরা জয়ন্তীকে অবমাননা ও বেত্রাঘাত করবার জন্য নিয়ে এল। পশুপ্রকৃতির এই ব্যক্তি মঞ্চে উঠেই আপনকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত হল। লজ্জা ও অপমানে জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী হয়েও যখন বিচলিত তখনও কসাই বর্বরের মত তার বস্ত্র আকর্ষণ করে চলেছে। মহারাণী নন্দার উপস্থিতি সত্ত্বেও সে তার কার্যে বিরত হয় নি। অবশেষে ক্ষিপ্ত দর্শকগণ কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়ে প্রাণমাত্র যখন অবশিষ্ট তখন সে নিষ্কৃতি পায়।

সরকারী বেড়ি হাতকড়ি এক কামারের জিম্মায় থাকত। কাজীর বিচারে এবং ফকির শাহ্ সাহেবের খেয়ালে যখন গঙ্গারামকে জীয়ন্ত পুঁতে ফেলবার আদেশ হল তখন সীতারাম পাছে নিজের প্রাণ দিয়ে গঙ্গারামকে রক্ষা করে

এই ভয়ে মাথায় হাতকড়ি মেরে গঙ্গারাম নিজের প্রাণনাশ করতে চাইল। কামারকে চন্দ্রচূড় আগেই টাকা খাইয়েছিলেন, সে কৌশলে গঙ্গারামের হাতের বেড়ি খুলে নিল। সে সুযোগ গঙ্গারামের পলায়নের বিশেষ সহায়ক হল।

"সীতারামে" শ্রীর প্রসঙ্গে আছে "পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল। সে শ্রীর মার অনেক কাজকর্ম করিয়া দিত।"৩৪

শ্রী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাতা গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য স্বামী সীতারামের সঙ্গে দেখা করতে উদ্‌যোগী হয়ে এই পাঁচকড়ির মাকে সঙ্গে নিয়েছিল। পাঁচকড়ির মা পাঁড়েঠাকুর শ্রীবিষ্ণু মিশ্রঠাকুরের সাহায্যে জীবন ভাণ্ডারীকে তুষ্ট করে তার মারফত শ্রীকে সীতারামের কাছে পৌঁছে দিল। এক্ষেত্রে পাঁচকড়ির মা সখী এবং পরিচারিকার যৌথ কর্তব্য পালন করেছে। পরিচয়হীনা দরিদ্রা শ্রীর পক্ষে সহায়তার প্রত্যাশায় জমিদার সীতারামের সাক্ষাৎলাভ সহজ ছিল না—পাঁচকড়ির মার আনুকূল্যেই এটি সম্ভব হতে পেরেছে।

মুরলা 'রাজবাটীর পরিচারিকা' ছোটরাণী রমার খাস ঝি। সে শুধু চতুরা প্রগল্‌ভা, সাহসিকা নয়, রাজান্তঃপুরের খিড়কির প্রহরী পাঁড়ে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ (২য় খণ্ড, ৪র্থ ও ৭ম পরিচ্ছেদ) গঙ্গারামের প্রতি তার বিদ্রূপ ('আবার আসিবে বোধ হইতেছে' ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), দরওয়ানকে দিয়ে গঙ্গারামের নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টা (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ) এবং গ্রন্থকার তার মনোভাব সম্বন্ধে যে স্বল্প ইঙ্গিত করেছেন তার থেকে অনুমান করা যায় সে দুশ্চরিত্রা, 'বিষবৃক্ষে'র মালতীগোয়ালিনী, 'দেবী চৌধুরাণী'র ফুলমণি নাপিতানী ও ভারতচন্দ্রের মালিনীর শ্রেণীর লোক। 'ইন্দিরা'র হারাণীর চরিত্রে সে দৃঢ় নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মুরলার চরিত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব। এই শ্রেণীর লোকই গুপ্ত প্রণয়ের 'দূতী' হয়, তবে তাকে যে দূতীর কাজ করতে হয় নি, সে তার গুণে নয়, রমার গুণে। 'রমার মন বড় পরিষ্কার পবিত্র' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ) এবং তার উদ্দেশ্য গুপ্তপ্রণয় নয়। মুরলা অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাকে গুপ্তপ্রণয় বলে বুঝতেই প্রস্তুত ছিল। "যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া

৩৪। দেবী চৌধুরাণী: ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

কাজ করে।"[৩৫] রমার বিচারকালে সে নন্দার উপদেশে নিজ দোষের কতকটা ক্ষালন করেছিল (৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) তারপর ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত, যখন 'কালামুখী'কে 'মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া, দেওয়া হইল, তখন তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইল।"[৩৬]

মুরলা রমার 'বিশ্বাস বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী' বটে ; আবার দৌত্যপারঙ্গমাও বটে ; গুপ্তপ্রণয়ের সহায়িকা নিজেকে ভেবেই তার উৎসাহ, রমার জন্য সমবেদনা ও প্রীতিতে সে কিছু করেছে বলে মনে হয় না।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে রামরামদত্তের গৃহের পাচিকা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী সোনার মা এই সুন্দর পারিবারিক কাহিনীটিতে প্রভূত কৌতুকরস বিতরণ করেছে। পক্ককেশী স্বল্পবুদ্ধি এই বৃদ্ধা রন্ধনশালায় নতুন পাচিকা ইন্দিরার আবির্ভাবে স্বভাবতঃই ঈর্ষাকাতরা ; ফলে সমগ্র উপন্যাসে সে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্-এর একটি অপূর্ব উপকরণে পরিণত হয়েছে এবং তার দুর্গতিসাধনের চক্রান্তে ইন্দিরা সুভাষিণীর সঙ্গে রমণবাবু পর্যন্ত পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন। গৃহিণীর চুলে কলপ ব্যবহার দেখে তারও কৃষ্ণকেশী হবার যে দুরাকাঙ্ক্ষা জেগেছিল (এবং যৌবনবতী হয়ে পুনর্বিবাহের একটি বাসনা তার ছিল), তার পরিণামে মহিলা 'বানরমার্জার-বিমিশ্রকান্তি' লাভ করে দুর্গতির চরমে পৌছল। পরিশেষে সুভাষিণীর তিন বৎসরের পুত্র তার পিঠে চেলাকাঠের ঘা বসিয়ে এবং 'আমাল্ চাচুলি' এই বাণীটি ঘোষণা করার পর যবনিকাপতন ঘটল। চরিত্রটিকে নিয়ে বঙ্কিমের কৌতুকপ্রিয়তা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত পাচিকাঠাকুরাণীর জন্য একটুখানি সমবেদনাও যেন অনুভব করা যায়।

বড়লোক রামরামদত্তের বাড়ীর রান্নাঘরের কাজের ঝি কুমুদিনী রান্নার বামুনঠাক্‌রুণকে রমণবাবু খেতে বসে কৌশলে একটু জব্দ করাতে সে ঝির কাছে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল। রান্নাঘরের কর্ত্রীর ওপর ঝির এই দরদটুকু স্বাভাবিক, যেন একটু স্বার্থগন্ধী।

ইন্দিরাকে দীর্ঘকাল পরে স্বামীগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য চারজন ভোজপুরী দরওয়ান, বাহকসমেত পাল্কী নিয়ে এসেছিল। উভয় গ্রামে যাতায়াতের পথে

৩৫। সীতারাম : ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৩৬। সীতারাম : ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

পড়ে কালাদীঘি। যাত্রার সময় সেই ডাকাতে দীঘির পাশ থেকে যখন ইন্দিরার পাল্কী দস্যু কর্তৃক অপহৃত হল এই দরওয়ানদল সঙ্গে থাকলেও রক্ষা করতে পারল না, সেই দুর্ধর্ষ দস্যুদলের বিরুদ্ধে কিছু করাও সম্ভব ছিল না হয়ত। তথাপি একজন ভোজপুরী অগ্রসর হয়ে এসে পাল্কীশুদ্ধ ইন্দিরাকে রক্ষা করবার দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাল্কী ধরতেই লাঠির আঘাতে অচেতন হয়ে তাকে মাটিতে পড়তে হল। সম্ভবতঃ তাতেই তার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

ইন্দিরার শ্বশুরালয় থেকে কয়েকজন পাল্কীবাহক ইন্দিরাকে আনতে গিয়েছিল। স্বামীগৃহে যাওয়ার পথে এই বাহকগণই দরওয়ানের নিষেধ না শুনে ডাকাতে কালাদীঘির পাশেই পাল্কী নামিয়ে রেখে একটু দূরে গিয়ে আহার বিশ্রামাদির উদ্যোগ করে। এই নির্বুদ্ধিতার ফলেই দস্যুহস্তে ইন্দিরার চরমদুর্গতি সংঘটিত হয়।

কালাদীঘির এক প্রাচীন ডাকাত, দস্যুবৃত্তিশীল হলেও ধর্মভীরু; কিঞ্চিৎ হৃদয়বত্তা, প্রবল প্রতাপ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দলের সর্দার। জনৈক যুবক দস্যু যখন লুণ্ঠনসামগ্রীরূপে ইন্দিরাকেও আত্মসাৎ করার অভিলাষী হয়, তখন এই সর্দার তাঁকে খুন করার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করে।

প্রাচীন বাংলাদেশে সাধারণতঃ হিন্দু দস্যুরা মেয়েদের অসম্মান করত না। কালী তাদের উপাস্যা—দস্যুবৃত্তির মধ্যেও তাদের একটা ধর্মবোধ থাকত: 'ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?' তাছাড়া এর সঙ্গে ধরা পড়বার স্বাভাবিক আশঙ্কা ত ছিলই।

ইন্দিরার প্রতি দস্যুবৃত্তিকারী কালাদীঘির ডাকাতদলের একজন যুবক দস্যু, ইন্দিরার প্রতি লুব্ধ। এই দস্যু ইন্দ্রিয়পরায়ণ। দস্যুদলের সর্দারকে ভয় ও সম্ভ্রমের চোখে দেখত বলে সর্দারের লাঠির শাসানিতে শেষপর্যন্ত পাপবুদ্ধি থেকে নিরস্ত হয়।

দস্যুপীড়িতা ইন্দিরাকে নির্জন বৃক্ষতলে সহায়হীনা অবস্থায় নিদ্রিতা দেখে জনৈক ইতর যুবা হাত ধরে টানছিল। হাতের কাছে পাওয়া একটা কাঠ দিয়ে ইন্দিরা তার মাথায় মারাতে সে পলায়ন করে। চরিত্রটির সঙ্গে রজনীকে আক্রমণকারী ব্যক্তিটির সাদৃশ্য আছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে বনাসী যোধপুরী বেগমের বিশ্বাসী খোজা। বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী বলেই অওরংজেবের বেগমমহল থেকে এর সাহায্যই যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীকে প্রয়োজন হলে উদয়পুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। খোজা দুঃসাহসী হলেও রংমহালের কাছে অওরংজেবকে দেখে বুদ্ধিমানের মত নির্মলকে পলায়ন করতে বলে নিজেও চম্পট দিয়েছে।

জেব-উন্নিসার গৃহদ্বারে তাতারী প্রহরিণী বুদ্ধিমতী, সর্বরসেরই রসিকা। অর্থের লোভ আছে, তবে অর্থের চেয়ে সরাব ও সংগীতেই তার অনুরাগ অধিক। অধিকরাত্রিতে দরিয়া যখন জেব-উন্নিসার নিকট সংবাদ বিক্রয় করতে যায় তখন তাতারী প্রতিহারিণীর সমস্ত আপত্তি এক শিশি সরাব লাভ করেই ভেসে গেল। দরিয়ার প্রত্যাবর্তন পথে তার কাঁধে তরবারি রেখে সে লাভের অংশ চেয়েছিল, কিন্তু দরিয়ার গানে সব ভুলে গিয়ে খুশী হয়ে উঠল।

যোধপুরী বেগমের আদেশে এই তাতারী যুবতী জেব-উন্নিসার মত্তাবস্থায় কৌশলে তার পরওয়ানা এনে দিয়েছিল নির্মলকুমারীর পলায়নের জন্য।

বণিকের ছদ্মবেশী কিছু মানুষ উদয়পুরের অভিমুখে চলেছিল, দস্যুতাই এদের বৃত্তি। পথিকদের ছলনায় ভুলিয়ে, কোন নিভৃত পার্বত্য-প্রদেশে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করাই এদের বৃত্তি। বিক্রম সোলাঙ্কির গুরুদেব যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র নিয়ে উদয়পুরের রাণার কাছে যাচ্ছিলেন তখন এই বণিকবেশী দস্যুর হস্তে সর্বস্বান্ত হয়ে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন।

ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের রক্ষক বখ্‌শী। মোগলদরবারে রাজদণ্ডে দণ্ডিত যাদের বিষধর সর্পের দংশনাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাদের সর্পদংশন করানর দায়িত্ব তার। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মবারকের জন্যও দুইটি বিষধর সর্পের লৌহপিঞ্জর তাকেই সাজাতে হয়েছে। সম্রাটের নির্দেশে বখশীকে অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবেই একাজ করতে হয়েছে। যদিও এ তার দৈনিক কৃত্য, তথাপি সহৃদয়বৃত্তি, সমবেদনাবোধ তার নষ্ট হয় নি। বিশেষতঃ মবারকের জন্য তার বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। সেইজন্য মৃত্যুকালে মবারককে প্রশ্ন করেছিল—কেন এ আদেশ। জেব-উন্নিসার ইচ্ছায়ই যে এ মৃত্যু, সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করতে করতে মবারকের এই উত্তর শুনে বখ্‌শী বেদনায় ও শঙ্কায় শিহরিত হল।

মাণিকলাল রাজা রাজসিংহের কাছে একটি অশ্ব এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করলে, অবস্থাচক্রে রাণা দিতে অপারগ হন। অতঃপর মাণিকলাল সেগুলো "ঠকাইয়া লইবার" জন্য রাণার অনুমতি প্রার্থনা করে—রাণা সকৌতুকে সম্মতি দেন।

ধূর্ত মাণিকলাল প্রথমে রূপনগর বাজারের রসিকা পানওয়ালীর সঙ্গে পরিকল্পনা রচনা করে নেয় এবং কাল্পনিক মহম্মদ খাঁর নামে একটি জালপাত্রের বাগুড়া বিস্তারে নূর মহম্মদ খাঁকে শিকার ধরে। তারপর তাকে একটি পরিত্যক্ত গৃহে তক্তপোশের তলায় "মূষিক-দংশনের" আনন্দলাভের সুযোগ দিয়ে তার বেশবাস, হাতিয়ার এবং অশ্ব নিয়ে পলায়ন করে।

অনুরূপ প্রণয়-কৌতুককাহিনী প্রাচীনসাহিত্যেও লভ্য। কিন্তু এই চরিত্রটি রচনা করার অন্যতর তাৎপর্য আছে। মহাবীর বাবরের বিজয়াভিযানে যে দুর্ধর্ষ মোগল-বাহিনী শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, কালক্রমে—সম্ভবতঃ ভারতের নমনীয় মৃত্তিকার প্রভাবেই তারা বিলাসী, শ্রমবিমুখ ও ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে উঠতে থাকে। এমন কি 'গ্রাণ্ড মোগল'—জগৎত্রাস আলমগীরের সৈন্যবাহিনীতেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নূর মহম্মদ খাঁ এই অধঃপতিত মোগল শৌর্যেরই প্রতিনিধি। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে কেন অওরংজেবের জীবিত-কালেই মোগল-সৌভাগ্য অস্তমিত হতে আরম্ভ করেছিল। কেন তৈমুর নির্বাধায় দিল্লীজয় করেছিলেন, কেন আব্দালীর সৈন্যদলের সম্মুখে মোগলমহিমা তাসের প্রাসাদের মতো উড়ে গিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র নূর মহম্মদ খাঁর সাহায্যে কিঞ্চিৎ স্থূল হাস্যরসের পরিবেশন করেছেন বটে, কিন্তু এই চরিত্র যেন একটি নির্ণায়ক সংকেত—"দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো" বাদের মৃত্যুছিদ্রের দিকে ইতিহাসসচেতন শিল্পীর অঙ্গুলিনির্দেশ।

রূপনগর বাজারের রসিকা পানওয়ালী—নূর মহম্মদ খাঁকে চূড়ান্ত নির্বোধ বানিয়ে তার অশ্ব, পোশাক এবং হাতিয়ার অপহরণের সকল চক্রান্তে চতুর-শিরোমণি মাণিকলালের প্রধানা সহায়িকা। এই কার্যের জন্য মাণিকলাল তাকে অর্থ দিতে চেয়েছিল—সে প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে: "রঙ্গই আমার পুরস্কার।" নূর মহম্মদকে নিয়ে "প্রাকটিক্যাল জোক" রচনা করবার কাজে সে যথোচিত অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। অতি সরস এবং স্বাভাবিক চরিত্র।

রূপনগর রাজপ্রাসাদে 'তস্বীর' বিক্রয় করতে গিয়ে জনৈকা সরলা

চিত্রবিক্রয়ীত্রীই নিজের অজ্ঞাতে এই ঐতিহাসিক মহানাট্যের অঙ্কুরটি রোপণ করেছে। চঞ্চলকুমারীর পাদপীড়নে শাহানশা আলমগীরের প্রতিকৃতি চূর্ণ হওয়া হয়তো নিতান্তই বালিকাসুলভ বিভ্রান্তি, কিন্তু আশরফিলাভ করেও বুড়ী ওই ঘটনাটিকে গোপন রাখতে পারে নি। স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাতা পুত্রের কাছে কথাটি লুকিয়ে রাখতে পারছে না—অথচ বলতেও পারছে না—এই দোটানায় তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এবং শেষপর্যন্ত নির্মলকুমারীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তার পক্ষে আর রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর তার সেই মূঢ়তার স্ফুলিঙ্গটুকু এক মহাপ্রলয়ের কালাগ্নি জ্বেলে দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির আলোয় এই দুর্বলহৃদয়া বৃদ্ধার সরস চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

পুনঃপ্রণীত 'রাজসিংহে' যোধপুরী বেগমের প্রসঙ্গে আছে— "দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে বড় বিশ্বাসী।"[৩]

দেবীর বিশ্বস্ততা সত্যই অসাধারণ। নতুবা যোধপুরী বেগম ভারতত্রাস অওরংজেবের অন্তঃপুরে বসে তারই বিরুদ্ধে সংবাদ দেবীর সাহায্যে রূপনগরীর কাছে পাঠাতে সাহস করতেন না। লাভের আশা অবশ্য দেবীর ছিল। বহুদিনের ঈপ্সিত মুক্তি ও বখশিস দিয়ে যোধপুরী তাকে চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠান স্বীয় পাঞ্জাসহ বক্তব্য—তিনি যেন কিছুতেই দিল্লী না আসেন এবং রাজসিংহের শরণ নেন। মতিওয়ালির ছদ্মবেশে কৌশলে রূপনগরের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে দেবী কার্যসিদ্ধি করেন। দেবীর বৈশিষ্ট্য আছে নিঃসন্দেহে, বিশ্বস্ততায়, সততায় এবং বুদ্ধিমত্তায় সে অসাধারণ। দীর্ঘকাল মোগলের বেগমমহলে বাঁদীর কাজ করলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ তার অক্ষুণ্ণই আছে, এছাড়া সে যোধপুরী বেগমেরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

৩৭। রাজসিংহ: ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিশু—সারল্য আর শুচিতা

শিশু মানুষের চিরকালের আনন্দের উৎস। সে শুধু "মানবের জনকই নয়"—সে স্বর্গের দূত। পৃথিবীর ধূলিমালিন্যের স্পর্শ তাকে কখনও অশুচি করে না। দেবলোকের পবিত্রতা যেন তাকে ঘিরে থাকে, তাই Wordsworth বলেন, "Heaven lies around us in our infancy."[১]

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনি—

"ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ—
ইহাদের করো আশীর্বাদ॥"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নিগ্ধ মধুর জীবনদৃষ্টিতে এই সদ্য দেবলোক সমাগত শিশুর নানা উপলব্ধি আলোকরশ্মির মত আবির্ভূত হয়েছে। সাধারণভাবে দেড়বৎসর থেকে আটদশ বৎসর পর্যন্ত এদের বয়ঃসীমা। কারও মুখে অস্ফুট কাকলী, কারও ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, কারও কণ্ঠে মধুঝরা গান, কেউ বা উলঙ্গ অবস্থায় পথে বিচরণশীল এবং লাড্ডুভোজনে উৎসুক। দাম্পত্যজীবনের তমসাচ্ছন্ন মহা সংকটলগ্নে দুঃখ ও হতাশার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অথবা ইতিহাসের বজ্রস্তনিত মেঘাড়ম্বরে, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের শিশুরা অন্তত: ক্ষণিকের জন্য স্নিগ্ধতা, কৌতুক ও বাৎসল্যরসের মাধুর্য বিস্তার করে গিয়েছে। জীবনশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী হৃদয়বত্তার আর এক প্রকার তাঁর সৃষ্ট শিশুচরিত্রগুলির মধ্যে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিদ্যাভ্যাসরত ও সন্দেশভোজনরত দুটি বালকের চিত্র পাই। নগেন্দ্রদত্তের অন্তঃপুরে যখন হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব তখন কুন্দনন্দিনী একটি বালককে তার মাতার অনুরোধে বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত ছিল কিন্তু বালকের মন যতটা পাঠে তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট ছিল সন্দেশ ভোজনরত অপর একটি বালকের দিকে। হরিদাসী বৈষ্ণবীর আগমনে যখন

১। Wordsworth "Immortality ode."

২। শিশু—'আশীর্বাদ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্দরমহল আলোড়িত হয়ে উঠল তখন কুন্দও সেইদিকে গেল এবং ইত্যবসরে তার ছাত্রটি অপর বালকের "সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।"[৩]

উক্ত আসরে যখন অন্তঃপুরবাসিনীরা হরিদাসী বৈষ্ণবীকে পছন্দমত গান গাইতে বলছিল সেই সময় একজন লজ্জাহীনা যুবতী তাকে নিধুবাবুর টপ্পা গাইতে বলে। তখন এক "অস্ফুটবাচা বালিকা" বৈষ্ণবীকে জ্ঞানদানের অভিলাষে গেয়ে শোনাল :

"তোলা দাস নে দাস নে দূতী"[৪]

—অর্থাৎ, "তোরা যাস্ নে যাস্ নে দূতী।"

নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতার পাশে শ্রীশচন্দ্র কমলমণির সার্থক দাম্পত্যজীবনের চিত্রকে পূর্ণতর ও মধুরতর করেছে তাদের একমাত্র শিশুসন্তান সতীশচন্দ্র। কারণে অকারণে তার কৌতুকোচ্ছল হাসির লহর মাতাপিতার নিকট নিজের প্রাপ্য ইজারা শতচুম্বনের ভাগ আদায়ের নিপুণ কৌশল নতুন শেখা আধ আধ কথা অর্ধপ্রস্ফুটিত অনুভূতির প্রকাশ সর্বোপরি কমলমণির স্বামীবিরহিত দ্বিপ্রহরের অভিমান, আলাপ, প্রলাপের একটি পরম দরদী সঙ্গীর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র একটি উজ্জ্বল শিশুচরিত্র।

বিষবৃক্ষের সমস্ত দ্বন্দ্ব জটিলতা, বেদনার তীব্রতার মধ্যে মধ্যে সতীশের হাসির লহর একটি অনাবিল আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই ক্ষুদ্র শিশু শুধু সুখী দাম্পত্যজীবনে স্বর্গসুখের স্বাদ আনে না, হাস্যময়ী জননীর বেদনার মুহূর্তগুলোকেও শিশুসুলভ অনুভূতি নিয়ে সমবেদনায় সান্ত্বনায় ভরিয়ে দিতে চায়। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কমলমণি যখন ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দনরতা, তখন দাসী বুদ্ধি করে সতীশকে কাছে রেখে যায়। সতীশ ছোট ছোট দুটি হাতে মায়ের মুখ তুলে আদর ক'রে তার বেদনার কারণ বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু কমলমণিকে শান্ত করতে না পেরে এক অজানিত কষ্টে মায়ের কোলে শুয়ে সতীশও কাঁদতে লাগল। ছেলের কান্নার ভয়েই কমলমণি পরে সূর্য্যমুখীর জন্য শোক কিছুটা সংবরণ করেছিলেন।

রজনীর প্রতিবেশী কালিচরণ বসুর চার বৎসরের শিশুপুত্র বামাচরণ 'মনুমেণ্টমহিষী' রজনীর সতের বৎসর বয়সের দ্বিতীয়পক্ষের বর। বামাচরণ রজনীর

৩। বিষবৃক্ষ—৯ম পরিচ্ছেদ।

৪। বিষবৃক্ষ : ৯ম পরিচ্ছেদ।

কাছে সর্বদাই আসত ও নানাপ্রাকার প্রশ্ন করত। বামাচরণের রজনীর বরপদে অধিষ্ঠিত হবার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। একদিন বাজনা বাজিয়ে একটি বরের দলকে যেতে দেখে বামাচরণ বায়না ধরল—"আমি বল হব।" রজনী কান্না থামাতে না পেরে তারহাতে সন্দেশ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল "তুই আমার বর।"[৫] সন্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রোদন সম্বরণ করে সে রজনীর বর হতে রাজী হল। বামাচরণ কর্তব্যপরায়ণ, সন্দেশভোজন সমাপ্ত হলে বরের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল "হাঁ গা, বলে কি কলে গা?" এ বিষয়ে রজনীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত "বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটি আরম্ভ করিতে প্রস্তুত।"[৬] রজনী তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বলল "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা বদলে নিতে তার বেশীক্ষণ লাগল না। নিতান্ত সুবোধ বালকের মত রজনীর এই ক্ষুদ্র বরটি সেই থেকে প্রতিদিন রজনীর ফুল গুছিয়ে দেয় এবং রজনী তাকে বর বলে সম্ভাষণ করে।

শচীন্দ্রনাথ ও রজনীর মিলিত সৌভাগ্য অমরনাথেরই নিঃস্বার্থ চেষ্টা ও ত্যাগের ফল। তাদেরই এক বৎসরের শিশুসন্তান অমরপ্রসাদ। এই শিশুর নামকরণের মধ্যে রয়েছে অমরনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। এই শিশুর ব্যক্তিত্ব ব্যাপকভাবে ফোটানর প্রয়োজন বোধ করেন নি লেখক। কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে অমরনাথ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত অমরপ্রসাদের মধ্যে তাঁর ব্যর্থতা ও ত্যাগের একটি সার্থকতার ছবি দেখতে পেলেন। রজনী, শচীন্দ্রও অমরনাথের কথোপকথনের মধ্যে রজনীর শিশুপুত্রটি টলমান অবস্থায় এসে মায়ের পায়ের কাছে দুবার আছড়ে পড়ে তার দুই হাঁটু ধরে তার মুখের পানে চেয়ে উচ্চহাসি হেসে উঠল। তারপর অমরনাথের মুখের দিকে চেয়ে হাত তুলে বলল—"দা!" (যা!)[৭]

সুকুমারী মহেন্দ্র ও কল্যাণীর দুই বৎসরের শিশুকন্যা। তার ক্ষুদ্র জীবনপরিসর অনেক নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, যদিও তার শিশুমনে তার কোন ছায়াপাত আমরা দেখতে পাই না। দুর্ভিক্ষতাড়িত

৫। রজনী—১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৬। রজনী—১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৭। রজনী—৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

হয়ে মহেন্দ্র ও কল্যাণী শিশুকন্যা সহ জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত পথ পার হয়ে আনন্দারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে ক্ষুধার্ত দস্যুর শিশুর কচিমাংস ভোজনের চেষ্টা থেকে সুকুমারীকে রক্ষা করে কল্যাণী বৃক্ষান্তরাল দিয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পরে কল্যাণীর দুর্দিনের জন্য রক্ষিত বিষের বাটিকা শিশুসুলভ কৌতূহলে ভোজন করে সুকুমারী মৃতপ্রায় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। তারপর জীবানন্দ ঠাকুর তাকে রক্ষা করে সন্তানহারা ভগ্নী নিমির কাছে তাকে পালন করতে দেন। নিমির সন্তানবিয়োগ ব্যথায় কাতর মাতৃহৃদয় সুকুমারীকে গভীর মমতায় পালন করে কিছুকালের জন্য মাতৃত্বের সুখ লাভ করেছিল। যুদ্ধশেষে জীবানন্দ মাতাপিতাকে তাদের সন্তান ফিরিয়ে দেবার জন্য নিমাইমণির কাছ থেকে সুকুমারীকে যখন নিয়ে যেতে এলেন তখন এই বালিকাকে কেন্দ্র করে নিমির সন্তানবাৎসল্যের চিত্রটি বেদনামধুর।

"নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?"[৮] নিমাই সুকুমারী ও তার খেলনা তার ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী জীবানন্দের সম্মুখে এনে ফেলে দিতে লাগল। সুকুমারী তখন একটু বড হয়েছে। সুতরাং নিজের জিনিস গুছিয়ে নেবার বোধটুকুই তার এসেছে আর কোন পরিবর্তন তার শিশুমনে রেখাপাত করে নি। "সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হাঁ মা—কোথায় যাব মা?' নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।"[৯]

দস্যুলাঞ্ছিতা ইন্দিরা, বসুপরিবারের সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পথে কোন একটি গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগান হয়। সেই ঘাটে অমলা আর নির্মলা নামে দুটি সাত আট বৎসরের বালিকা ছোট ছোট দুটি কলসি নিয়ে ঘাটের রাণায় নামবার সময় জোয়ারের জলের একটি গান গাইতে গাইতে নামছিল। ছোট ছোট মেয়ে দুটির বালিকাসুলভ মিষ্ট সৌন্দর্য, তাদের সাজসজ্জা, গান ইন্দিরার নিরাশ্বাস মনে ভারী একটি ভাল লাগার স্বাদ এনে দিয়েছিল। অমলা নির্মলার পরনে শিউলি ফুলে ছোবান লাল পাড় শাড়ী, হাতে, গলায় গহনা, কানে দুল, খোঁপায় ফুল। দুজনের পায়ে চারগাছি করে মল

৮। আনন্দমঠ : ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৯। আনন্দমঠ : ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

বাজছে আর সেই মলের বাজনার সঙ্গে অমলা নির্মলা একেকজন একেকপদ করে জোয়ারের জলের গান গাইছে।

অমলা

"ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল।"[১০]

নির্মলা

"ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।"[১১]

হেমা সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের মেয়ে। মেয়েটি কৌতুকপ্রিয় শ্লোক বলতে ভালবাসে। কথা বলার প্রয়োজন হলেই সে শ্লোকে মনোভাব প্রকাশ করে। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—রান্না কেমন হয়েছে? সে সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটতে বসে—

"রাঁধ বেশ বাঁধ কেশ,
বকুলফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী হাতে হাঁড়ি
রাঁধছে গোয়ালার বালা।"[১২]

আবার বৃদ্ধা পাচিকা ঠাকুরাণীর চুলে কলপ দিয়ে শোণের নুড়ি চুলকে কালো করার শখ হয়েছে শুনে হেমা আরম্ভ করল—

"চলে বুড়ী শোনের নুড়ী
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল
হাতে নড়ি গলায় দড়ী
কানে জোড়া দুল।"[১৩]

কলপের রংয়ে লাল, কাল, সাদায় বুড়ীর অপূর্ব সাজ দেখে হেমাও তাকে জ্বালাতে আরম্ভ করল—

১০। ইন্দিরা: ৫ম পরিচ্ছেদ।
১১। ইন্দিরা: ৫ম পরিচ্ছেদ।
১২। ইন্দিরা: ৮ম পরিচ্ছেদ।
১৩। ইন্দিরা: ১ম পরিচ্ছেদ।

"যম বলেছে সোনার চাঁদ
এস আমার ঘরে।
তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদূরে গোবরে।"[১৪]

আবার পাচিকা ঠাকরুণ যখন আয়নায় নিজের কলপশোভিত অপরূপ মূর্তি দর্শন করল, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তখন সে কুমুদিনীর মুণ্ডভোজনের জন্য বার বার যমকে আমন্ত্রণ করতে লাগল। যেখানেই কোন গণ্ডগোল অথবা কৌতুকজনক ব্যাপার সেখানেই হেমা তার ছড়ার ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত। সুতরাং বুড়ীর ক্রোধানলকে আরও উদ্দীপ্ত করে সে আরম্ভ করল—

যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই।
বুড়ী মরে যা না ভাই।"[১৫]

বঙ্কিমসৃষ্ট শিশু চরিত্রাবলীর আর একটি মনোরম উদাহরণ 'ইন্দিরা'য় সুভাষিণীর তিন বৎসরের পুত্রটি। সুভাষিণী যেমন ইন্দিরার মতে "দেখিবার মত সামগ্রী", তার শিশুপুত্রটিও ঠিক তাই। "তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, ছলিতেছে, নাচিতেছে···সকলকে আদর করিতেছে।"[১৬]

সতীশচন্দ্রের সঙ্গে এই শিশুটির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র অস্ফুটবাক্, সে দুই একটি শব্দ অস্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে। সুভাষিণীর পুত্র কেবল কথা বলতে শিখেছে। সুতরাং সে তার বিচিত্র উচ্চারণে সব কথার প্রতিধ্বনি করে এবং তার ফলে অত্যন্ত গভীর পরিবেশের মধ্যেও একটি মাধুর্যের হিল্লোল প্রবাহিত হয়ে যায়। তার ঠাকুরমা যখন পচিকারূপে নিয়োজিতা ইন্দিরাকে দেখিয়ে সুভাষিণীকে বলেন,— "এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে," সঙ্গে সঙ্গে "ছেলে বলিল, 'আমি কলা কতা বলব।' আমি বলিলাম, 'বল দেখি!'

১৪। ইন্দিরা: ৯ম পরিচ্ছেদ।
১৫। ইন্দিরা: ৫ম পরিচ্ছেদ।
১৬। ইন্দিরা: ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে বলিল, 'কলা চাতু (চাটু) হাঁলি আল্ কি মা' ?"[১৭]

এই শিশুটি ইন্দিরার সঙ্গে "কুলুডিনী ছাচুলী" পাতিয়েছে, বুড়ীর কলপচর্চিত মুখচ্ছবি দেখে বলেছে, "বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে।" এবং নাটক সম্পূর্ণ করবার জন্য বুড়ীর পিঠে একখানা চেলাকাঠ বসিয়ে তার ইন্দিরাকে গালাগালের উত্তরে প্রতিবাদ জানায় এবং "আমাল, চাচুলী, আমাল্ চাচুলী" বলে আনন্দে নৃত্য করতে থাকে।

শিশুর মুখের এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা এবং তার পবিত্র সরলতার উদ্ভাসে 'বিষবৃক্ষ' এবং বিশেষ করে 'ইন্দিরা'য় সুখী দাম্পত্যজীবনের একটি স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। দাম্পত্য সুখের পরিপূর্ণতা শিশু ছাড়া সম্ভব নয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী, যে বিশ্বাস কালিদাসের অমরকাব্য "কুমারসম্ভবে"র মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। যে বিশ্বাসে পুত্র ভরতের মধ্য দিয়ে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনকে পূর্ণতা দিয়েছে।

দিল্লীর চাঁদনীচকে মবারক খাঁ দরিয়ার অনুরোধে যখন হিন্দুজ্যোতিষীর কাছে নিজের "কিসমত", গণনা করাতে গেলেন, তখন তাঁর প্রথম সমস্যা হল ঘোড়াটি ধরে কে ? অদূরেই কটি বালক রাজপথে লাড্ডুভোজনে রত ছিল, মবারক আরও লাড্ডুর প্রলোভন দেখানোয় তারা ঘোড়া ধরতে রাজী হ'ল এবং অবিলম্বে তাদের মধ্যে উলঙ্গপ্রায় একটি বালক মবারকের অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বসল। মবারক তাকে প্রহার করতে গেলেন কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, ঘোড়াই তাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং "অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল।"[১৮] মবারক নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগ্যগণনাতে গেলেন।

শিশু ও বালকচরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমের কৌতুকবোধ অপ্রাসঙ্গিকক্ষেত্রেও কিভাবে উচ্ছ্বসিত হয় এইটিই তার সুন্দর উদাহরণ।

১৭। ইন্দিরা : ১৭শ পরিচ্ছেদ।

১৮। রাজসিংহ : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পর্ব

বঙ্কিম-সাহিত্যে ইতিহাস

বঙ্কিম-উপন্যাসে ইতিহাসের নিরিখ

'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী মানুষ হইবে না।'—এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে প্রতিনিয়ত জাগ্রত ছিল। অতীতের বাঙালীজাতির গৌরবময় ইতিহাস, শৌর্য-বীর্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকর্ষ এ সবের চর্চা বঙ্কিমচন্দ্র পরম গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন।

কিন্তু বাঙালীর প্রামাণ্য ইতিহাস তাঁর সম্মুখে ছিল না। না মুসলিম, না ইংরেজ—কোনো পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকই 'বিজয়সিংহ-কংসনারায়ণ-লক্ষ্মণসেনের' বাংলাকে যথার্থভাবে চিত্রিত করেন নি, বরং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে তাঁরা দুরপনেয় কলঙ্কই লেপন করেছেন—এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তাই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করে সৎ সাহিত্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙালীর ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ইতিহাস রচনাও করিয়েছেন। বঙ্কিমের ইতিহাস-সাধনা ও স্বদেশ সাধনা অভিন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কিভাবে জাতীয়গৌরবের উদ্বোধন করা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ : আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' অবশ্য ঐতিহাসিক কিংবদন্তী আশ্রয়েই রচিত। হুগলী জেলার গড়মান্দারণ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি এবং স্টুয়ার্টের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—এই বঙ্কিমের উপকরণ। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাস রোম্যান্সের উপাদান মাত্র। পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'তেও তাই নবকুমার-কপালকুণ্ডলা-পদ্মাবতী-কাপালিকের কাহিনীতে দিল্লী আগ্রার যে ঐতিহাসিক অংশটুকু আনা হয়েছে, তা রোম্যান্সের রসকে আরও ঘনীভূত করেছে মাত্র।

রোম্যান্টিক সাহিত্য-রচনায় ইতিহাস সুদূর বা অনতিদূর অতীতের একটি রহস্যময়তা বিস্তার করে, পাঠক-পাঠিকার কল্পনাকে উজ্জীবিত করে। আবার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কোনও জাতিকে গৌরবোজ্জ্বল বিগত দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়, তাকে বর্তমানে হীনাবস্থা থেকে উত্থিত হওয়ার শক্তি জোগায় অথবা বৃহত্তর মহিমালাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে। এইভাবেই ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসে দেশে দেশে ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনলাভ হয়েছে, এই কারণেই

Stein-এর জার্মাণ জাতির ইতিহাস আজকের এই বিপুল জার্মাণদেশকে প্রাণপ্রেরণা দিয়েছে, এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বাঙালীর ইতিহাস চাই।'

কিন্তু কেবল বাঙালীরই নয়, অত সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা বঙ্কিচন্দ্রের ছিল না। তাঁর ইতিহাসের ক্ষেত্র সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারতে প্রসারিত। তিনি কামরূপের যুবরাজ হেমচন্দ্রের কথা ভোলেন নি। আবার তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহের' কামানগর্জন রাজপুতানার গিরিকন্দরে ধ্বনিত হয়েছে।

বস্তুতঃ তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সঙ্গে দেশপ্রেমকে সমন্বিত করেছেন। 'মৃণালিনী' আন্তরধর্মে সম্পূর্ণই রোম্যান্স, কিন্তু বখতিয়ার খিলিজীর আবির্ভাব, তাঁর নবদ্বীপবিজয় এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতিগত কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা—এতেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুইচক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ইতিহাস অথবা কিংবদন্তীনির্ভর (যথা 'দেবীচৌধুরাণী—কিন্তু এও সম্পূর্ণ জনশ্রুতিমূলক নয়, 'রঙ্গপুর গেজেটীয়ার' এর উৎস) তিনি যে উপন্যাসই রচনা করেছেন, তাতেই ইতিহাস দেশপ্রেমের বাণীবহ হয়ে উঠেছে। এমন কি জীবনদ্বন্দ্বমুখরিত 'চন্দ্রশেখরে'ও সে বাণী অশ্রুত নয়।

কিন্তু মাত্র দেশপ্রেমের সঙ্কীর্ণ সীমানাও বঙ্কিমচন্দ্রকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমেরই আরাধনা। পরিণত বয়সে এই তাঁর পরম উপলব্ধি। তাই বঙ্কিমের শেষ তিনখানি উপন্যাস—যা তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের শিল্পিত রূপ—ইতিহাস এবং ইতিহাসকল্প পটভূমির আশ্রয়ে দেশপ্রেমকে আরও উর্ধ্বায়িত করেছে। মানবতাবাদ এবং ঔদার্যকে আরও সম্প্রসারিত করেছে এবং গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের মহাবাণী ঘোষণা করেছে। এই আলোকেই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির নবরূপায়ণ ঘটেছে বঙ্কিমসাহিত্যে।

সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় ইতিহাস যজ্ঞাগ্নি। কিন্তু যজ্ঞশিখাই শেষ কথা নয়—পূর্ণাহুতিই ঋত্বিকের কাম্য। বঙ্কিমের রচনায় ইতিহাসের ব্যক্তিত্বে অনুশীলনের হবিঃসেচন: বাঙালী মানুষ হোক, বাঙালী মানব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক, বাঙালী ঈশ্বরানুরাগে কৃতকৃতার্থ হোক।

বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর মনস্ব ও মনীষা দিয়ে ইতিহাসের অতীত অন্ধকার থেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন কয়েকটি চরিত্রকে—অওরংজেব, জেব-উন্নিসা,

রাজসিংহ, জগৎসিংহ ও ওসমান খাঁ, সীতারাম রায় ইত্যাদি। ইতিহাসের কাঠামোয় এঁরা সৃষ্ট, কিন্তু ইতিহাস যেখানে নীরব, শিল্পীর তুলিকা যেখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, ইতিহাসের প্রাণ-ধমনীতে রক্তমাংসের সজীবতা দান করে। হৃদয়ের দ্বন্দ্বসংঘাতে, প্রেমে, মানবতায়, দেশপ্রেমে এঁরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। ইতিহাসের এই চরিত্রগুলিতে বঙ্কিমের দান এই বিশেষত্বটুকুই, বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য।

দুর্গেশনন্দিনী :

আচার্য যদুনাথ সরকারের মতানুসারে উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া চলে। বস্তুতঃ "দুর্গেশনন্দিনী রোম্যান্সবহুল প্রণয়কাহিনী এবং এই প্রণয়-কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার মোগল পাঠানের বিরোধ এবং মোগল কর্তৃক উড়িষ্যাবিজয়—এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।"[১] উপন্যাসের মূল সূত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ চার্লস স্টুয়ার্টের 'হিস্টরি অব্ বেঙ্গল' থেকে সংগ্রহ করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ইতিহাসঅংশ 'হিস্টরি অব্ বেঙ্গলের' মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযান, পুত্র জগৎসিংহ ও কতলু খাঁ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তৎকালীন ঐতিহাসিক গবেষণা বঙ্কিমচন্দ্রকে মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযান সম্বন্ধে যে তথ্যটুকু পরিবেশন করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্টিক কল্পনা ও পরিকল্পনা তাতে নূতনতর আলোক প্রতিফলিত করেছে। স্টুয়ার্ট বলেন, বিশ্বাসঘাতক আফগান সৈন্য কতলু খাঁ কূটকৌশলে জাহানাবাদের দুর্গাশ্রিত জগৎসিংহকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী করে। কিছুদিন পরে কতলু খাঁর অসুস্থতা ও আকস্মিক মৃত্যু উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। ইতিহাসের অপূর্ণ অংশগুলিতে লেখক আশ্চর্য কৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও হৃদয়দ্বন্দ্ব সংযোজিত করে উপন্যাসটিকে ইতিহাসোত্তর একটি রোম্যান্টিক কাহিনীতে পরিণত করেছেন।

ইতিহাসগত চরিত্রগুলি ইতিহাসকে অনুসরণ করেই রচিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র দুটির (জগৎসিংহ ও ওসমান খাঁ) পরিচয় সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথের গবেষণার ফল কিছু ভিন্ন।

অম্বরের যুবরাজ জগৎসিংহের সঙ্গে গড়মান্দারণাধিপের কন্যার বিবাহের

১। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম : শ্রী প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত।

উপাখ্যানটি যে সম্পূর্ণ ই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত তা নয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,—'মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয় বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।"[২] উপন্যাসের ঠামোয় সম্ভবতঃ এই গল্পের প্রভাব আছে।

জগৎসিংহ

ইতিহাসের ছায়ায় রচিত হলেও দুর্গেশনন্দিনী রোম্যান্টিক উপন্যাস এবং তার নায়ক জগৎসিংহের ঐতিহাসিক পরিচিতি যথাযথ না হলেও তাঁর চরিত্র মানসিংহের বংশধরেরই যোগ্য। রাজপুতজাতির ঐতিহাসিক বীর্যবত্তা স্মরণে রেখে লেখক কাহিনীর মানসিংহপুত্র জগসিংহকে স্বদেশব্রতী যুবকের তেজ, বীর্য, নিষ্ঠা, দুঃসাহসিকতায় ভূষিত করেছেন।

'জগৎসিংহ'-এর নাম এবং চরিত্রটির প্রকৃত পরিচয়ের তথ্য সুস্পষ্ট হতে পারে, যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একটি বিবৃতি লক্ষ্য করলে—

"কুমার জগৎসিংহ স্বয়ং নহেন, তাঁহার রাজপুত স্ত্রীর পুত্র মহাসিংহ বাল্যকালেই মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে বাংলায় গিয়া অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন।"[৩] অতএব মহাসিংহের বীর্য ও ব্যক্তিত্ব জগৎসিংহে আরোপ করেছেন লেখক এবং কাহিনীগত তথ্যসমূহ সম্ভবতঃ চার্লস স্টুয়ার্টের 'হিস্টরি অব্ বেঙ্গল' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

"to put a stop to the ravages of the Afgans, the Raja detached his son, Juggat Singh, who compelled them to

২। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা : বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ৫০ পৃঃ।

৩। বেভরিজের অনুবাদ 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ১২, ১৩-১৪ পৃষ্ঠা। যদুনাথ সরকার—ভূমিকা—সাহিত্য পরিষদ।

retire, and to take refuge under the guns of a fort."[8]

জগৎসিংহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও আচার্য যদুনাথ সরকারের সঙ্গে একমত।

পিতার আদেশে পাঠান আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে এসে জগৎসিংহ গড়মান্দারণে দুর্গাধিপতির কন্যা তিলোত্তমার প্রণয়ে আবদ্ধ হন।

কিন্তু উভয়ের মিলনের পথ কুসুমাস্তৃত হয় না—প্রভূত তেজ ও বীরত্বসত্ত্বেও ঘটনাচক্রে জগৎসিংহ পাঠান নবাবের হাতে বন্দী হন, নবাবের দেবীরূপা কন্যা আয়েষা সেবাযত্নে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। বিমলার হাতে কতলু খাঁর মৃত্যুর পরে জগৎসিংহ মুক্ত হন—তিলোত্তমাকে পত্নীরূপে লাভ করেন।

জগৎসিংহ বীর্যবান আদর্শ নায়ক। আমাদের জাতীয় নবজাগরণের (Renaissance…এর) প্রথম পর্যায়ে কর্নেল টডের 'রাজস্থান' আমাদের প্রভূত প্রেরণা দিয়েছিল। রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য-আত্মত্যাগের বিবিধ কাহিনী আমাদের অনুপ্রাণিত করত। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালীর বাহুবল' অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রথম উপন্যাসে রাজপুতজাতির ঐতিহাসিক বীর্যবত্তা স্মরণে রেখে রাজপুত বীরকেই তিনি নায়করূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

ওসমান খাঁ

ওসমান খাঁ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে নবাব কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় সেনাপতি। ওসমান বীর, জগৎসিংহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। রণক্ষেত্রে ওসমান ও জগৎসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন যথাক্রমে কতলু খাঁ ও মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে। কিন্তু জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার সুগভীর প্রেম, আয়েষা-প্রেমাকাঙ্ক্ষী ওসমানের চিত্তে ঈর্ষার দাহ সৃষ্টি করল। এই জ্বালায় ওসমান স্বাভাবিক চরিত্রমাধুর্য হারিয়ে জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। অবশ্য বীর রাজপুত্রের কাছে মুসলমান সেনাপতিকে পরাজিত হয়ে মাথা নত করতে হল। ইতিহাসেও ওসমান খাঁর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে অবশ্য তাঁকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলা হয়নি, তবে ওসমান খাঁর চরিত্রের দুঃসাহসিক বীর্যবত্তার পরিচয় সর্বত্র।

ওসমান-চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি— "ওসমান পাঠানকুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান

৪। History of Bengal : Charles Stewart.

কোন কার্যেই সংকোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধপ্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না।"[৫]

বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালের অধ্যাপক ডঃ যদুনাথ সরকারের আবিষ্কৃত একখানা ফরাসী হস্তলিপি—'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'তে 'উসমানে'র বীরচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৩-৪) ডঃ যদুনাথ সরকার উক্ত গ্রন্থ থেকে মোগল সেনাপতি সুজায়েৎ খাঁর সঙ্গে বিদ্রোহী পাঠানরাজ উসমান খাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করেছেন।

কতলু খাঁ

কতলু খাঁ উড়িষ্যার পাঠান নবাব। পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুর ও জাহানাবাদের মধ্যবর্তী গড়মান্দারণের রাজপুত ভূস্বামীকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাঁর পত্নী ও কন্যাকে বন্দিনী করে উড়িষ্যায় নিয়ে যান—একথা স্টুয়ার্টের 'হিস্টরি অব্ বেঙ্গলে' পাই। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র এই মূল কাহিনীটি কিংবদন্তী আকারে তরুণ বয়সে শুনেছিলেন। অতএব কতলু খাঁ প্রভৃতি ও পাঠের ওপর সৃষ্ট চরিত্র। ঐতিহাসিক উপাদান থাকলেও কতলু খাঁর যে সব অংশ ইতিহাসের দিক থেকে অসত্য, তাদের জন্য দায়িত্ব যে বঙ্কিমের নয়, আচার্য যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'বঙ্কিমগ্রন্থাবলী'তে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকায় তা দেখিয়েছেন:

"পূর্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যকালে খুল্লপিতামহের নিকট শ্রুত গড়মান্দারণের একটি ঘটনা 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। বিষ্ণুপুর, জাহানাবাদ ও মান্দারণ অঞ্চলে উক্ত বৃদ্ধের যাতায়াত ছিল, তিনি জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধের মুখে এসকলের এবং স্থানীয় জমিদারের স্ত্রী-কন্যাসহ পাঠানদের হাতে বন্দী হওয়ার ও তাঁহার সাহায্যার্থ জগৎসিংহের আগমনের সরস গল্প শুনিয়াছিলেন।"[৬]

বঙ্কিম তৎকাললব্ধ উপকরণগুলির সাহায্যেই কতলু খাঁর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাতে ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি থাকলেও প্রয়োজনীয় বাস্তবতা ও

৫। দুর্গেশনন্দিনী: ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৬। বঙ্কিম প্রসঙ্গ: পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: পৃঃ ৪৯-৫০.

নাটকীয়তার অভাব নেই। বিমলার হাতে কতলুর মৃত্যু সম্পূর্ণই কাল্পনিক কিন্তু তাতে কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাট্যরস আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাজা মানসিংহ

বিখ্যাত মোগল সেনাপতি অম্বরপতি মহারাজ মানসিংহ* 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছেন। তিনিই বীরেন্দ্রসিংহ এবং বিমলার বিবাহের সংঘটক—যার ফলে বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর প্রতি জাতক্রোধ এবং নিজ কন্যার সঙ্গে কোনমতেই মানসিংহপুত্র জগৎসিংহের বিবাহে সম্মত নন। দ্বিতীয়তঃ, পুত্রের গৌরবে মানসিংহ গর্বিত পাঠানবিনাশে জগৎসিংহের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি অতিরিক্ত দশ সহস্র সৈন্য পাঠিয়েছেন। তৃতীয়তঃ, কাহিনীর নায়ক কুমার জগৎসিংহের তিনি পিতা। (দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ) বঙ্কিমচন্দ্র মানসিংহের যতটুকু পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত নয়। এর উপকরণ স্টুয়ার্ট ৭ থেকে সংগৃহীত বলে কিছু ভুল আছে। (জগৎসিংহ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

বীরেন্দ্র সিংহ

গড়মান্দারণের তেজস্বী জমিদার—নায়িকা তিলোত্তমার পিতা। কতলু খাঁ তাঁকে বন্দী এবং বধ করেছেন। গড়মান্দারণের জমিদারের উল্লেখ, তাঁর বন্দীত্ব—এসব বিবরণ ইতিহাসে থাকলেও 'বীরেন্দ্রসিংহ' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বঙ্কিম যৌবনে শ্রুত কিংবদন্তীতে নামটি শুনেছেন অথবা কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন।

তেজোদীপ্ত অভিমানী এই চরিত্রটি দোষেগুণে বাস্তবতা লাভ করেছে।

---

* ঐতিহাসিক তথ্য

মানসিংহ অম্বররাজ ভগবানদাসের ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র এবং ভগবানদাসের দত্তক পুত্র। সম্রাট আকবর তার পিসিকে এবং যুবরাজ সেলিম তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন, ইনি আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি—বঙ্গদেশ থেকে কাবুল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপকে পরাজিত করেন। ১৫৮৯—১৬০৬ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। বার ভুইঞার দমনের নায়ক। রাজমহল শহর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ১৬১৪ সালে দাক্ষিণাত্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭। Stewart, History of Bengal.

তাঁর ব্যক্তিজীবনের অংশ, বিমলার সঙ্গে গোপন সম্বন্ধ, মানসিংহের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ—ইত্যাদি উপকরণগুলি উপন্যাসের জটিলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উল্লিখিত কয়েকটি নামের ইতিহাসসম্মত পরিচয়। এই তথ্যগুলি প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' থেকে সংগৃহীত।

দায়ুদ খাঁ

১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর (বাংলার শেষ পাঠান রাজা) গৌড় অধিপতি সুলেমান খাঁর কনিষ্ঠপুত্র দায়ুদ খাঁ। মোগলদের নিকট পাঠানবাহিনী পাটনায় পরাজিত হলে দায়ুদ খাঁ উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানেও মোগল সেনাপতি মুনেম খাঁর হস্তে পরাজিত হন এবং এক সন্ধিবলে মাত্র উড়িষ্যারাজ্য তাঁর হস্তগত থাকে। অচিরেই দায়ুদ আবার বিদ্রোহ করেন এবং আকমহলের যুদ্ধে মোগল সেনাপতি হুসেন কুলি খাঁ বা খাঁ জাহানের নিকট পরাজিত ও ধৃত হন। খাঁ জাহানের আদেশে দায়ুদকে হত্যা করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে।

মুনেম খাঁ

আকবরের সুযোগ্য সেনাপতি। ইনি জৌনপুরের জামিলিয়ার মোগল দুর্গে নিযুক্ত ছিলেন। মুনেম খাঁ গৌড়দখলের চেষ্টায় পাটনা অবরোধ করেন (১৫৭৪), দায়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করলে মুনেম খাঁ জলেশ্বর তুকারই যুদ্ধে দায়ুদকে পরাজিত করেন। এরপর মুনেম খাঁ দায়ুদের সঙ্গে সন্ধি করেন। উড়িষ্যা দায়ুদকে দেওয়া হল এবং মুনেম বঙ্গবিহারের কর্তা হয়ে গৌড় রাজধানী স্থাপিত করলেন। অচিরে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী দেখা দেয় এবং সেই করালব্যাধিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

শাহবাজ খাঁ

শের শাহের পরবর্তীকালে দিল্লীর সুলতান ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ্ আদিলের সেনাপতি হিমু কর্তৃক বাঙলার বিদ্রোহী সুলতান শামসুদ্দিন পরাজিত হলে শাহবাজ খানকে (১৫৫৫) বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অচিরেই শামসুদ্দিনের পুত্র গিয়াসুদ্দিন শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলাদেশের অধিপতি হন (১৫৫৬)।

খাঁ আজম

এর প্রথম নাম মীর্জা আজিম কোকা, ইনি আকবরের ধাত্রীপুত্র এবং তার অশেষ প্রীতিভাজন। যখন পাঁচ হাজারী মনসবদার হন, তখন তাঁর নাম হয় খান-ই-আজম। আকবরের শাসনকালে ১৫৮২ থেকে ১৫৮৪ পর্যন্ত ইনি বঙ্গদেশে ছিলেন। এর মৃত্যু হয় ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে।

কপালকুণ্ডলা :

জাহাঙ্গীর

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর (পাত্‌শা-নূর-উদ্দীন গাজী) চরিত্রটি এসেছে লুৎফ-উন্নিসা বা পদ্মাবতীর প্রাক্তন প্রণয়ীরূপে, তিনি যে হৃদয়মধ্যে মেহেরুন্নিসার জন্য প্রতীক্ষাকাতর, তাও দেখানো হয়েছে। লুৎফ-উন্নিসা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি একধরণের বেদনাও তাঁর জন্য অনুভব করেছেন—"কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে, এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করে না?" (৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসার বাল্যপ্রণয় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অস্বীকৃত হলেও Cambridge History of India, Vol. IV. P—163, 1963 ed. সাধারণ চলিত বিশ্বাসটিই বঙ্কিম উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। কাহিনীগত প্রয়োজনে জাহাঙ্গীর গৌণ চরিত্র মাত্র।

নূরজাহান

"Nurjahan was indeed possessed of exquisite beauty a fine taste for Persian literature, poetry and arts, 'a piercing intellect, Versatile temper, and sound common sense'. But the most dominating trait of her character was her inordinate ambition, which led her to establish an unlimited ascendency even over her husband."

—(An Advance History of India, by R. C. Majumder and others, 3rd ed. P. 459.)

ঐতিহাসিকগণ নূরজাহানের এই অসাধারণত্বে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শক্তির মহত্ত্বে ও ভীষণতায় অসাধারণ এই নারীকে নিয়ে ইতিহাসের প্রাথমিক উপকরণে অনেক কাহিনী যোজিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মেহেরুন্নিসা সেই

প্রাথমিক কাহিনীর ভিত্তিতে গঠিত। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকের গবেষণায় মেহেরুন্নিসা সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। তা হলেও তাঁর মূল ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিবর্তন এইসব তথ্যবিস্তারে ঘটে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে সাধারণ বিশ্বাসের স্থূল রেখাতেই অঙ্কন করেছেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রাক্-মিলন পর্বে তাঁর গৃহলক্ষ্মীসুলভ কমনীয়তাই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের নূরজাহান রাজনীতির যে রক্তবন্যায় তরী ভাসিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখান নি, 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী-সংস্থানে তার প্রয়োজনও ছিল না।

সেলিমের প্রধানা মহিষী

ইনি হিন্দু রাজপুত কন্যা। রাজা মানসিংহের ইনি পত্নী ও রাজপুত্র খস্রুর জননী। (মানসিংহ দ্রষ্টব্য)

খান আজম : Khan Azam

অথবা আজি কুকা, সম্রাট আকবরের 'আতগা' (Foster father) শামসুদ্দীন খাঁর পুত্র এবং সম্পর্কে আকবরের 'স্তন্যভ্রাতা' (Foster brother) আজিজ কুকা আকবরের বিশেষ স্নেহভাজন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা হন, পরে নানা অবস্থাচক্রে মক্কায় পলায়ন করেন। মক্কা থেকে ফিরে এলে তৎকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে মার্জনা করেন। পরে দাক্ষিণাত্য এবং সেখান থেকে তাঁকে মেবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খস্রুর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পতন ঘটে এবং শেষজীবন অসম্মানে অতিবাহিত হয়। The Cambridge History of India, IV, V, VI, chapter দ্রষ্টব্য।

"......Khurram, who reported that Khan Azam was unsatisfactory and was suspected of intrigues in favour of his son-in-Law Khusrav. Jahangir was so impressed by these reports that he removed Khan Azam from the command and made him over to the custody of Asaf Khan with instructions that he should be kept in the fort of Gwalior, which had been the enforced residence of so many detenues."[৮] pp 161.

৮। The Cambridge History of India, ed. by Sir Richard Burn.

শের আফগান (আলি কুলি)

মেহেরউন্নিসার (নূরজাহানের) সঙ্গে সম্রাট আকবর আলি কুলির বিবাহ দেন। ইনি শৌর্যের জন্য শের আফগান নামে পরিচিত। জাহাঙ্গীরের একটি প্রবল ঘৃণা এবং বিদ্বেষের পাত্র ছিলেন (বর্ধমানের জাগীরদার) শের আফগান। ১৬০৭ সালে জাহাঙ্গীর নিজ ধাত্রী-পুত্র কুতুবউদ্দীন কোকাকে শের আফগানের হত্যার জন্য বর্ধমানে পাঠান। যুদ্ধে শের আফগান ও কুতব উভয়েই নিহত হন, মেহেরউন্নিসা আগ্রায় জাহাঙ্গীরের অন্তঃপুরে আনীতা হন এবং পরে 'নূরজাহান' নামে ইতিহাসবিশ্রুতি লাভ করেন।

"A Persian adventurer called 'Ali Quli', after rendering good military service, had been attracted to Salim's staff, and was rewarded by the title of Sher Afgan (tiger—slayer) for his gallant conduct during a hunting expendition."[১] pp. 160.

মৃণালিনী :

বখতিয়ার খিলিজী

আনুমানিক ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, History of India) বখ্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তখন বৃদ্ধ, তিনি অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং নবদ্বীপ তথা গৌড় অতি সহজেই বিজিত হয়েছিল বলে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা (মিন্‌হাজুদ্দিন) সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা এই বিজয় সংঘটিত হয়েছে এই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিম স্বদেশপ্রেমিক, প্রাচীন হিন্দুর শৌর্যে বিশ্বাসী। এ কাহিনী তিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে স্বীকার করেন নি। তবে বখতিয়ারের চাতুর্য ও বীর্য তিনি যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গেই রূপায়িত করেছেন। 'মৃণালিনী'র প্রথম মুদ্রণে বখ্‌তিয়ার সংক্রান্ত যে প্রথম অধ্যায়টি ছিল—যে দৃশ্যে হেমচন্দ্র

১। The Cambridge History of India, ed. By Sir Richard Burn Vol. IV.

মত্তহস্তীর হাত থেকে বখ্‌তিয়ারের প্রাণ বাঁচালেন—সেটি বর্জিত হয়ে ভালই হয়েছে। 'মৃণালিনী'র (চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) এ বিশ্বাসঘাতক পশুপতি বখ্‌তিয়ারের কাছে যেভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন, তাতে পাঠান সেনাপতির কূটতা ও বিচক্ষণতা অতি নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন

মুসলিম ঐতিহাসিক 'মিন্‌হাজউদ্দীনের তবাকৎ-ই-নাসিরী'তে বখ্‌তিয়ার খিলিজী মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যোগে বঙ্গবিজয় করেছিলেন—এই প্রচলিত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা কেউই এ কাহিনী বিশ্বাস করেননি—হিন্দুর বলবীর্যে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র তো নয়ই। বৃদ্ধ অসক্ত এবং অপ্রস্তুত লক্ষ্মণসেন অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন, তাঁর অপদার্থ, বিশ্বাসঘাতক এবং নির্বোধ পার্ষদ ও সেনানীবৃন্দ যে এই দুর্ভাগ্যের জন্য অনেকখানিই দায়ী, বঙ্কিমচন্দ্র তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন (মৃণালিনী, ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)।

বঙ্কিমচন্দ্রের কালে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের কলঙ্কমোচনের উপযোগী প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাব ছিল। তথাপি প্রতিভা এবং কবিকল্পনার দ্বারা তিনি চক্রান্তকারী পরিষদবর্গ পরিবৃত নিরুপায় রাজার যে চিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন তা সত্যসম্মত ও শিল্পসার্থক।

আচার্য দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর 'বৃহৎবঙ্গে' রাজা লক্ষ্মণ সেন-এর পরিচয় ও মুসলমান আক্রমণকালীন তাঁর আচরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। তার থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হল।

'সেনেরা আসিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে, তাঁহারা কর্ণাটের রাজবংশসম্ভূত। ......(পৃঃ ৫২৪) ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয় (পৃঃ ৫২৬) মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল এবং এই বিজয়সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা নবদ্বীপ অধিকার।.........লক্ষ্মণ সেন সেই সময়ে ভারতবর্ষে এক কীর্তিমান রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যৌবনে তিনি বহুযুদ্ধজয়ী পরাক্রান্ত বীর বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনটাই মুসলমান অভিযানের সমকালবর্তী। তিনি নিশ্চয়ই মুসলমানদিগের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সূক্ষ্মভাবে সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন (পৃঃ ৫২৭)।

মিন্‌হাজ লিখিয়াছিলেন, যখন বক্তিয়ারের অভিযান আসন্ন হইল তখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, ধনী ও বড়লোকেরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন স্থান ত্যাগ করিলেন না। স্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণ সেন আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার নগরের প্রধান প্রধান লোক তাঁহাদের সমস্ত পরিবার ও ঐশ্বর্য জগন্নাথে অথবা গঙ্গার উত্তর-পূর্বকূলে পাঠাইয়া দিলেন।..............বৃদ্ধবয়সে তাঁহার বৃথা বীরত্ব দেখাইয়া লোকক্ষয় করিবার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু যেখানে তাঁহার প্রকৃত বল, মুসলমান সৈন্য যে নদনদীরক্ষিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবে—তাহাই রক্ষার জন্য তিনি ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন মনে হয়।'[১০] (পৃষ্ঠা ৫৩৯)

চন্দ্রশেখর :

মীরকাশেম

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঐতিহাসিক অংশের নায়ক বাংলার নবাব মীরকাশেম। চরিত্রটি বীর, প্রেমিক ও স্বাধীনচেতা একটি পুরুষের। ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের ফলে 'উদয়নালা'র যুদ্ধে শেষপর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। উপন্যাসে মীরকাশিমের চরিত্রে বীরোচিত বহু গুণের আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু দলনী বেগমের প্রতি তাঁর মমতাস্নিগ্ধ প্রেম এবং এই একান্ত পবিত্রতাকে নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় মৃত্যুদণ্ডদানের দুঃসহ অন্তর্যন্ত্রণা—এই কাল্পনিক অংশেই শিল্পী বঙ্কিমের কৃতিত্ব সমধিক। যদিও চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ কাহিনীতে তাঁর ভূমিকা পরোক্ষ, তথাপি সার্থক শিল্পকৌশলে 'চন্দ্রশেখরে'র সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক স্থাপন করে, দলনীহরণের মাধ্যমে প্রতাপ-শৈবলিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে এবং স্বীকারোক্তির জন্য লরেন্স ফস্টরকে তাঁর শিবিরে আনয়ন করিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য করে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক উপাদান :

বাঙলার ইতিহাসে মীরকাশেম একটি বিশিষ্ট নাম। নবাব মীরজাফরের তিনি জামাতা, কিন্তু চরিত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিটি শেষপর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেলেন। তাঁর জীবনের সেই বিপুল বৃত্তান্ত বঙ্কিম সম্পূর্ণ ব্যবহার করেন নি। যাই

১০। বৃহৎবঙ্গ : ১ম খণ্ড, শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

হোক, ইতিহাসে মীরকাশেম ও ইংরেজের বিরোধবৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"By an imperial firman the English Company enjoyed the right of trading in Bengal without the payment of transit dues or tolls. But the servants of the Company also claimed the same privileges for their private trade ....the practice went on increasing till it formed a subject of serious dispute between Mir Kasim and the English. At last towards the end of 1762 Vansittart met Mir Kasim at Monghyr, where the Nawab had removed his capital, and concluded a definite agreement on the subject. The Council at Calcutta, however rejected the agreement.

Thereupon the Nawab decided to abolish the duties altogether. But the English clamoured against this and insisted upon having preferential treatment as against other traders. Ellis, "the chief of the English factory at Patna, violently asserted what he considered to be the rights and privileges of the English, and even made an attempt to seize the city of Patna. The attempt failed and his garrison was destroyed, but the events led to the outbreak of war between the English and Mir Kasim (1763)."[১১]

এরই ফলে একটির পর একটি যুদ্ধে মীরকাশিমের বার্থতা—গিরিয়া, উধুয়ানালা, মুঙ্গের এবং সর্বশেষে বক্সার যুদ্ধের পরাভবে হতাশাস ও হৃতসর্বস্ব মীরকাশিমের ১৭৭৭ সালে নিঃসঙ্গ দুর্গত মৃত্যু।

সিংহাসনে আরোহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মীরকাশেমের যে ঘটনাসংকুল বিপুল জীবননাট্য, বঙ্কিমচন্দ্র তাই নিয়েই একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারতেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' ইতিহাসমিশ্র হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস

১১। An Advanced History of India—P. 663.

নয়, তাই স্বাধীনচেতা, যোদ্ধা ও দুঃসাহসিক মীরকাশিম অপেক্ষা দলনীর প্রেমধন্য এবং স্বদোষে সে-ই প্রেমবঞ্চিত দুর্ভাগ্য, একটি মানবের কাহিনী এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। বীর নবাব উপন্যাসে অনুপস্থিত নন; কিন্তু তাঁর যুদ্ধগত পরাজয় যেখানে ইতিহাসের লক্ষ্য, সেখানে তাঁর দলনীর হৃদয়-সাম্রাজ্য বিচ্যুত হওয়ার বেদনাই ঔপন্যাসিকের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

গুরগণ খাঁ আরমানী সৈনিক জর্জ গ্রেগরী যদিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি, দলনী চরিত্রটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাস কোন ব্যক্তির রেখাচিত্রই অঙ্কন করে, তাকে রক্তমাংসের সঞ্জীবতা দান করতে পারে না; এই মানবিক সঞ্জীবনের প্রয়োজনেই মীরকাশিমের ঐতিহাসিক দেহপঞ্জরে কাল্পনিক দলনীর অপূর্ব রক্তস্পন্দন সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমের যথার্থ কৃতিত্ব এইখানেই।

দলনী (দৌলতন্নেসা)

দলনী বাংলার নবাব মীরকাশিমের বেগম। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তিনি দ্বিতীয়া নায়িকা। মীরকাশিমের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে এই চরিত্রটিকে যুক্ত করে দিয়েছেন। কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে সে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই স্নিগ্ধ, সুকুমার তেজস্বিনী এবং পতিপ্রাণা নারীটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ ভারতীয় নারীত্বের উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন।

চরিত্রটি কাল্পনিক। দলনীর ভ্রাতা গুরগণ খাঁ যদিও প্রায় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু কোন প্রচলিত বা প্রামাণ্য ইতিহাসে দলনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গুরগণ খাঁ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দলনীর দুর্ভাগ্যসূত্রে গুরগণ খাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। চরিত্রটি ঐতিহাসিক। তাঁর প্রাসাদ মুঙ্গের শহরের পীরপাহাড়ে এখনও বিদ্যমান। কবিকল্পনায় সৃষ্ট দলনী বেগমের সঙ্গে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিতে ঔপন্যাসিক পূর্ণতা এনেছেন।

গুরগণের ঔদ্ধত্য, আত্মপ্রত্যয়, শৌর্য-বীর্য, ইংরাজকে বিতাড়িত এবং মীরকাশেমকে অপসৃত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হওয়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা—এইগুলি ইতিহাসসম্মত এবং বঙ্কিমের উপন্যাসেও (চন্দ্রশেখর, ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ) চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু দলনীর ভ্রাতারূপে

প্রতিষ্ঠিত করে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রে যে অতিরিক্ত নাটকীয়তা ও ব্যক্তি মীরকাশিমের জীবনের বিষাদময়তাকে ঘনীভূত করেছেন, সেখানেই এর যথার্থ সার্থকতা। 'মৃণালিনী'র পশুপতির সঙ্গে গুরগণের কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'মুতাক্ষরীন্' থেকে সম্পূর্ণভাবে এটি গ্রহণ করেছেন। নবাবের সেনাপতিরূপে গুরগণ খাঁ চিহ্নিত হলেও বস্তুতঃ ইনি আর্মেণীয়, এঁর নাম জর্জ গ্রেগরী। বীর এবং বুদ্ধিমান গ্রেগরী নবাবের সেনাদলের বিশেষ উন্নতিসাধন করেছিলেন।

"সেকালে কলকাতার আরমাণী বণিকগণের মধ্যে খোঁজা পিক্রু নামক এক ব্যক্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।......তাঁহার ভ্রাতা গ্রেগরী মীরকাশিমের প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গ্রেগরী এদেশের ইতিহাসে গর্‌গিণ খাঁ নামে পরিচিত।......উপন্যাসে তাঁহার নাম গুরগণ খাঁ। তিনি সামরিক সকল বিভাগেই কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় খোঁজা পিক্রুর যোগে মীরকাশিম গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা কারণে মীরকাশিমের দরবারে গুরগণ্ খাঁর আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।...............গুরগণ খাঁ বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত বলিয়াই নবাবদরবারে সুপরিচিত ছিলেন।.........আরমাণী সেনাপতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।"[১২]

"আরাটুন অথবা খোঁজা গ্রেগরী নামক আরমাণী সেনাপতি মীরকাশিমের দরবারে গরগিণ খাঁ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মীরকাশিম তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, তোপখানার সমস্ত ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি বীরোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেন নাই বলিয়াই মীরকাশিমের পরাভব হইয়াছিল।............ মেজর আদামস খোঁজা পিক্রুর সহায়তায় গরগিণ্ খাঁকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।.........................ইহা লোকপরম্পরায় মীরকাশিমেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। গরগিণ খাঁ তজ্জন্য নির্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। গরগিণ খাঁর সঙ্গে ইংরাজদিগের যেরূপ আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্দারা তাঁহার সহায়তায় উত্তরকালে আরও অনেক উপকরণলাভের সম্ভাবনা ছিল।"[১৩]

১২। মীরকাশিম: ১৪শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৫; অক্ষয়কুমার মৈত্র।

১৩। মীরকাশিম: ১৭৮-১৮০ পৃষ্ঠা; অক্ষয়কুমার মৈত্র।

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট (Henry Vansittart)

১৭৬০ সালে জুলাই মাসে মাদ্রাজ থেকে এসে অস্থায়ী গভর্ণর হলওয়েলের কাছ থেকে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ সালে তিনি পদত্যাগ এবং বাংলা ত্যাগ করেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভ্যান্সিটার্ট ব্যান্সিটার্ট রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

ভ্যান্সিটার্ট সম্বন্ধে অক্ষয় মৈত্র মহাশয়ের গবেষণা :

"গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ইংরাজ বণিকদরবারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই গভর্ণর হলওয়েল এবং সেনাপতি কেলড্ মীরজাফরের সিংহাসনচ্যুতির সমুদয় ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, হলওয়েলের মন্ত্রণাক্রমে ভ্যান্সিটার্ট প্রকাশ্য দরবারের আদেশ গ্রহণ না করিয়া অল্প কয়েকজন সদস্যের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কাসিম আলি এই অল্প কয়েকজন সদস্যকেই পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।...... যাঁহারা ভ্যান্সিটার্টের পক্ষ সমর্থন না করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—ভ্যান্সিটার্টের সমস্ত কার্যই অন্যায় ও অভদ্রোচিত, কেবল উৎকোচলোভেই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন।"[১৪]

"Vansittart and Hastings, who was their (English) creature, were desirous to prevent a rupture with him (Mirkassim), so they prevailed on the Council, of which at that time only four members were present at Calcutta, to send them to the Nawab and endeavour to bring about an adjustment."[১৫]

এলিস (William Ellis) : (চন্দ্রশেখর—২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হলেও পাটনায় কোম্পানির ব্যবসায়িক অধ্যক্ষ উইলিয়ম এলিস নবাববিরোধী চক্রান্তের প্রধান নায়ক। মীরকাশেমের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত কলহ রচনায় এই উদ্ধত ইংরেজের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা জঘন্য। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলেছেন :

১৪। মীরকাশিম : শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

১৫। Rise of Christian Power in India—B. D. Basu, 2nd ed, 1931, Calcutta Page 143.

"William Ellis was appointed the provincial chief of the company's factory at Patna. He was a man of very violent temper and a declared enemy of the Nawab as well as the Governor Vansittart. He never let an opportunity pass without insulting Nawab or trying to set his authority at naught. He was the direct cause of most of the troubles, ill feelings and misunderstandings between the Nawab and the Company.[১৬]

মহম্মদ তকি খাঁ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁর অন্যতম সেনানায়ক মহম্মদ তকি খাঁর একটি অশ্রদ্ধেয় ভূমিকা আছে। (চন্দ্রশেখর, পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও ষষ্ঠ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) নবাব মীরকাশেমের অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তকি খাঁ পরোক্ষভাবে দলনী বেগমের মৃত্যুর কারণ হন এবং বিষপানোদ্যতা দলনীর নিকট একটি কুৎসিত প্রস্তাব করেন। দলনী প্রত্যুত্তরে তকিকে পদাঘাত করেন এবং স্বমহিমায় মৃত্যুবৃতা হন। বিশ্বাসহন্তা তকি পরিশেষে নবাবের তরবারিতে প্রাণ হারান।

সম্ভবত: প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই বীর প্রভুভক্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রটির উপর অন্যায় কলঙ্ক আরোপ করেছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্বস্ত এই বীর সেনানায়ক প্রভুর জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। দলনীর কাল্পনিক উপাখ্যানের মতই তকির বিশ্বাসঘাতক নীচতাও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত অথবা কোন অর্বাচীন সূত্রের দ্বারা বিভ্রান্ত। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র এ সম্পর্কে তাঁর 'মীরকাশিম' গ্রন্থে লিখেছেন:

"মীরকাশিমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল বীরভূম প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাঁহার নায়কের নাম মহম্মদ তকি খাঁ। সাহসে, কর্তব্যনিষ্ঠায়, রণ-কৌশলে তকি খাঁ সকল দেশেই জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তকি খাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত

১৬। Rise of Christian Power in India— B. D. Basu. 2nd ed. 1931, Calcutta, Page 141.

মুসলমান সেনাপতি অধিক থাকিলে ইতিহাসে মুসলমানের নাম কলঙ্কলিপ্ত হইত না। মীরকাশিম তাঁহাকেও মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিলেন।"[১৭]

এ বিষয়ে ফার্সী গ্রন্থের বিশদতর বিবরণ অক্ষয়কুমারের 'মীরকাশিম' গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"......... সিরাজদৌল্লার অগণ্য সেনানায়কের মধ্যে মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতি দুই একজন ভিন্ন এমন লোক অধিক ছিল না। মীরকাশিমের এক-জন মাত্র এমন সেনানায়ক ছিল—তাঁহার নাম মহম্মদ তকি খাঁ। প্রথম যুদ্ধেই তকি খাঁর মৃত্যু হইল বলিয়া মীরকাশিমের অধঃপতনের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[১৮]

'মুতাক্ষরীণ' নামক পারস্য গ্রন্থে এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত পারস্য গ্রন্থের উর্দু ও ইংরাজী অনুবাদ-পুস্তকে কাটোয়ার যুদ্ধের কথা এইরূপ লিখিত রহিয়াছে :

'মহম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর দুসরে ইয়া তিস্‌রে......হামরাহি মহম্মদ তকি খাঁকে জান নেসার হুয়ে।"[১৯]

ইংরেজী অনুবাদ :

"In the year 1177 of the Hijira, Mahammed Taky Qhan came out with resolution to oppose the enemy's march. .. The moment becoming critical, when a ball of connon wounded Mahammed Taky Qhan in the foot, and killed his horse,.... The General without betraying any anguish, mounted another, and continued to advance and to exhort his men,... ..and lodging a bullet in his forehead, that incomparable hero, who was the main prop of Mircassim Qhan's fortune hastened into eternity in the middle of his

১৭। মীরকাশিম : ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১৪৬ পৃষ্ঠা : শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র।

১৮। মীরকাশিম : ১৮শ পরিচ্ছেদ, শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্র।

১৯। Urdu Mutakharin—published by Munshi New-al Kishore of Lucknow.

slaughtered soldiers."[২০]

একটি অসামান্য মহান চরিত্র 'চন্দ্রশেখরে' অপব্যাখ্যাত হয়েছেন বলেই মহম্মদ তকি খাঁ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতির প্রয়োজন হল।

সমরু (Walter Raynold)

মীরকাশেমের অন্যতম প্রধান সেনানায়ক। 'সমরু' নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। অধ্যাপক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর "Mir Qasim" গ্রন্থে তাঁকে,—'The notorious European renegade' বলেছেন। সমরু অত্যন্ত নিষ্ঠুর চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর রক্তপিপাসার বিবরণে ইতিহাস কলঙ্কিত।

"He had entered the Nawabs Service, was posted at Buxar with four regiments of infantry to ensure the safety of the part, and he earned the esteem of the Nawab by massacring about six hundred "Bhujpuriah" robbers in cold blood—an act which subsequently entitled him to the atrocious commission of massacring unarmed English prisoners at Patna."[২১]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র সমরুকে Walter Raynold নামে পরিচিত করেছেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার অন্য পরিচয় দিয়েছেন—

"ভাইস সম্বর নামে একজন সুইস বা জার্ম্মাণ মীরকাসেমের সেনাদল মধ্যে সৈনিককার্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।"[২২]

মার্কার (Marcer) :

ইনিও আর্মেণীয়, জর্জ গ্রেগরী বা গুরগণ খাঁর অন্যতম অনুবর্তী সেনানায়ক। ইতিহাসে ইনি Marcat নামেও পরিচিত।

(N. L. Chatterjee, Mir Qasim Chapter XII, P 201)

মার্কার বা মার্কাট নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। "তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সমর-কৌশলের কথা অদ্যাপি বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হয় নাই"[২৩]

২০। Raymonds footnote to his traslation of Siyar P-711 (মীরকাশিম থেকে উদ্ধৃত) (English translation of Mutakharin UL-Mutakharin.

২১। Dr. N. L. Chatterjee, Chapter VI, Page 98-9

২২। চন্দ্রশেখর : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

২৩। অক্ষয়কুমার মৈত্র : মীরকাশিম, পৃষ্ঠা-১১৬।

অমিয়ট :[২৪] (Amyatt)

অমিয়ট, হে (Hay)র সঙ্গে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে নবাব মীরকাশেমের কাছে বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্য গিয়েছিলেন। নবাবের প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ইংরেজবিরোধিতা, গয়ায় কোম্পানীর সৈন্যদের ওপর অকারণ আক্রমণ, সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং দুই বৎসরের জন্য বাণিজ্য-শুল্ক প্রত্যাহার ইত্যাদির ফলে যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, এরই সম্পর্ক আলোচনার জন্য অমিয়ট এবং হে নবাবের কাছে কাউন্সিলের দৌত্য নিয়ে যান।

ইংরেজ গভর্ণরের পত্রে নবাব উত্তেজিত হন, তাছাড়া ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাঁর জাতবিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকায় দুই জগৎশেঠ ঘটিত জটিলতার সূত্রে এবং বিবিধকারণে প্রথমে তিনি অমিয়ট ও হে-র সঙ্গে সাক্ষাতেই সম্মত হন না। পরে অমিয়ট প্রদত্ত দশদফা দাবি তিনি প্রায় স্থূলভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন।"[২৫]

হে (Hay) : অমিয়ট দ্রষ্টব্য।

আলি ইব্রাহিম খাঁ

"He was the most faithful friend of Mir Qasim Ghulam Hossain has given a high opinion in regard to his ability and merit, ···who, to all his innate delicacy in matters of honour and fidelity, joins the incomparable talent of unravelling the most hidden mysteries of administration, and of discovering intuitively the decisive knot of the most intricate accounts····."[২৬]

উপন্যাসে কুলসমের দুই একটি উক্তি থেকে আলি ইব্রাহিম খাঁ যে নবাবের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী সে পরিচয় আমরা পাই। ষষ্ঠ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে নবাব নিজেই তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন 'তোমার ন্যায় বন্ধু জগতে নাই।'[২৭] কাহিনীর বিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে ইব্রাহিম খাঁকে আমরা বিশেষ পাই না।

২৪। চন্দ্রশেখর : দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ ও অন্যত্র।

২৫। Mir Quasim, N. L. Chatterjee, Chapter XII.

২৬। (Siyar, 11, Page-388 Raymond's Translation, Calcutta reprint.

২৭। চন্দ্রশেখর : ৬ষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আসদুল্লা

মীরকাশিমের একজন সেনাপতি। "উধুয়ানালায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিম প্রেরিত সেনাপতি ও সৈন্যদলের সঙ্গে গিরিয়া হইতে পরাজিত সমরু, মার্কার, আসাদুল্লা প্রভৃতির অধীন সৈন্যসমূহ তাহাদের সহিত যোগ দেওয়ায় মোট সৈন্যসংখ্যা ৪০ সহস্রেরও অধিক হয়।"[২৮]

স্বরূপচাঁদ ও মহতাবচাঁদ

"জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সমুদয় রাজনীতিক ব্যাপারেরই মূলে ছিলেন।...... শেঠ বংশীয়দের মধ্যে ফতেচাঁদই প্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।...... পৌত্র মহতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদকে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী-মনোনীত করিয়া যান। মহতাবচাঁদ আনন্দচাঁদের ও স্বরূপচাঁদ দয়াচাঁদের পুত্র। বাদশাহ্‌র নিকট হইতে মহতাবচাঁদ 'জগৎশেঠ' ও স্বরূপচাঁদ 'মহারাজ' উপাধিলাভ করেন।

... ...

মীরকাশিম অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান ছিলেন;...... ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জগৎশেঠ তাহাদিগকে পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ও জাফরআলী খাঁকে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহার কতকগুলি মীরকাশিমের হস্তগত হয়। এজন্য নবাব জগৎশেঠ মহতাবচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মোহম্মদ তকি খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকি খাঁ তাঁহাদিগকে কোনরূপ অবমানিত না করিয়া হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন।......মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে একটি কুঠি স্থাপন করিয়া তথায় স্বাধীনভাবে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত শেঠদিগের কুমন্ত্রণা পুনর্বার আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা অধিক দূরে যাইতে না পারেন, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ দেন।"[২৯]

এত সাবধানতা সত্ত্বেও স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ এবং মহতাবচাঁদ জগৎশেঠদের

২৮। মুর্শিদাবাদ কাহিনী: শ্রীনিখিলনাথ রায়, 'উধুয়ানালা', পৃষ্ঠা-৯৫।

২৯। মুর্শিদাবাদ কাহিনী: শ্রীনিখিলনাথ রায়, জগৎশেঠ, পৃষ্ঠা-১৯, ২১, ২৫-২৬।

ইংরেজ ও গুরগণ খাঁর সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাকে মীরকাশেম রোধ করতে পারেন নি।[৩০] জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইংরেজের সহায়ক হন।

"ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে। নবাব কাটোয়া, গিরিয়া উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হন, এবং মুঙ্গেরে আসিয়া জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দী কর্মচারী এবং রাজা ও জমিদারদিগের বিনাশ সাধন করেন।"[৩১]

নবাবের বিশ্বস্ত ওমরাহ সেনাপতি প্রভৃতিদের মধ্যে আমরা আমীর হোসেন, মহম্মদ ইরফান, মীরনাশির, হায়রৎউল্লা প্রভৃতির নাম পাই।

ওয়ারেণ হেস্টিংস

কাহিনীতে সুবিখ্যাত ওয়ারেণ হেস্টিংসের প্রসঙ্গ দুই একবার উল্লিখিত হয়েছে। ওয়ারেণ হেস্টিংস সম্বন্ধে প্রচলিত বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন লেখক—

"ইতিহাসে ওয়ারেণ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।······বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেণ হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্যস্থাপনে সক্ষম তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্যস্থাপনাদি মহৎ কার্য হইতে পারে না—কেননা তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র।"[৩২]

আনন্দমঠ সম্বন্ধে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ

ক্যাপটেন টমাস

"'A set of lawless banditti,' wrote the Council in 1773, known under the name of Sannyasis or Faquirs, have long infested these countries; and under pretence of religious pilgrimage, have become accustomed to traverse the chief part

৩০। চন্দ্রশেখর: ৫ম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৩১। মুর্শিদাবাদ কাহিনী: শ্রীনিখিলনাথ রায়, জগৎশেঠ, পৃষ্ঠা-২৭

৩২। চন্দ্রশেখর: ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

of Bengal, begging, stealing and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise.' In the years subsequent to the famine, their ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering, ravaging, in bodies of fifty thousand men. The collectors called out the military ; but after a temporary success our sepoys 'were at length totally defeated and Captain Thomas (their leader), with almost the whole party, cut off.' It was not till the close of the winter that the Council could report to the Court of Directors, that a battalion under an experienced commander had acted successfully against them ; and a month later we find that even this tardy intimation had been premature. On the 31st March 1773, Warren Hastings plainly acknowledges that the commander who had succeeded Captain Thomas, 'unhappily underwent the same fate,' that four battallions of the army were then actively engaged against the banditti, but that, in spite of the militia levies called from the landholders, their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged, such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the still life of Bengal."

—Hunter's Annals of Rural Bengal, pp 70-72.

Captain Thomas :—

"You will hear of great disturbances committed by the sannyasis or wandering fackeers, who annually infest the

province about this time of the year, in pilgrimages to Jaggernant, going in bodies of 1,000, and sometimes even 10,000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti, about 30,000 of them, near Rangpur, with a small party of Pergana sepoys, which has made the more talked of than they deserve. The revenue, however has felt them effects of their ravages in the northern districts."

History of the Sannyasi Rebellion. From Warren Hasting's Letters in Gleig's Memoirs.

From Hastings to Sir George Colbrooke dated 2nd Feb. 1773 Gleig's Memoir, Vol 1, P. 282.

"Early in the morning of the 29th December Captain Thomas and his company marched with these sepoys towards Zafforganj. Before day break of the 30th, he attacked the Sannayasis numbering about fifteen hundred on a plain near Samgunge (West of Rangpur town) in Swaruppur Parganas. At first they gave away and the Captain pursued them in a jungle where the sepoys expanded all their ammunitions without doing the least execution ; when they perceived the ammunition spent, the Sannaysis rushed in upon them in very large bodies from every quarter and surrounded them ; about 12 men came in, almost all wounded, excepting those which were left in Captain, Thomas' tent. Captain Thomas ordered the sepoys to charge upon them with their bayonets which they refused to do and the orderly of the Captain wanted him to mount his horse which he would not. Captain Thomas received one wound by a ball through the head which he tied, and next he was cut down." P—50. Chap-VI.

"After the skirmish in which Capt. Thomas was killed at the end of 1772, a band of Sannyasis marched northward towards Cooch-Behar to reinforce the Sannyasis under Durrup Deo." P—51. Chap VI.

—"Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal."

Captain Edward :

"On receipt of this news the 'Committee of Circuit' then at Dinajpur directed Capt. Edwards to march at once towards Chilmary against the Sannyasis. Capt. Edwards with three companies of sepoys reached Oliapore (Alipur in Rangpur district) on the 17th and on the following day continued his march towards Chilmary. (PP. 55)

* * *

The 'Committee of Circuit' also directed Capt. Stuart to act with Capt. Edwards in the suppression of the Sannyasis and the collectors of Rangpur was instructed to employ Capt. Jones for the same purpose. (PP. 57)

With Capt. Edwards in pursuit the sannayasis left Attia and made another attempt to reach Dacca. (PP. 57).

* * *

... Failed in their attempts to reach Dacca the various bands of Sannyasis retraced their steps westward. and Capt. Edwards persued them with his detachment. (PP. 58)

Douglas was the first that fell but the fate of Captain Edwards* was not known ; his hat was found in the Nulla before mentioned. but the body has never been discovered.

---

*Timothy Edwards-Captain, 1st September, 1769, drowned, March 1st 1773. in a Nullah at Barrypore.... Dodwell and Miles, Army list (Barrypore was Probably a hamlet of the present town of Serajgang).

"Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal"

ক্যাপ্টেন হে সম্বন্ধে "Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal" গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়।

"On 13th April Capt. Hay with four companies of sepoys proceeded from Patna to join the detachment at Bettia using the most utmost expedition on the March." pp 61.

ওয়াটসন

Henry Watson (1737-1786)

"He went to Calcutta in 1764, and on 1 May was appointed field Engineer with the rank of Captain and Commander of the troops in Bengal.

... ...

Watson was promoted to be Lieutenant Colonel on 19th Jan. 1775, after his return to England." (P-7)

—Dictionary of National Biography.
Vol. LX. Ed. by Sidney Lee.

দেবী চৌধুরাণী :

ভবানী পাঠক

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের এই দস্যুচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণসুলভ ঔদার্য, মহিমা ও তেজ আরোপ করেছেন। ভবানীপাঠক দেবীরাণীর গুরু ও সহায়ক। দস্যু হলেও এই চরিত্রে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও শৌর্য তা তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, প্রফুল্লকে গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের পাঠ দিয়েছেন।

ভবানীপাঠক চরিত্র ঐতিহাসিক। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরভারতাগত কোনো ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। দস্যুহিসাবে অতি দুর্ধর্ষ ও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সরকারী কাগজপত্রে যা তথ্যাদি পাওয়া যায় তা এই—

"In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaits (Gang robbers), named Bhawani Pathak. He dispatched a native officer, with twenty four sepoys, in search of the robbers, who surprised

Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed, and eight wounded, besides forty two taken prisoners. Pathak was a native of Bajpur."[৩৩]

দেবী চৌধুরাণী

দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে প্রাপ্ত সরকারী তথ্য এই—

"We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit by name Devi Chowdhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of bark-andazes in her pay, and committed decoities on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of Chowdhurani would imply that she was a Zamindar, probably a petty one ; also she need not have lived in boats for fear of capture."[৩৪]

এই তথ্য সম্পূর্ণ নয়। রঙপুরে 'চৌধুরাণী' নামে যে রেল স্টেশনটি বিদ্যমান, সেখানে এই চৌধুরাণী বংশের সন্তানেরা এখনো আছেন। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত'-এ দেবীরাণী সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জমিদারের তরুণী পত্নী। এঁর স্বামী দস্যুহস্তে নিহত হলে প্রতিশোধ কামনায় ইনি নিজে দস্যুদল গঠন করে নৌকাবাহিনী হলেন এবং ভবানী পাঠকের সাহায্যে অচিরাৎ প্রবলপ্রতাপে তিস্তা-করতোয়া-মহানন্দা-চলনবিল প্রকম্পিত করে তোলেন। দীর্ঘকাল দস্যুতা করবার পর ইনি অকস্মাৎ রহস্যময়ভাবে তিরোহিত হন, আর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ভবানী পাঠকের মৃত্যুতেই ইনি শমিত হয়ে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলার তপন দীঘিতে মধ্যে মধ্যে আজও দেবী চৌধুরাণীর বজরা ভেসে ওঠে—এইরকম জনশ্রুতি আছে।

"দেবী চৌধুরাণী'র জন্ম কাল ও স্থান এই দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ

৩৩, ৩৪। Hunter, A statistical Account of Bengal, Vol, VII-pp 158-59,

উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন, বৃটিশশাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুদ্ধের সন্ধিস্থান; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। আর স্থান সীমান্তপ্রদেশ, আনন্দমঠে বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, সীতারামে সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেসা ভূষণা পরগণা আর দেবী চৌধুরাণীতে রঙ্গপুর জেলা।"৩৫

Lieutenant Brenan :—

"In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dacoits, named Bhawani Pathak. He dispatched a native officer, with twenty-four sepoys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which the leader himself and three of his lieutenants were killed and eight wounded besides forty two taken prisoners." (P—28)

Eastern Bengal District Gazetteers.

Vol. XI!, Rangpur by J. A. Vas.

গুডল্যাড

পূর্ণিয়া ও রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় কালেকটর ছিলেন। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ব্যাপক দস্যুতার পর্যায়ে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা দ্রষ্টব্য :—

"Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal"

সীতারাম :

সীতারাম রায়

সীতারাম রায় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শাত্মক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সীতারামের' কেন্দ্রীয় চরিত্র ধর্মভিত্তিক রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী সীতারাম প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কেমন করে ব্রতভ্রষ্ট হলেন, নিজের এবং সমগ্র জাতির সমূহ সর্বনাশ-সাধন করলেন, উপন্যাসে তা উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত, দুর্বলতা ও ব্যর্থতার পাশাপাশি সীতারামের ক্ষত্রিয়সুলভ বীর্যবত্তা, নির্ভীকতা ও মহত্ত্ব সমভাবে প্রদর্শিত

৩৫। যদুনাথ সরকার কৃত 'দেবী চৌধুরাণী'র ঐতিহাসিক ভূমিকা পৃঃ ৬।

হয়েছে। সীতারাম যেন বাঙ্গালী চরিত্রের, বিশেষভাবে বাঙ্গালীর ক্ষাত্রশক্তি কায়স্থ সামন্তরাজার দোষগুণের একটি পরিপূর্ণ সমাহার।

চরিত্রটি ইতিহাসগত, বাংলার বিখ্যাত 'বারো ভুঁইঞা'র অন্যতম মহম্মদপুরের সীতারাম রায়। ইতিহাসের কাঠামোয়, কল্পনার অনুলেপে উপন্যাসের সীতারামের কাহিনী। সীতারামের বিবাহ সংক্রান্ত কাহিনী-রচনায় অনেকাংশেই বাস্তবের অনুসৃতি ঘটেছে। সাহিত্যের সৌন্দর্য তাতে অভিনবত্বের আধান করেছে। তৎকালীন কোন কোন সামাজিক তথ্যের রূপান্তরিত আলেখ্য এখানে পাই। এ প্রসঙ্গে গঙ্গারামের লঘু অপরাধে কাজীর বিচারে জীবন্ত সমাধির আদেশের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মত্যাগে, কৌশলে ও বীর্যে মহান সীতারামের চরিত্র প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সমুন্নতির উর্ধ্বশিখর থেকে সীতারামের উচ্ছৃংখল পতনপথনির্মিতিতে শ্রীর ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যিক ভাবনার মৌলিকতার স্বাক্ষর। চরম সর্বনাশের সম্মুখে সীতারামের আত্মউদ্বোধনেও শিল্পীর নৈপুণ্য প্রস্ফুট।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন—

'এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষিত হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।'[৩৬] কিন্তু আচার্য যদুনাথ বলেন—

'তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস,······বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য। ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই,······সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধবিগ্রহপ্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন এবং উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।'[৩৭]

আদর্শ হিন্দুরাজা সীতারাম রায় নায়ক হিসাবে সংস্কৃত কাব্যের ধীরোদাত্ত লক্ষণাক্রান্ত। আচার্য দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

'তাঁহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ নরপতির যোগ্য ছিল, তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা

৩৬। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' : সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ৫১শ ভাগ। তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১ সাল।

৩৭। ঐ

সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্মান্য মহাবীরদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।"[৩৮]

ইতিহাসের এই 'সীতারাম' চরিত্রেরই প্রতিফলন দেখতে পাই উপন্যাসের সীতারামে। এই সংকল্প, এই ব্যক্তিত্বের আদর্শ হিন্দু নরপতি উশীনরসুলভ শরণাগতের ত্রাণের জন্য আত্মদানের আকুলতা, চিরন্তন ধর্মবোধ সীতারামকে মহীয়ান করেছে।

উপন্যাসের নায়করূপে এই চরিত্রটিকে গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। বীর্যে ও মানসিক শক্তির পূর্ণতায় সীতারাম আদর্শপুরুষ হলেও, প্রবৃত্তি সংযমনে যথেষ্ট সক্ষম না হওয়ায় অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে তাঁর সমস্ত স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটল। শ্রীর প্রতি দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিবেগই তাঁর পতনের মূল। সংযমীপুরুষ হলে সীতারামের মত আদর্শ হিন্দুবীরই একমাত্র স্বদেশ ও সমাজকে সংহত ও সংরক্ষিত করতে সক্ষম হতেন।

উপন্যাসের আরম্ভে দেখি সীতারামকে অসাধারণ, সত্যব্রতী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তীক্ষ্মবুদ্ধি, দ্রুতসিদ্ধান্তে অভ্যস্ত কর্মবীর, যেন ঈশ্বরপ্রেরিত জননেতা। পার্থিব সফলতার চরমে উপনীত হয়ে নিজের নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেন। অনুভব করলেন জীবনের ধ্যেয় কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্য হৃদয়-সঙ্গিনী প্রয়োজন, কালিদাস যাকে বলেছেন,—'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ'। বঙ্কিমের ভাষায় বলা যেতে পারে—

'কিন্তু সহ-ধর্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সহায়দায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী সে কই?'[৩৯]

(সীতারাম উপন্যাসের যদুনাথ সরকার কৃত ভূমিকা থেকে যদুনাথের সীতারামচরিত্রের ব্যাখ্যার সারমর্ম উদ্ধার করা হল।)

সীতারামের অন্তরে যখন এই তৃষ্ণা অন্তঃসলিলা, তখনই তার সম্মুখে নির্ভীক, প্রেরণাদায়িনী দিব্যরূপ উদ্ভাসিত হল। সেই তেজোদীপ্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাময় বিকার তাঁর শক্তিকে ক্রমশঃ ধ্বংসময় পরিণতির মধ্যে নিঃশেষিত করল।

৩৮। বৃহৎ বঙ্গ: শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।
৩৯। 'সীতারামে'র ভূমিকা, ১৪ পৃষ্ঠা, যদুনাথ সরকার।

'সীতারাম' সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্য :

তোরাব খাঁ : (আবু তোরাপ)

'আজিম উস্-শান' বঙ্গেশ্বর হইয়া ঢাকায় আসিবার পর তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীর আবু তোরাবকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাঁহার এক প্রধান কার্য ছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত তাঁহার সদ্ভাব না থাকায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ মীর সাহেব বাদশাহের কুটুম্ব, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ বংশে তাঁহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক বা সমধর্মীদিগের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও কার্যদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। এজন্য তিনি বড গর্বিত ছিলেন ; সহজে কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেন না।······ পৃঃ ৫৯০-৯১।

আবু তোরাব সেই নিভৃত এবং দুর্গম মহলে সর্বেসর্বা হইয়া বসিলেন। লোকে তাঁহাকে নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোরভাবে শাসন-দণ্ড চালনা করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড অত্যাচারী ছিলেন এবং প্রজার জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। সেসব কথা শতমুখে সীতারামের কর্ণগোচর হইত। তিনি সে অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন না।'—পৃষ্ঠা ৫৯১।

—যশোহর খুলনার ইতিহাস।

মুর্শিদকুলি খাঁ

"Murshed Quli Khan was appointed Diwan of Bengal in 1700, became also Naeb Subahdar in 1717 in which post he continued till his death in 1727.·········

"Murshed Quli Khan evolved an efficient system of civil administration."— Introduction Economic History of Bengal, vol. 1 ; N. K. Sinha.

'১৭১৩ সালে ফারুক্‌সিয়র দিল্লীর বাদশাহ হইবার পর মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদার হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্বে বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং প্রায় সমস্ত বাংলা ও উড়িষ্যার ফৌজদার মাত্র এবং শেষে উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। এখন হইতে নামতঃ ও কার্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্বেসর্বা

হইলেন। ঠিক তাহার পরের শীতকালেই সীতারামের ধ্বংস সাধন করিলেন।

ফেব্রুয়ারী : ১৭১৪

সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা—শ্রীযদুনাথ সরকার।

মেনাহাতী : (রামরূপ ঘোষ)

"সীতারামের এই মন্ত্রণাদাতা বন্ধুর নাম মুনিরাম রায় এবং অপর বীরপুরুষের নাম রঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ।.........রামরূপ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, আকনা সমাজভুক্ত বংশজ ঘোষ। তিনি নবগঙ্গাতীরস্থ রঘিগ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্বপুরুষ।......রামরূপ শিশুকাল হইতেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে পালোয়ান থাকিত। রামরূপেরও পৈতৃক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থানে পালোয়ানের নিকট কুস্তী লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবনদশায় উপনীত হইলে তাঁহার দীর্ঘোন্নত বিপুল বাহু দেখিলে লোকে চমকিত হইত।......... তিনি যখন সীতারামের সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে সাধারণ লোকে মেনাহাতী বলিত।......... এই নাম সর্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রকৃত নাম লোকে জানিত না। তাই তাঁহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি চিরজীবন অকৃতদার এবং নিঃসন্তান, সুতরাং তাঁহার নিজের বংশধারা নাই। এইজন্য তাঁহার পরিচয়সূত্র এমনই লুপ্ত যে, তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহা লইয়া লেখকদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

.........করিম খাঁর বিদ্রোহ দমনের জন্য সীতারামের অধীন যে সৈন্য প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন—রামরূপ এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া সীতারাম তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। সীতারাম যে নলদী পরগণার জায়গীর পাইলেন, তন্মধ্যে রামরূপের বাড়ী, সুতরাং তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সীতারামের সহচর হইলেন।" পৃঃ ৫৩৭-৩৮।

(রঘুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অথবা তাঁহারা দুই ভ্রাতা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদুনাথ প্রভৃতি লেখকগণ সকলেই রামরূপ নাম ধরিয়াছিল, আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাতীর নামের মূল্য নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রভুভক্তি অমূল্য পদার্থ।) পৃঃ ৫৩৭।

'মহম্মদপুরের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বা মেনাহাতী। তাঁহার

ভীষণ মূর্তি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাঁহাকে ভয় করিত, তাঁহার নির্মল চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লোকে তাঁহার বাধ্য ছিল, ...তিনি নিজেও যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা, সৈন্যসামন্ত তেমনি তাঁহার একান্ত বাধ্য, এজন্য কামান দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ তাঁহার নিকট হইতে দখল করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।'[৪০] পৃঃ-৬০০।

নবাবের আদেশে এই মেনাহাতীকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়, এই তথ্যটি সতীশ মিত্র মহাশয়ের আহরিত তথ্যে পাওয়া যায়। মেনাহাতীই 'সীতারাম'এর মৃন্ময় রায় এরূপ কোন সোচ্চার স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। কিন্তু মৃন্ময় রায় সম্বন্ধে উপন্যাসে যে তথ্য পাওয়া যায় এবং তাঁর চরিত্রের যে বীর্যবত্তা ও প্রভুভক্তির পরিচয় পাই মনে হয় 'সীতারাম' উপন্যাসের মৃন্ময় স্বয়ং মেনাহাতী (রামরূপ ঘোষ)।

দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার

'ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণবংশীয়। যদুনাথের অন্য নাম ছিল পরমেশ্বর। সীতারামের সরকারে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া মহম্মদপুর দুর্গের নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। (৫৫৬ পৃষ্ঠা) সম্ভবতঃ তিনি দেওয়ানীকার্যে খ্যাতিলাভ করবার পর 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন, তখন উহা বিশেষ সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যদুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তেমনি কর্তব্যশীল ও ন্যায়বান কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিকালে তিনিই তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতেন, আবশ্যক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে রাজ্যরক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।'[৪১] (পৃঃ ৬৩৩-৬৩৭)।,

সীতারাম উপন্যাসে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের যে চরিত্রটি পাই সে চরিত্রটি কল্পিত বলেই মনে হয়। 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় রাজা সীতারাম এর দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার সম্বন্ধে উপযুক্ত যে বিবরণটি দিয়েছেন এবং চন্দ্রচুড় ঠাকুরের যে চরিত্রবিবরণ আমরা পাই দুই-এর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। এইজন্য আমরা অনুমান করতে পারি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের চরিত্রে দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের ছায়া আছে।

৪০/৪১। যশোহর খুলনার ইতিহাস: শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র।

বাদশাহ্ অওরংজেব

ভারতীয় গ্র্যাণ্ডমোগলদের মধ্যে যিনি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ব্যক্তিত্ব, সেই অওরংজেব সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বলেছেন :

"Aurangzeb's private life was simple, pious and austere. He was not a slave of his passions···No one can deny him the credit of being sincere in his religious convictions. But this extreme puritanism made him stern and austere and dried up the springs of the tender qualities of heart. He thus "lacked sympathy, imagination, breadth of vision,, elasticity in the choice of means, which atone for a hundred faults a head."[৪২]

"Aurangzeb had many sterling qualities, but he was not a successful ruler, he was a great soldier but not a far seeing leader of men, a shrewd deplomat but not a sound Statesman."[৪৩]

দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের ব্যর্থতার মূল তাঁর নিজেরই চরিত্রের মধ্যে, ইতিহাস তারই সাক্ষ্য দেয়। রাজপুত যুদ্ধ ও মোগল রাজত্বের পক্ষে তার ভয়ানক পরিণাম অওরংজেবের অপরিণামদর্শী রাজবুদ্ধিরই স্বাক্ষর। রূপনগরী রাজকন্যাকে কেন্দ্র করে রাজপুত রাণা রাজসিংহের সঙ্গে সংগ্রামের পটভূমিকায় বাদশাহ্ অওরংজেবকে আমরা দেখতে পাই।

অওরংজেবের রাজনীতি, রণনীতি এবং চরিত্রপ্রবণতা বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ হলেও কর্ণেল টডের 'রাজস্থান' অনুসরণের ফলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ত্রুটি এতে ঘটেছে। এছাড়া কয়েকটি ব্যাপারেও ঐতিহাসিক স্বাধীনতা বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছেন। কিন্তু এগুলি সত্ত্বেও কাহিনীর অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই প্রাণরসে সঞ্জীবিত। তাদের উপস্থাপনা ও চিত্তবিকাশও ইতিহাসসম্মত। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রধান স্মরণীয় পুরুষ স্বয়ং অওরংজেব, ভারতত্রাস সম্রাট আলমগীর।

অওরংজেবের বিপুল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অন্তরালে যে হৃদয়ের ক্ষুধা, তাঁর

৪২। An Advanced History of India.

৪৩। An Advanced History of India.

হিংস্র কীর্তিকলাপ ও অবিশ্বাসের মধ্যে অন্তরের যে দীন শুষ্কতা, বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস অভিশপ্ত মানুষটির মনের সেই মরুবিন্দুটিতেই রসবর্ষণ করেছে।)

এই মাধুর্যের অংশটি গড়ে উঠেছে কল্পিত চরিত্র নির্মলকুমারী বা 'ইমলি বেগমের' সাহায্যে। মরুভূমিতে মঞ্জরীবিকাশের এই সৌন্দর্যটুকুও সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক বলা যায় না। কারণ ইতিহাসের এই লৌহমানবটিরও একটি সুকোমল মর্মকেন্দ্র ছিল, প্রচলিত কিংবদন্তীজাতীয় কাহিনীতে তার পরিচয় মেলে।*

ইতিহাস সত্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করে, ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই রেখায় রক্তমাংস বিন্যাস করে প্রাণৈশ্বর্যে ভরিয়ে তোলে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকেও ইতিহাসের 'আদরা'তেই বর্ণালিম্পন ঘটাতে হয়েছে, কিন্তু তাতে অওরংজেব অথবা অন্যান্য চরিত্রের বিকৃতি ঘটা দূরে থাক, সেগুলি আরো ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

তৃষিতহৃদয় অওরংজেবের সঙ্গে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার সাদৃশ্য নির্ণয় করা চলে।

রাজসিংহে অওরংজেব বলেছেন নির্মলকুমারীকে :

"বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয় একটু স্নিগ্ধ হয়।"[৪৪]

আর ঠিক সেই সুরেই বলেছেন 'রক্তকরবী'র রাজা :

"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি. আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"[৪৫]

---

* রাণাদিল—Storia do Magor vol. 1 P-361—Manucci : (Translated by Willam Irvine, pp-101-08)

৪৪। রাজসিংহ : বঙ্কিমচন্দ্র।

৪৫। রক্তকরবী : রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ তুলিকায় বর্ণালিম্পনে ইতিহাসসম্মত কুশাগ্রবুদ্ধি আত্মম্ভরী এবং ক্রূর সম্রাট আলমগীরের চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত, অন্যদিকে তাঁর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিহৃদয়ের স্বরূপ—তাঁর ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে একবিন্দু প্রেমের জন্য আর্তি, দুই-ই অসামান্য হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ সিদ্ধান্তে রাজসিংহ কাহিনীর নায়ক এবং নামপুরুষ হলেও বস্তুতঃ বিরাটত্বে ও বৈচিত্র্যে ঔরংজেবই উপন্যাসের যথার্থ নায়কত্ব দাবি করতে পারেন।

জীবনের উদ্‌ভাস না থাকলে মাত্র তথ্য সমাহরণেই ইতিহাসের উপাদান উপন্যাস হয় না। তাই 'গ্র্যাণ্ড মোগল' অওরংজেবের এই মানবিকতার প্রকাশ 'রাজসিংহ'কে ঔপন্যাসিক ঐশ্বর্যে সার্থক করবার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল।

রাণা রাজসিংহ

'রাজসিংহ' উপন্যাসের নায়ক উদয়পুরের বীর রাণা 'রাজসিংহ'। অওরংজেবের সঙ্গে রাজসিংহের সংঘর্ষকাহিনীকে কেন্দ্র করেই 'রাজসিংহ' উপন্যাস। উপন্যাসটিকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই উপন্যাসে লেখক কর্নেল টডের 'অ্যানালস্ অব্ রাজস্থান'কে প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। রূপনগরী রাজকন্যাকে কেন্দ্র করে অওরংজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষকাহিনী উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। কারণটি ঐতিহাসিক। কিন্তু উত্তরকালীন ঐতিহাসিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে টড্ বর্ণিত এবং বঙ্কিমগৃহীত ইতিহাসের ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ যে কন্যাটিকে নিয়ে বিরোধ, তাঁর নাম 'চঞ্চলকুমারী' নয়, 'চারুমতী'। রাজ্যের নাম 'রূপনগর' নয়—'কিশনগর'; বিক্রম শোলাঙ্কী নন—নায়িকার পিতার নাম রাজা রূপসিংহ এবং অওরংজেব ও রাজসিংহের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, তা অন্ততঃ রাজসিংহ-চারুমতীর বিবাহের তেরো বৎসর পরে। এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাপারেও ঐতিহাসিক স্বাধীনতা বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সংগৃহীত টডের ঐতিহাসিক তথ্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"The Mughal demanded the land of the Princess of Rupnagar, a Junior Branch of the Marwar house, and sent with the demand a cartage of two thousand horses to escorte the fair to court. But the haughty Rajputani, either indignant at such

precipitation or charmed with the gallantry of the Rana,…… rejected with disdain the proffered alliance justified by brilliant alliance…… she entrusted her cause to the arm of the chief of the Rajput race, offering herself as the reward of protection …… with a chosen band he rapidly passed the foot of the Aravalli and appeared before Rupnagar cut up the imperial guards and bare off the prize to his capital."[৪৬]

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গবেষণায় রাজসিংহের ইতিহাসের এই তথ্যটির একটি ভিন্ন চেহারা পাওয়া যায়। গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা রচিত প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসিংহ-চারুমতীর বিবাহ-বিবরণ এইভাবে পাওয়া যায় :

"বিঃ সং ১৭১৫ (ইং সং ১৬৫৮) মে কিশনগড়কে রাজা রূপসিংহকা দেহান্ত হোনে পর উনকে পুত্র মানসিংহ উনকে উত্তরাধিকারী হুয়ে। বাদশাহ ঔরংজেব নে উনকী বহিন চারুমতী কী সুন্দরতা কা হাল সুনকর উনসে শাদী করণা চাহা। মানসিংহ কো ভী বিবশ হো কর যহ সম্বন্ধ স্বীকার করণা পড়া। চারুমতী কে পিতা পরম বৈষ্ণব থে, জিসসে (চারুমতী) কো ভী বৈষ্ণবধর্ম মেঁ বড়ী রুচি থী। জব উসনে যহ শুনা কি মেরী শাদী মুসলমান কে সাথ হোনেবালী হ্যায়, তব উহ অত্যন্ত দুখী হুই ঔর উসনে আপনী মাতা তথা ভাই সে কহ দিয়া কি যদি মেরা বিবাহ বাদশাহ কে সাথ করোগে তো ম্যায় অপনে প্রাণোঁ কী তিলাঞ্জলী দে দুংগী। জব চারুমতী নে অপনে বচাও কা কোই উপায় ন দেখা তব উসনে মহারাণা রাজসিংহ কী শরণ চাহী ঔর উনকে পাস এক অরজী ভেজী, জিসমে অপনে দুঃখ কা পূরা হাল লিখতে হুয়ে প্রার্থনা কী কি—আপ মেরে সাথ বিবাহ কর্ মেরে ধর্ম কী রক্ষা করেঁ। ইসপর মহারাণা বিঃ সং ১৭১৭ (ইং সং ১৬৬০) মেঁ সসৈন্য কিশনগর পহুঁচে ঔর চারুমতী সে বিবাহ কর্ উসে অপনে য়হাঁ লে আয়েঁ।"[৪৭]

৪৬। Tod's Rajasthan—Vol I, P 440.

৪৭। উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস—গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা (পৃঃ ৫৪১-৪, আজমীর ১৯৫৫)

। লেখক রাজসিংহ চরিত্রে আদর্শ রাজপুতবীরের পূর্ণ মাহাত্ম্য বিন্যাস করেছেন। ভারতত্রাস সম্রাট আলমগীরের প্রদত্ত শক্তিকেও প্রতিহত করে রাজপুত জাতির অন্তরে যিনি নবপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চরিত্রায়ণে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজসিংহের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র জাতির আগামী অধিনায়ককে পরোক্ষভাবে অভিষেক করেছেন—এমন সিদ্ধান্তও করা অসংগত নয়।

মহাকাব্যোপম উপন্যাসের ধীরোদাত্ত নায়ক রাজসিংহ, বীর্যে, ব্যক্তিত্বে, শরণাগতের ত্রাণে, লোকরঞ্জনে তিনি পুরুষোত্তম রাজপুতশ্রেষ্ঠ। উপন্যাসের দাবীতে কল্পনার বর্ণলেপে ইতিহাসকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করেছেন লেখক। শরণার্থিণী রাজপুত কন্যা চারুমতীই কাহিনীর রোম্যান্টিক নায়িকা চঞ্চলকুমারী, তাকে কেন্দ্র করেই ভারতব্যাপ্ত রাজপুত-মোগলের মহাসমর। ইতিহাসের রাজপুত মোগলের বিশবৎসর ব্যাপী সংঘর্ষে চারুমতীর রক্ষা ছাড়াও অওরংজেব রাজসিংহের মধ্যে দীর্ঘদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ত ঘটনা নয়, ঘটনার সঙ্গে জড়িত মহৎ ব্যক্তিত্বটি। উপন্যাসের 'রাজসিংহ' চরিত্রে আমরা ইতিহাসের সেই অমিতবীর্য বিরাট পুরুষকেই পাই।/

দিলীর খাঁ

অওরংজেবের বিখ্যাত সেনাপতি। বিভিন্ন সময় বিজাপুর অভিযান এবং শিবাজী মারাঠাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুবরাজ শাহ আলমের সঙ্গে তাঁর বিরোধের ফলে মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণ প্রবলতর হয়। তাঁর স্থানে বাহাদুর খাঁন বা খাঁ জাহান নিযুক্ত হন। রাজসিংহের সঙ্গে শেষ-যুদ্ধে দিলীর খাঁ মবারকের সহযোগিতা করেছেন।

উদিপুরী

চরিত্রটি ঐতিহাসিক। ইতালীয় পর্যটক মানুচ্চির বিবরণ থেকে কর্ণেল টড এইভাবে তাঁর পরিচয় উপস্থিত করেছেন :

"A Georgean slave girl of Dara Shikho's harem, who on the downfall of her first master, became the concubine of her victorious master."

এই তরুণী বিদেশিনী যদিও অওরংজেবের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না—কিন্তু এঁর প্রতি সম্রাটের গভীর ভালবাসা এবং প্রবল প্রশ্রয় ছিল :

"Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kam Baksh (Son of Udipuri.) and overlooked her freaks of drunkenness, which must have shocked so pious a Muslim."[৪৮]

বঙ্কিমচন্দ্র টড থেকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপকরণ নিয়েছেন, উদিপুরীকেও নিয়েছেন। তিনি উদিপুরীকে 'দারার পত্নী' বলেছেন—কিন্তু দারা উদিপুরীকে বিবাহ করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। অওরংজেবও তাঁকে বিবাহ করেন নি। উদিপুরী মহিষী ছিলেন না—'প্রেয়সী' ছিলেন। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যই এই সৌভাগ্যের কারণ। (রাজসিংহ : দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)।

বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রটিকে ইতিহাসানুগভাবেই চিত্রিত করেছেন। তাঁর কবি-কল্পনায় ভারতত্রাস আলমগীরের বল্লভার উপযুক্ত অভিমান, গরিমা ইতিহাস-স্বীকৃত মগ্যাসক্তি ইত্যাদি চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। রাজসিংহের অন্তঃপুরে উদিপুরীকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা বঙ্কিমের পরিণত শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

জেব-উন্নিসা

'রাজসিংহ' উপন্যাসে চরিত্রচিত্রায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু ঐতিহাসিক ভুলের প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন :

"যে মানুচী হইতে এই সংবাদ লওয়া হইয়াছে, তাহার গ্রন্থে জেব-উন্নিসার চরিত্রে কোন কলঙ্কপাত করা হয় নাই, তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী ফখ্‌র-উন্নিসার উপর এই দুর্নাম দেওয়া হইয়াছে।"[৪৯]

আচার্য সরকার তাঁর "Studies in Aurangzeb's Reign" গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে জেব-উন্নিসার চরিত্রটিকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস লিখতে বসেন নি, তিনি মূলতঃ ঔপন্যাসিক; ঐতিহাসিক উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রে কল্পনাগত কিছু স্বাধীনতা নেওয়া চলে। তা ছাড়া যেহেতু এই চরিত্রে ক্ষমতা এবং যৌবনমদমত্ততা নারীর হৃদয়ের জাগরণ ও গভীর বেদনাময় একটি পরিণতি দেখানো হয়েছে, সে-কারণে ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীর প্রামাণ্যতাই এর চরম লক্ষ্য নয়—এই চরিত্রের যথার্থ বিচার

৪৮। Rajasthan, vol. P-357. Todd.

৪৯। আচার্য যদুনাথ সরকার : ভূমিকা—রাজসিংহ (সাহিত্য-পরিষদ)

হৃদ্‌গত মূল্যে, জীবনশিল্পের কষ্টিপাথরে। চরিত্রের প্রারম্ভসূত্র এই :

"পিসী ভাইঝি (অর্থাৎ রোশনারা জেব-উন্নিসা) উভয়ে অনেক স্থলেই মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন।"[৫০] অবশ্য জেব-উন্নিসা কাহিনীর পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য লক্ষ্য করলে এই চরিত্রায়ণে ঐতিহাসিক প্রমাদ খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না।—

'মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কক্র বলেন, ইহার নাম ফকরুন্নিসা।'[৫১]

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তাঁর আহরিত উপকরণের সাহায্যে জেব-উন্নিসার একটি ইতিহাস-সম্মত চরিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন।

'জেব-উন্নিসা একজন প্রধান "Politician", তিনি মোগলসাম্রাজ্যের 'নিয়ামক নক্ষত্র' বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন।'[৫২]

এই বাদশাহজাদীর চরিত্র লেখক তাঁর নিজের কথায়ই ফুটিয়ে তুলেছেন—

"জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল—'বাদশাহজাদীর পাপ!'...... আল্লা এসকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।"[৫৩]

হয়তো এই পর্যন্ত ইতিহাস স্বীকৃত, কিন্তু মবারকের বধাজ্ঞায় ক্রমশঃ তাঁর আত্মচেতনার বোধন, যন্ত্রণার অগ্নিদাহ, রাজপুত অন্তঃপুরে মবারকের সঙ্গে মিলন এবং বিবাহের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের পরমস্বর্গের আস্বাদ—আর তারপরেই হিংসানাগিনী দরিয়ার গুলিতে মবারকের মৃত্যু হলে একান্ত দুর্ভাগিনী 'বসুধালিঙ্গণ ধূসরস্তনী বিললাপবিকীর্ণমূর্দ্ধজা'—জেব-উন্নিসার যে করুণতম চিত্র তারই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ জেব-উন্নিসার চরিত্র মোগল অন্তঃপুরের ভোগবিলাসসর্বস্ব নীতিধর্মবিহীন এক জাতীয় রমণীচরিত্রের প্রতীক একটি Symbol; অথবা এই চরিত্র কেবল

৫০। রাজসিংহ : ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৫১। রাজসিংহ পাদটীকা, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৫২। রাজসিংহ : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৫৩। রাজসিংহ : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

মোগল অন্তঃপুরেরই নয়, পৃথিবীর দেশে দেশে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এঁদের কাহিনী বিকীর্ণ। এঁদেরই অন্যতমা সম্রাট অশোকের বার্ধক্যে তরুণী ভার্যা 'তিস্যরক্ষিতা', ইংল্যাণ্ডের অদ্বিতীয়া রাণী 'ভার্জিন কুইন' এলিজাবেথ, রুশিয়ার বিদুষী প্রতাপান্বিতা সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ দি গ্রেট, এই সব প্রধান প্রধান চরিত্র ছাড়াও রাজঅন্তঃপুরে বহু নারীই নীতি-ধর্ম হৃদয়কে পদদলিত করে চক্রান্ত ও স্বেচ্ছাচারিতার হলাহল খনন করেছে—আর সেই স্ব-সৃষ্ট কালকূটের জ্বালায় যারা দগ্ধ হয়ে গেছে, জেব-উন্নিসা তাদেরই অন্যতমা।

'History of Aurangzeb' গ্রন্থ থেকে জেব-উন্নিসা সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু আহরিত হয়েছে।

"She seems to have inherited her father's keenness of intellect and literary tastes ...

Scandal connected her name with that of Aqilmana Khan, a noble of her father's court and a verifier of some repute in his own day."[৫৪]

অনুমান করা যেতে পারে এই অকিলমানা খানই রূপান্তরিতভাবে উপন্যাসে মবারক খাঁ নামে পরিচিত হয়েছেন।

মবারক আলি খাঁ

মবারক আলি মহাকাব্যোপম 'রাজসিংহ' উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট পার্শ্ব-চরিত্র। অওরংজেবের বীর ও স্বজাতিপ্রেমিক সেনাপতি মবারক মর্যাদার প্রেক্ষিতে কাহিনীর অন্যতর রাজকীয় নায়কদ্বয় অওরংজেব এবং রাজসিংহ অপেক্ষা অবশ্যই গৌণ। কিন্তু মনসবদার মবারক আলি খাঁ একাধারে বীর-রূপে, অন্যদিকে জেব-উন্নিসার প্রেমিকরূপে উপন্যাসে একটি অপূর্ব স্থান লাভ করেছেন। তাঁর চরিত্র দ্বন্দ্বসংঘাতে জটিল। দরিয়াবিবির ভালবাসায় তাঁর তৃপ্তি নেই, তিনি জেব-উন্নিসার লালসা-বহ্নিতে মৃত্যুকামী পতঙ্গ সম্রাটকন্যার হৃদয়বর্জিত মধুকরীচরিত্র সম্যক্ অবগত হয়েও তিনি আত্মনাশী মনোবেগ সংবরণ করতে পারেন না।

তারপর একদিন পাষাণে অগ্নি প্রবেশ করিল; জেব-উন্নিসার সুকঠিন দুঃখের ঘাতে নারীরূপে নবজন্ম লাভ করলেন—ক্ষণসুখের স্বর্গ রচিত হল

৫৪। History of Aurangzeb Vol. 1 Chap. IV pp 69-70.

মবারককে নিয়ে। কিন্তু মবারক জানতেন তাঁর পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তিনি অদৃষ্টের ক্রীড়নক। মবারকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক নিয়তি-তাড়িত পুরুষের জীবন-চিত্র দেখিয়েছেন—সর্বগুণান্বিত হয়েও যিনি চিরদুঃখ ও বঞ্চনার ললাটলিপির নিগড়বদ্ধ, গ্রীক ট্রাজিডির নায়কের মতো যার যাত্রাপথ ধূসর বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মবারক আলির চরিত্র কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গঠিত কিনা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। জেব-উন্নিসার প্রণয়ীরূপে অকিলমানা খাঁন-এর নাম আমরা ইতিহাসে পাই, অনুমান করা যেতে পারে এই অকিলমানা খাঁনের ছায়াতেই মবারক আলির চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে।

"Scandal connected her name with that of Aqilmana Khan, a noble of her father's court and a verifier of some repute in his own day."[৫৫]

নির্মলকুমারী

'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারী সখিরূপে এবং পরবর্তীকালে আলমগীরের অন্তঃপুরচারিণীর ভূমিকায় অঘটন-ঘটনা-পটিয়সীরূপে নির্মলকুমারী একটি অসাধারণ প্রাণবন্ত চরিত্র। এই ইমলি বেগম বা নির্মলকুমারীই আপাত পাষাণ অওরংজেবের অন্তরলোকে বেদনার উৎস মুক্ত করে দিয়েছিল।

ইতিহাসের 'চারুমতী' যেমন চঞ্চলকুমারীতে রূপায়িতা তেমনি নির্মলকুমারী মূলতঃ কল্পনাসম্ভূতা হলেও তারও একটি ক্ষীণ প্রেরণা ইতিহাসে আছে মনে হয়। দারার অন্যতমা পত্নী 'রাণাদিল' অওরংজেবের পরম বাঞ্ছিতা ছিলেন, কিন্তু কোনো প্রলোভন, কোনো ভীতিই রাণাদিলকে অওরংজেবের অনুরাগিনী করতে পারে নি। দুর্জয় আলমগীরও এই নারীকে সারাজীবন শ্রদ্ধা করেছেন, সম্মান করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে গভীর একটি ভালবাসা অন্তরে বহন করেছেন। এই চরিত্রের পরিচয় ঐতিহাসিক মানুচ্চি এইভাবে দিয়েছেন:

"Aurangzeb sent for the two second wives of Dara that is to say, the inconstant Udipuri, a Georgian by race, and the faithful Ranadil · a Hindu by birth ··

······But the brave Ranadil went into her apartments and

৫৫। History of Aurangzeb Vol. 1 Chap. IV pp 69-70.

taking a knife, slashed her face all over, and collecting the blood in a cloth, sent it to Aurangzeb, saying that if he saught the beauty of her face it was undone, and if her blood gratified him he was welcome. Encountering such resolution Aurangzeb ceased his solicitations, yielding high esteem to her, and treating her with the courtesy, deserved by her Constancy."[৫৬]

যোধপুরী বেগম

অওরংজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরদুহিতা, রাজপুতকন্যা। কারো কারো মতে উদিপুরী নন, ইনিই রাজকুমার কামবক্সের (সম্রাটের পঞ্চম পুত্র) জননী। "Kam-Buksh (Son of Jodhpuri, not Udipuri.)"[৫৭]

উপন্যাসে এই চরিত্রটির কিছু গুরুত্ব আছে। ধর্মান্ধ আলমগীরের অন্তঃপুরে আর কোন রাজপুতকন্যাকে অবমাননা স্বীকার করতে না হয়, এইজন্য দেবী নামিকা হিন্দু পরিচারিকার সাহায্যে তিনি চঞ্চলকুমারীকে নিজ প্রাণ বিনাশের পরামর্শ দান করেন, অথবা রাজসিংহের আশ্রয় নিতে বলেন। নির্মলকুমারী এই যোধপুরী বেগমের কাছেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। গিরিসংকটে বন্দী অওরংজেবের পুরনারীরা যখন রাজসিংহের অন্তঃপুরে নীতা হন, তখন যোধপুরীকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

চরিত্রটি গভীর এবং তেজোদীপ্ত। অবস্থাচক্রে মোগলের অবরোধচারিণী হলেও রাজপুত-ললনারা যে আত্মমর্যাদা হারাতেন না এবং নিজ গৌরবে উন্নতশীর্ষে বিরাজ করতেন, যোধপুরীর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেইটিই দেখাতে চেয়েছেন।

যোধপুরী বেগমের অওরংজেবের মহিষী হবার কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —"মোগল বাদশাহেরা যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী আওরংজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আকবর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ

৫৬। Storia do Mogor, Vol. 1 p 361, Manucci (Translated by William Irvine pp 107-8)

৫৭। Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan.

করার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। আওরংজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।"[৫৮]

ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আগত কয়েকটি চরিত্র

হাসান আলি খাঁ

হাসান আলি খাঁ মনসবদার বাদশাহ অওরংজেবের একজন সুদক্ষ সেনাপতি। রূপনগর থেকে চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনবার অভিযানে ইনি ছিলেন অন্যতর সেনাপতি। উদয়পুরের পর্বতাকীর্ণ গিরিপথে যখন মোগল সৈন্য পর্বতোপরে অদৃশ্য রাজপুতগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের অনুচর মাণিকলাল কর্তৃক অপহৃত হন তখন হাসান আলি খাঁ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে শিলাখণ্ডের আঘাতে বিভ্রান্ত সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। পরে মবারক আলি খাঁ ও হাসান আলি খাঁর মিলিত চেষ্টায় মাত্র পঞ্চাশজন রাজপুতসহ রাজসিংহ যখন মোগলের কামানের মুখে রন্ধ্রপথে বন্দী, তখন সুকৌশলী মাণিকলাল হাসান আলি খাঁর নাম করেই বিক্রমসিংহের কাছ থেকে দুহাজার সৈন্য এনে হাসান আলির এবং মবারকের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ ক'রে মোগলসৈন্যকে বিভ্রান্ত করে দিল।

"Seven thousand picked troops under Hassan Ali Khan marched from Pur, ravaging Mewar and clearing a way for the main Mughal Army. The Rajputs could make no stand against the excellent Mughal artillary served by Europeans··· Hassan Ali entered the hills north-west of Udaipur and inflicted a defeat on the Maharana (1st Feb, 1680) capturing his camp and much property"[৫৯]

দুর্গাদাস

বিখ্যাত মারবাড়ী যোদ্ধা ও ভাগ্যান্বেষী। যুবরাজ আকবরকে সহায়তা দিয়েছিলেন। অওরংজেবকে বার বার বিব্রত করেছেন। পরিশেষে অওরংজেব

৫৮। রাজসিংহ : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৫৯। (Aurangzib) The Cambridge History of India (Vol. IV). pp 248-249.

কর্তৃক সমাদৃত ও সম্মানিত হন। ১৬৮৭ সালের পর দুর্গাদাস অজিত সিংহের সঙ্গে মিলিতভাবে রাজপুত্রের জাতীয় শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করে অওরংজেবের বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম ক'রে তাঁকে বিপর্যস্ত করেছেন, মাঝে মাঝে বশ্যতাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু রাঠোর জাতির এই বীর নেতার স্বাধীনচিত্ত আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

"In 1690 Durga Das routed the new Governor of Ajmer and continued to plunder and disturb the parts of Marwar in Mughal occupation" (pp-303)

...Durga Das was rewarded (by Aurangzeb) by being taken into imperial service."[৬০] (P. 303)

বাদশাপুত্র আজিম খাঁ

মোহম্মদ আজম, অওরংজেবের তৃতীয় পুত্র, অওরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণের যে সংগ্রাম আরম্ভ হয় তাতে শাহ্ আলম (অওরংজেবের দ্বিতীয় পুত্র মোয়াজ্জেম) তাঁকে ১৭০৭ সালে জাজৌয়ের যুদ্ধে হত্যা করেন।[৬১]

আকবর (রাজপুত্র)

"ঔরংজেবের চতুর্থ পুত্র। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন—কিন্তু ধূর্ত পিতার চক্রান্তে ব্যর্থ হন। পরিশেষে ১৬৮৮ সালে পারস্যে পলায়ন করেন। ১৭০৪ সালে পারস্যে মৃত্যু হয়।"[৬২]

অওরংজেবের রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে, 'রাজপুত্র আজম' এবং 'আকবর'—উভয়কেই বাদশাহ্ নিয়োজিত করেছিলেন।

"At these signal instances of Akbar's incapacity, the emperor transferred him to Marwar, and gave the Chitor command to Prince Azam. The plan of war adopted now was to penetrate into the Mewar hills in three columns: from the eastern or Chitor side by way of the Deobari pass and Udaipur under Azam;

৬০। The Cambridge History of India. pp 303-304.

৬১। V. Smith, The Oxford History of India, Book VI. Chap. VII.

৬২। Smith, Book VI. Chap. II.

from the west of Marwar side through the Deosuri pass under Akbar."[৬৩] pp.249.

রাজা যশোবন্ত সিংহ

ইনি মারোয়ারের (যোধপুরের) বিখ্যাত বীর রাজা, সাজাহানের অন্যতম সেনাপতি। সাজাহানের পুত্রদের সিংহাসন অধিকারের যুদ্ধে প্রথমে দারা শিকোর পক্ষাবলম্বী ছিলেন, পরে অর্থলোভে অওরংজেবের দলভুক্ত হন। তিনি এবং অওরংজেবের পুত্র কুমার মোয়াজ্জেম বিপুল অর্থের বিনিময়ে শিবাজীকে 'রাজা' খেতাব লাভে সাহায্য করেন। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের ব্যর্থতা অওরংজেবের কোপদৃষ্টিতে পড়ে, ফলে তিনি সুদূর কাবুল অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র জায়গীরদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ সালে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। টড এবং মানুচ্চি বলেন অওরংজেবই বিষপ্রয়োগে তাঁকে বধ করিয়েছিলেন।

যশোবন্তের বিধবা-পত্নী

যশোবন্তের মৃত্যুর পর কুচক্রী অওরংজেব, যশোবন্তের বিধবা মহিষী এবং শিশুপুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করবার চেষ্টা করেন। রাজপুতবীর দুর্গাদাস অসীম বীরত্বে তাঁদের সেই চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করেন। নিরুপায় যশোবন্ত-মহিষী সপুত্র মেবারের রাজা রাজসিংহের আশ্রয় নেন—এবং মেবার ও মাড়োয়ারের সঙ্গে মোগলের সংগ্রাম আরম্ভ হয়।[৬০] [পৃষ্ঠা ৪৩৮ দ্রষ্টব্য (Smith)]

জয়সিংহ

অম্বরপতি মানসিংহের ভ্রাতুষ্পত্র, অওরংজেবের সেনাপতি। কুমার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় শিবাজী অওরংজেবের সভায় আনীত হন। ১৬৬৭ সালে নিজপুত্র কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের কিছু অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্য :

[গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা কৃত 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস,' দুসরী জিলদ্। ৫৬৭-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

অওরংজেবের সঙ্গে রাজসিংহের যুদ্ধপ্রসঙ্গে কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন লেখক। কাহিনীর সঙ্গে এই চরিত্রগুলির বিশেষ যোগ নেই।

৬৩। The Cambridge History of India.

৬৪। Smith : Mahamadan Period.

কুমার ভীমসিংহ, কুমার জয়সিংহ, সুবল দাস (সাঁবল দাস), রোহিলা খাঁ (রুহিল্লা), রাঠোর গোপীনাথ ও বিক্রম সোলাঙ্কী, আজম শাহ্, দিলীর খাঁ, বিখ্যাত মাড়বাড়ী দুর্গাদাস।

"আবার স্বয়ং ঔরংজেব রাজসিংহের সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন।··· রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বাড়ী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরংজেবকে আক্রমণ করিলেন।···

ঔরংজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন।—সুবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সৈন্যস্থাপন করিলেন। আবার আহার-বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রোহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরংজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন।

···পরাভূত হইয়া খাঁ রোহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুটপাট করলেন।···

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ্·········মালবে মুসলমানের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন।·········

দয়াল শাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহাজাদা আজিমকে পাকড়াও করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।"[৬৫]

ক। কুমার ভীমসিংহ: ···রাজসিংহ: ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"মহারাণা কা দুসরা কুঁবর ভীমসিংহ পহাড়োঁ সে নিকাল্ কর উসমে পড়া, জিস্‌নে দোনো পক্ষো কি বহুত্ হানি হুই।" (পৃষ্ঠা ৫৬৫)···মুসলমানো নে মেবার মেঁ মন্দির তোড়ে থে, জিস্‌কা বদলা লেনে কে লিয়ে কুঁবর ভীমসিংহ কো উস্‌নে গুজরাট ভেজা" (পৃঃ ৫৬৭)

খ। কুমার জয়সিংহ: ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'মহারাণা জয়সিংহ শান্তিপ্রিয়, দানী, ধর্মনিষ্ঠ আউর উদার থে। বহ ভী

৬৫। রাজসিংহ: ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

কুছ সময় তক বাদশাহ্ অওরংজেব সে লড়ে, পরন্তু অপনে পিতা জৈসা বীর ন হোনে কে কারণ অন্ত মেঁ উসনে সন্ধি কর লী।' (পৃঃ ৫২৫)

গ। দয়ালদাস : রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ। জয়সিংহ ও মন্ত্রী দয়াল দাস (দয়াল শাহ) এর কীর্তি—

'দেবমন্দিরোঁ কো গিরানে কে বদলে মেঁ এক বড়ী মস্‌জিদ ঔর তিনসৌ ছোটী মস্‌জিদোঁ কো তোর কর্ বহ লৌট্ আয়ে। ইসী তরহ মন্ত্রী দয়ালদাস কো সসৈন্য মালবে পর ভেজা। উসনে কই স্থানোঁ সে পেশকশ যা দণ্ড লিয়া, কই জগহ থানে বিঠায়ে, কই স্থানোঁ কো লূটা, কই মস্‌জিদৈ গিরাই ঔর বহ কই ঊঁট সোনে সে ভর কঁর লে আয়া।' (পৃঃ ৫৬৭)

ঘ। রাঠোর : সুবলদাস : সাঁবল দাস :—৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

ঙ। খাঁ রোহিলা (রুহিল্লা খাঁ) : ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

'জব ঔরংজেব মেবাড় সে আজমের চলে গয়েঁ তব্ মহারাণা নে রাঠোর সাঁবল দাস (বন্দর কা) কো সসৈন্য বন্দর পর ভেজা, জঁহা শাহী সেনাপতি রুহিল্লা খাঁ ১২০০০ সবারোঁ সমেত ঠহরা হুয়া থা। সাঁবলদাস নে জাতে হী উসপর এসা ভীষণ আক্রমণ কিয়া কি শত্রুসেনা রাতোঁ রাত অপনা সারা সামান ছোড়্‌কর ভাগ নিকলী ঔর বাদশাহ কে পাস আজমের পহুঁচী।' (পৃঃ ৫৬৮)।

চ। গোপীনাথ রাঠোর : রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

ছ। বিক্রম সোলাঙ্কি : রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

'জব আকবর চিত্তোর কো ছোড়কর নাড়োল মেঁ ঠহরে, উস সময় কুঁবর ভীমসিংহ নে রাঠোর গোপীনাথ (ঘাণোরাব কা) ঔর সোলংকী বিক্রম (বীকা রূপনগর কা) সহিত দেসূরী কে ঘাট কো পার কর ঘাণেরা কে পাস আকবর ঔর তহব্বর খাঁ কী ১২০০০ সেনা সে বড়া যুদ্ধ কিয়া, জিসমেঁ উক্ত দোনোঁ সরদারোঁ নে বড়ী বীরতা দিখাই আউর শত্রু কা খজানা আদি লূট লিয়া। এসী দশা দেখ্‌কর বাদশাহ নে মহারাণা সে সুলহ কী বাতচীত শুরু কী, পরন্তু দৈববশাত উসী সময় মহারাণা কা দেহান্ত্ হো গয়া।' [(পৃঃ ৫৬৯) 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস' গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা।]

৮

বিক্রম সোলাঙ্কি ৮

ইনি 'রাজসিংহ' উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকায় আছেন।

টীকা: বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপনগরের বিক্রম সোলাঙ্কীকে নায়িকা চঞ্চলকুমারীর পিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিক্রম সোলাঙ্কী (বা বীকা সোলাঙ্কী) ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও রাজসিংহের সঙ্গে যে কন্যার বিবাহ হয়েছে তিনি কিশনগড়ের স্বর্গীয় রাজা রূপসিংহের কন্যা, তাঁর নাম চারুমতী, এ আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রান্তির দায়িত্ব বস্তুতঃ কর্ণেল টডের।

তৃতীয় পর্ব

বঙ্কিম-সাহিত্যে নিসর্গ

প্রকৃতি ও বঙ্কিম-সাহিত্য

বাঙালীর কবিপ্রাণে প্রকৃতি স্মরণাতীত কাল থেকে নিশ্চয় দোলা জাগিয়ে এসেছে। নদীমাতৃক এই দেশের একদিকে বিশাল ধূসর পদ্মা আর একদিকে নীলনয়না ময়ূরাক্ষী। বিস্তৃত বনভূমিতে বঙ্গোপসাগর থেকে তরাই পর্যন্ত অরণ্যলক্ষ্মীর ঐশ্বর্যময় রূপ। আম, জাম, নিম, নারিকেল, সুপারির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য মহাকায় বট, অশ্বত্থের স্নিগ্ধছায়াছত্র, লতায় গুল্মে, বনজ এবং গৃহজ পুষ্পে বর্ণের সুষমা। তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রে অফুরন্ত শ্যামলের বিস্তার। দোয়েল, শ্যামা, কোকিল, পাপিয়ার কাকলীতে বাংলার আকাশ ঝঙ্কৃত। এই দেশের ঋতুবৈচিত্র্য এর আর এক সম্পদ। ছয়টি ঋতুর এমন সুস্পষ্ট কালবিভাগ ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি বোধ হয় দেখা যায় না। গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং মেঘগর্জিত কালবৈশাখী, বর্ষার ধারাসম্পাত, শরতের কাশফুল ও কলহংস, হেমন্তের শস্যসম্ভার, শীতের কুহেলী এবং বসন্তের বর্ণবৈচিত্র্য পুষ্পসুরভিত সমারোহ সবই বাংলাদেশে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এই শ্যামল সজল বর্ণাঢ্য মৃত্তিকায় লালিত বাঙালী স্বভাবতঃই প্রকৃতিমুগ্ধ, তার আবেগপ্রবণ হৃদয়ে চিরকাল নিসর্গসঙ্গীতের অনুরণন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেও আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং নৈসর্গিক প্রভাবের প্রস্ফুটন দেখতে পাই।

সুদূর অতীতে প্রকৃতির আহ্বানে বাঙালীর হৃদয় কিভাবে সাড়া দিয়েছিল আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য থেকেই প্রকৃতির সৌন্দর্যসত্তা বাংলা সাহিত্যে অনুভব করা যায়। 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্' 'নীপকদম্ববাসিত কুঞ্জকুটীর', 'আন্দোলিত ললিত নবঙ্গলতা', 'সতিমির পুঞ্জরজনী', জয়দেবের কাব্যের বিরহমিলনে অপূর্ব সুরব্যঞ্জনা বিস্তার করে দিয়েছে। অপূর্ব ভাষায় এবং সুরঝঙ্কারে বসন্তের বর্ণনা দিচ্ছেন—

পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী :

> 'মদন-মহীপতি-কনক-দন্তরুচি কেসর-কুসুম-বিকাশে
> মিলিত-শিলীমুখ-পাটলিপটলকৃত-স্মরতূণ-বিলাসে—'[১]

এরই প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণবকবিতায় যেখানে—

১। শ্রীগীতগোবিন্দ : সামোদ-দামোদর : ১ম সর্গ, শ্লোক : ৪, পৃঃ ২২।

'ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া,
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচতো মাতিয়া
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।'

অথবা—

'শারদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চমতান
কুলবতি চিত চোরণি॥'[২]

বৈষ্ণবসাহিত্যের সমগ্র অধ্যাত্মব্যঞ্জনা সত্ত্বেও তার পূর্বরাগ, অভিসার, মাথুর অথবা মহারাস সর্বত্রই প্রকৃতি যেন সৌন্দর্যের একটি অনিবার্য প্রেক্ষাপট রচনা করে রেখেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণবকবিতার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ, পরবর্তী বাংলা কাব্যের রোম্যান্টিক ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বৈষ্ণবসাহিত্যের পার্শ্বপ্রবাহরূপে যে মঙ্গলকাব্য বাংলাসাহিত্যে বিকশিত হয়েছিল প্রকৃতি সেখানেও অনুপস্থিত নয়। মুকুন্দরামের ফুল্লরা বা খুল্লনার বারমাস্যা তাদের বেদনার সঙ্গে প্রকৃতিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে নিয়েছে।

'অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥

২। গোবিন্দদাস: শরৎকালীন মহারাস।

পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন ॥
... ...
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল।
... ...
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
... ...
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদলা
নদনদী একাকার আটদিকে জল ॥'[৩]

মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কলিঙ্গদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্রটি একেবারে বাস্তবধর্মী :

'মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার ॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর্ দুর্ ॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারিমেঘে বরিষে মুষল ধারে জল ॥
... ...
ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত ॥
চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তাড়কা বাজ
কারিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা ॥[৪]

এসব ছাড়াও বাঙালীর লোকসাহিত্যে প্রাসঙ্গিক প্রকৃতিবর্ণনা বহুস্থলেই অতি সুন্দর হয়ে উঠেছে, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ-গীতিকা, ভাটিয়ালি ও

৩। 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' : কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কবি মুকুন্দরাম।
৪। 'কলিঙ্গদেশে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ' : কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কবি মুকুন্দরাম।

বাউলের গান, সর্বক্ষেত্রেই বাঙালীর কবিমন প্রকৃতিকে স্মরণ করেছে, তাই নিছক তত্ত্বমূলক বাউলের গানেও আমরা অসাধারণ প্রকৃতিচিত্র দেখতে পাই—

'পরাণ আমার স্রোতের দীয়া
গুরু ভাসাইলা কোন ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার
মধ্যে আন্ধার ঢালা
তারই মাঝে কেবল বাজে লহরীর মালা॥'

এর মধ্যে কেবল প্রকৃতির চিত্রই নেই, এ যেন রোম্যাণ্টিক কালের অনুভাবনায় আর একটি বিশিষ্ট ভাবচেতনায় মণ্ডিত হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মহুয়া', 'মলুয়া'র গানে দেখি প্রকৃতি তার ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে। 'গভীর নিশীথে মহুয়ার সঙ্গে নদ্যার ঠাকুরের পুনর্মিলন' পর্বে বসন্তের আগমন বিচ্ছেদব্যাকুল নায়ক-নায়িকাকে উতলা করেছে—

ফাল্গুন মাস চলা যায় রে চৈত্র মাস আসে।
সোনার কুইল কু ডাকে, বইস্যা গাছে গাছে॥
আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া
মধ্যরাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া।
... ...
আসমানের চৈতার বউ ডাকে ঘনে ঘন।'[৫]

'হুমরা বেদে'র বাসস্থান বর্ণনায় নিসর্গপটভূমি—

'উত্তর্যা না গারো পাহাড়া ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পরবত।
হিমানী পরবত পারে তাহারই উত্তর
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর।
চান্দ সুরয নাই আন্ধারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে, মাইনসের নাই লরাচরা॥'[৬]

'মলুয়া'র একটি দুর্যোগ সম্ভাবনার চিত্র, পুত্রের আশঙ্কা—

৫। 'মৈমনসিংহ গীতিকা': মহুয়া, শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত

৬। 'মৈমনসিংহ গীতিকা': মহুয়া।

'কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিঙ্কি পড়ে ঠাটা
আভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে।'

। মলুয়া। ২। পথে॥

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সারিগান থেকে সংগৃহীত নিম্নোক্ত নৌকাবাইচের গানটিতে একটি নিসর্গচিত্র পাই—

'উজানমুখে চালাও তরী দরিয়ায়।
ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠেছে রে
লাওয়ের বাদাম দিলে তায়।
(হারে) বাউরী বাতাস লাগে আইস্যা
কালাপানীর গায়
লাওয়ের বাদাম নিলে তায়।'[১]

বৈষ্ণবকবিতা, মঙ্গলকাব্য লোকসাহিত্য, ভারতচন্দ্র, অথবা কবিগান প্রকৃতি একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় এদের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে প্রবাহিত হয়ে এলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিসর্গসম্বন্ধীয় যে বিশেষদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য মনোভঙ্গিসঞ্জাত।

যে রোম্যান্টিক কাব্য আন্দোলন ফরাসী দার্শনিক রুসোর চিন্তাধারার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যকে আলোড়িত করে তোলে তার প্রধান বক্তব্যই ছিল প্রকৃতিমুখিতা। নিসর্গের অন্তরালেই যে মানুষের সুখসমৃদ্ধি ও মানসবিকাশ সর্বতোভাবে সম্ভবপর রুসো একথা বিশ্বাস করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এরই ফলে ফরাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যের কবিদের চিন্তায় যেন যুগান্তর ঘটে যায়। কোলরীজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রণ, স্কট প্রভৃতির কবিতায় প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে ওঠে। সে কেবল পটভূমি মাত্র নয়, চিত্ররূপিণীও নয়, মানবজীবনে সে কখনও সজীব সঙ্গিনী। (যেমন— ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রুথ—Ruth) কখনও তার স্নেহময়ী ধাত্রী। (যেমন Wordsworth-এর "Education of Nature".) কখনও জীবনদেবতার রুদ্রবাণী (যেমন শেলীর 'Ode to the West Wind) কখনো বা মহতোপি

১। বাংলার লোকসাহিত্য : ৩য় খণ্ড, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

মহীয়ানের প্রতীক (যেমন শেলীর Monte Blank) ; এইজন্যই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির পাশাপাশি মানবজীবনকে অতি ক্লেদাক্ত বলে মনে করেন—

"What Man has made of Man".

এবং শেলী তাঁর বল্লভাকে বলেন—

"Away, Away from men and towns."

ইংরেজি এবং ফরাসী সাহিত্যের এই নব আন্দোলন মধুসূদনকেও কিছুটা স্পর্শ করেছিল। কিন্তু 'নবক্লাসিকে'র অনুরাগ, মধুসূদন রোম্যান্টিকদের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি-স্পন্দনকে ততটা আত্মস্থ করেন নি, তাই 'ব্রজাঙ্গনা' অবকাশ সত্ত্বেও বৈষ্ণবকবিতার অনুকৃতিমুখ্য, এবং মহৎ গম্ভীরের মৃদঙ্গ শঙ্খধ্বনিতে মেঘনাদবধ মুখরিত, বীরাঙ্গনা ঝঙ্কৃত।

আত্মকেন্দ্রিক বিহারীলাল এই পাশ্চাত্য প্রকৃতিচেতনাকে অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত মানসিকতার জন্য এই ক্ষেত্রে তাঁর শক্তির উপযুক্ত সমুন্নতি ঘটে নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমামণ্ডিত এবং আলঙ্কারিক প্রথাসিদ্ধ প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার সুরধ্বনি এবং রোম্যান্টিক উপলব্ধির পরিপূর্ণ সমন্বয় রবিরশ্মিতে সংহত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে নিজহস্তে বরমাল্য পরিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশের বহুপূর্বেই পাশ্চাত্যের এই নবীন প্রকৃতি-বোধ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অধ্যায়ের শীর্ষবাণীরূপে এই রোম্যান্টিক কবিদের উদ্ধৃতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, কীটস্‌ এবং বায়রণ ; শেক্‌স্‌পীয়র, মধুসূদন ইত্যাদির সঙ্গে সমভাবে অবস্থান করেছেন এবং বিশেষভাবে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই উদ্ধৃতিগুলির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রকৃতিবর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই অল্পবিস্তর আছে। রোম্যান্টিক কবিরা প্রকৃতির মধ্যে প্রাণসত্তা বারে বারে আবিষ্কার করেছেন, কখনও তাকে দেখেছেন রহস্যময়ী বিশ্বশক্তিরূপে, কখনও দেখেছেন চিরানন্দের উৎসরূপে, কখনও প্রকৃতি তাঁদের কাছে জীবনের ধাত্রীরূপা হয়ে প্রকটিতা হয়েছেন, আবার কখনও এক ভয়াল ভয়ঙ্কর মহিমায় তাঁরা নিসর্গকে উপলব্ধি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিও এইরকম বিচিত্ররূপিণী কখনও তার সৌন্দর্যের লীলাবিকাশ, কখনও সংশ্লিষ্ট নরনারীর জীবনদ্বন্দ্বের সে অন্যতমা চরিত্র,

কখনও বা নিষ্ঠুরা ভয়ঙ্করী—যেমন চন্দ্রশেখরে ৩য় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের উন্মাদিনীপ্রায় শৈবলিনীর ঝঞ্ঝাবৃষ্টিতাড়িত উপত্যকায় পরিভ্রমণের সময় বঙ্কিমের এক অপূর্ব অনুভূতি—

'তুমি জড় প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী। তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণী! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্র কিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকতবালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক-যুবতিকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি! তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি, কোটি প্রণাম।'[৮]

কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রকৃতি যেন সর্বময়ী হয়ে দেখা দিয়েছে, এর মধ্যে একাধারে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিসর্গসম্বন্ধীয় অতীন্দ্রিয়-চেতনা, শেলীর সৌন্দর্যমুগ্ধতা এবং বায়রণের বিশাল ভয়ঙ্করের প্রতি আকর্ষণ সব যেন একাঙ্কে সমন্বিত হয়েছে। অথচ অন্তঃলোকে প্রকৃতি চির-উদাসিনী। জীবনের মধ্যে অবস্থান করেও সে সুদূর মানববন্ধনের মধ্যেও গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীটির মত দূর পর্বতশিখর থেকে তার যাত্রা এবং অজ্ঞাত মোহনায় তার নিজস্ব গতিপথ। উপন্যাসের নামচরিত্র কপালকুণ্ডলা এই মূর্তিমতী প্রকৃতি—বনাকীর্ণ সমুদ্রতীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে তার আবির্ভাব, সপ্তগ্রামের অমাবস্যার শ্মশানে তামসী গঙ্গায় তার অন্তর্ধান। এই উদয়বিলয়ের লীলায় পল্লীপ্রান্তবাহিনী নদীটির মতই কপালকুণ্ডলা জীবনের তটভূমি স্পর্শ করেও জীবনের কাছে ধরা দেয় নি—তার উৎস কুহেলিময় ভাগ্যশিখরে, তার মোহানা কলনাদিনী তামসী জাহ্নবীতে।

৮। চন্দ্রশেখর : ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

অতিপ্রাকৃত উপকরণ, ঐতিহাসিক উপাদান, আবর্তিত ঘটনাচক্র অথবা বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন ইত্যাদি সবকিছু সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির কাব্য। এর পূর্বাপর শেলীর ভাষায়—

"The magic touch of Nature's Art."

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একাধারে জাত ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক, অন্যদিকে তিনি কবিও বটেন। তাঁর অল্পবয়সের কাব্যসম্ভারে কখনও প্রকৃতির আনন্দিত আরতির কখনও ললিতার কাহিনীতে—অভিশপ্ত দৈবকাননের কাল-রাত্রির ভয়ালতা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতি সৌন্দর্যময়ী ও রহস্যময়ী ও করালীরূপে বারে বারে প্রতিভাত হয়েছে এবং এই ত্রয়ী 'কপালকুণ্ডলা'য় ত্রিবেণী রচনা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদানগুলি আমরা এইবার কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করব। এইগুলির উপযোগিতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে সাহিত্যমূলক বিচার আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু চরিত্রবিকাশের প্রয়োজনে, পটভূমিরচনার দাবিতে, অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ বিশেষ নাট্যমুহূর্ত রচনায় এই প্রাকৃতিক উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই মাত্র আমরা নির্দেশ করে যাব।

নদী

নদীকে বলা উচিত বাংলার প্রকৃতির কণ্ঠহার। বাঙালীর প্রধান মৃত্তিকাংশ নদীসম্ভব—নদীকে কেন্দ্র করে তার দিনচর্যা, তার ইতিহাস, তার ঐতিহ্য, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি। অতীতের বাঙালীর শৌর্যবীর্য নদীকল্লোলেই যেন ধ্বনিত হয়েছে—গাঙ্গেয় সমতটের এই বীরসন্তানদের অভিনন্দন জানিয়ে 'রঘুবংশে' কালিদাস বলেছেন 'বঙ্গানুৎখান্ তরসো নেতা নৌসাধনোদ্যতাম্'।[১]

বাংলার গৌরব মহানাবিক বুধগুপ্ত। বাংলার রাজা বরুণছত্রধারী, নিশানে তাঁর মীনাঙ্কচিহ্নিত।

এই তটিনী-সম্ভূত এবং তটিনীলালিত বাঙালীর চরিত্রও যেন স্রোতোধর্মী। চিরকালই সে বেগবান এবং চঞ্চল—'মনুসংহিতা'র শাসন, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, আর্যসংস্কৃতির বাঁধ তার গতিপথকে রুদ্ধ করে দিতে পারেনি। নদীতীরের বেতবনের মত 'বেতসীবৃত্তি' তার চরিত্রধর্ম তাকে খুব সহজেই নমনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু যখন বিপরীত দিক থেকে তার প্রতিঘাত আসে—তখন তার শক্তির যথার্থ পরিচয় মেলে।

নদীতীরের স্নিগ্ধ কোমল মৃত্তিকা দিয়ে যেন বাঙালী গঠিত, কিন্তু রৌদ্রতাপে এই মৃত্তিকাই সুকঠিন হয়ে ওঠে। বাঙালী কঠোরে কোমলে গড়া। একদিকে তার মাধুর্য রূপায়িত হয় পল্লীর প্রান্তবাহিনী কলনাদিনী 'চিত্রা'য়, অন্য দিকে তার শক্তির দীপ্তরূপ দেখা দেয় কালবৈশাখীর পদ্মার গর্জনে।

স্বভাবতঃই বাংলা সাহিত্যে নদী এক অসামান্য ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। দেশে নদীর অভাব নেই। নদীমালিকা বঙ্গভূমিকে অলঙ্কৃত করেছে পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয় ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ দুটি নদীকেই বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বহু নদীর নামোল্লেখ আছে—দামোদর, রূপনারায়ণ, বল্লুকা, সরস্বতী ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ দুটি নদীকে আশ্রয় করেই ছুটে চলেছে, তাদের একটি গঙ্গা, অপরটি (যমুনা) ব্রহ্মপুত্র। সাহিত্যে পদ্মানদীও এদের অন্যতম।

১। রঘুবংশম্ : চতুর্থ সর্গ, ৩৬।

অবশ্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যে যমুনানদীর বিশিষ্ট ও বহুল প্রয়োগ আছে। বাস্তবার্থে যমুনা বাংলাদেশের নদী না হলেও বাঙালী কবিগণের কল্পনা তাকে বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। এই যমুনা উত্তরবঙ্গের যমুনা নয়—এই যমুনা উত্তরভারতবাহিনী—ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গমূল ছুঁয়ে যে প্রয়াগে এসে গঙ্গাধারায় মিলিত হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে রয়েছে মথুরা-বৃন্দাবন—যেখানে চির-কিশোরের রসলীলা, কেশী-কংস-সংহার, কালীয়দমন এবং শ্রীরাধার অশ্রুপাতে যেখানে যমুনা ফেনোচ্ছ্বসিত। যমুনা বাংলাদেশে নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম বাঙালীরই সম্পদ, বৃন্দাবন বাঙালীরই আবিষ্কার, যমুনার নীলধারা শত শত ক্রোশ দূর থেকেও বাঙালীর হৃদয়ে বহমান।

বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর স্থানীয় নাম যমুনা সত্য, কিন্তু যমুনা শব্দটি শুনবামাত্র তার মনে যে নদীর চিত্র জেগে ওঠে তার যথার্থ স্থান বাংলার মানচিত্রে নয়, বাঙালীর মানসচিত্রে। জয়দেব থেকে যদি বাংলা-কাব্যের সূত্রপাত ধরা যায়, তাহলে সেখানে আমরা যমুনার কলোচ্ছ্বাসই শুনতে পাই সর্বাগ্রে।

'ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।'[২]

তারপর বৈষ্ণবপদাবলী। শ্রীরাধার পূর্বরাগ-অভিসার-মিলন-বিরহ যমুনার কালো স্রোতের সঙ্গে মিশে তাকে চিরকালের এক কাব্য-প্রবাহিনীতে পরিণত করেছে। বাংলা সাহিত্যে যমুনা অনন্যা। এই যমুনাতেই রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাস: 'শ্রীহরি, আমারে কর পার।' এই যমুনার জলে বিম্বিত সূর্যালোক দেখেই শ্রীমতীর মনে হয়—

যেন শ্যামশরীরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বনমালা আর কস্তুভের দীপ্তি:

'যমুনার জল করে ঝলমল,
ইথে কি পরাণ রয়।'

কখনো বা কালিন্দীতীরে শ্যামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর রাধা পরিতাপ করছেন:

২। গীতগোবিন্দ: ষষ্ঠ সর্গ: ২য় শ্লোক।

'সই, কেন গেলাম যমুনারি জলে
নন্দের নন্দন কানু, করেতে মোহন বেণু
ব্যাধদলে কদম্বেরি তলে।'

অথবা-

'যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী,
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি।'

এই যমুনাতটেই নবীনা কিশোরী শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়হরণ করেছেন :

'ও ধনী কে কহ বটে,
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর—'

যমুনার তীরেই আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন :

'কালিন্দীর কূলে নবনীপমূলে
বাসর রচিলা ধনী।'

আর অভিসারের দুঃখরাত্রিতে যখন—

'ঘন ঘন ঝনঝন বজর-নিপাত'

তখন—

'হরি রহু মানস-সুরধুনী পার।'

তারই প্রতিধ্বনি করেন বর্তমানকালের 'ভানুসিংহ' :

'উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ'—

আর রবীন্দ্রনাথ জানেন :

'এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে,
এখনো প্রেমের খেলা
সারাদিন সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।'

এই যমুনা নদী, তার তীরবর্তী-কুঞ্জকানন, তমালবন এবং বিকশিত কদম্বরাজি—এই উপকরণগুলি মাত্র পদাবলীর প্রাসঙ্গিক অলঙ্করণরূপেই ব্যবহৃত হয়নি; এদের মধ্যে নদীমাতৃক দেশের কবির তটিনীপ্রীতিই সমধিক প্রকটিত হয়েছে। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বেদনার নিয়ত সাক্ষ্য ও সহচর তার নদীপ্রবাহসমূহ। তার 'মঙ্গলকাব্যে' নদী, নদীর স্রোতেই তার ভাটিয়ালী গান, জলপ্রবাহে তার মঙ্গলদীপ ভাসিয়ে দেওয়া, নদীর ধারাতেই তার চিতাভস্মের সিন্ধুযাত্রা।

আর গঙ্গা।

বাঙালী গাঙ্গেয়। তার সর্বোত্তম কামনা গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গানীরে পাপ-মোচন, মৃত্যুকালে এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল, গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া ভস্ম, গঙ্গার গভীরে দগ্ধাস্থির চিরশান্তিলাভ। তার মাঝির কণ্ঠে শোনা যায় সেই আকাঙ্ক্ষার গান :

'সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে।'

গঙ্গার প্রকাশ বাংলাসাহিত্যের অন্যত্র। গঙ্গার মোক্ষময়ী মূর্তি বাঙালীর শৈবচিন্তায়—শাক্তপদাবলীতে, আমরা শুনতে পাই সাধকের কণ্ঠে : 'অন্তে গঙ্গাজলে, জিহ্বা যেন কালী কালী বলে'। চিরকালের বাঙালীর অন্তিম আকাঙ্ক্ষাই বুঝি এই :

'অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধ-অঙ্গ থাকবে স্থলে
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী
কেহ বা কর্ণকুহরে বলবে কালী উচ্চৈঃস্বরে
কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালী।'
—দাশরথি রায়।

এই ঐতিহ্য অনিবার্যভাবেই বঙ্কিমের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালীর চিন্তায় ও জীবনচর্যায় দুটি নদীর ভূমিকা মুখ্য—একটি যমুনা তার কল্পলোকের সঙ্গিনী; এই যমুনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অপর নদীটি গঙ্গা—'গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্যুতাম্'—। গঙ্গা বাঙালীর প্রাণপ্রবাহিনী, তার মৃত্তিকার আদি-ধাত্রী, গঙ্গার তীরে বাঙালীর জীবন ও ঐতিহ্যের বিকাশ :

'গঙ্গাস্রোতঃতুস্তরেষু' সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবাসীর অন্তিমকামনা—'জীবন ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।'

বঙ্কিমচন্দ্র এই 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির'ই সন্তান। তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে নানাপর্যায়ে তাই জাহ্নবীর বহুবিচিত্র কলতান আমরা শুনতে পাই।

প্রকৃতিমুগ্ধ কবি বঙ্কিমচন্দ্র নদীকে তাঁর সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। গঙ্গা তাঁর (কাঁটালপাড়া) গ্রামের প্রান্তবাহিনী, তার বিপুল জলধারার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়; ছাত্র-জীবনে এই গঙ্গা পাড়ি দিয়ে তিনি হুগলী কলেজে পড়তে গিয়েছেন; কত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, কত দিন-রাত্রির আলো-অন্ধকার-জ্যোৎস্নার প্লাবনে বঙ্কিমের কল্পনাসচেতন তরুণ মন এই কল্লোলিত জাহ্নবী ধারায় মগ্ন হয়েছে। কত সন্ধ্যায় দূর পারের পেরঁ (Perron) সাহেবের শ্বেত প্রাসাদের চূড়ায়* সন্ধ্যার রক্তরাগ ফুটেছে—এ পারের শিবমন্দিরে উঠেছে শঙ্খধ্বনি, মাথার ওপর গাং-চিলের কলধ্বনি নৌকাযাত্রী তরুণ বঙ্কিমকে হয়তো 'ললিতা ও মানসের' ভাবলোকে নিয়ে গিয়েছে।

প্রকৃতি কল্পনাকে মুক্তি দেয়; বঙ্কিমচন্দ্রের নবোন্মেষিত অনুভবেও 'চিরকলতান উদার গঙ্গার' প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই গঙ্গার কত উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাই। বিষবৃক্ষে যে নদীটির চিত্রময় বর্ণনা আছে, তা নিঃসন্দেহে গঙ্গা; 'ইন্দিরা'য় এই গঙ্গার আর একরূপ—তার 'বিশালহৃদয়ের' দিকে তাকিয়ে ইন্দিরা কিছুক্ষণের জন্য নিজের পরম দুর্ভাগ্যকেও ভুলতে পেরেছে—'গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্তজন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়।... গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্তনয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।'[৩]

ইন্দিরা আরও শুনেছে প্রাণভরে দুটি কচিকণ্ঠের গান—

'ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল।'[৪]

* হুগলী মহসীন কলেজ।

৩। ইন্দিরা: ৫ম পরিচ্ছেদ।

৪। ইন্দিরা: ৫ম পরিচ্ছেদ

অন্যত্র 'কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে' মজ্জমানা রজনী এক পরমসুন্দর স্বপ্নময় তৈলচিত্রে পর্যবসিত হয়েছে। 'সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথায় উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী'।[৫]

আর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গঙ্গা তো একটি নিয়ন্ত্রীশক্তি—Dominating factor. গঙ্গার জলেই শৈবলিনীর প্রেমের প্রথম অঞ্জলি অর্পিত হয়েছে, আবার গঙ্গাজলে তার বাসনার তিলাঞ্জলিও বটে।

'শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।'[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসাবলীতে বহু নদীর উল্লেখ এবং প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে। লক্ষণীয় যে সব ক্ষেত্রে এই নদনদী মাত্র বর্ণনাগত বা ভৌগোলিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তারা কাহিনীকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। 'চন্দ্রশেখরে'র গঙ্গার মতোই 'দেবীচৌধুরাণী'র তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীকে স্মরণ করা যেতে পারে; তিস্তার ঝড় এবং সেই ঝঞ্ঝার উল্লাসে উন্মত্তা রাজহংসীর মতো দেবীর বজরার দুর্জয় গতি—সেই সঙ্গে অদ্ভুত নাটকীয়তার বিস্তার—বাংলাসাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশের মহান্ ঔপন্যাসিক কর্মসূত্রে নানাস্থান পরিক্রমা করেছেন। সেই সূত্রে এসেছে দামোদর, বিরূপা, চিত্রা, সুবর্ণরেখা এবং আরো অনেকে। বঙ্কিমচন্দ্র ভৌগোলিক সত্যতা অটুট রেখে কাহিনীর প্রয়োজনে তাদের বিভিন্নভাবে সমন্বিত করেছেন এবং সেই সমন্বয় তার রসসৃষ্টির অক্ষয় নৈপুণ্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

দুর্গেশনন্দিনী: আমোদর নদ:

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নদীর ভূমিকা খুব মুখ্য নয়। গড় মান্দারণকে পরিবেষ্টন করে আমোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রে এই নদ পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মত খ্যাতিমান নয়। স্বল্পতোয়া আমোদর দুর্গেশনন্দিনীর একটি ভীরু এবং কোমল অংশে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে।

৫। রজনী: ৪র্থ খণ্ড' ৫ম পরিচ্ছেদ।

৬। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গড় মান্দারণের দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা যদিও মূলতঃ রাজপুতনন্দিনী তথাপি বাংলাদেশে বাস করবার ফলে তার চরিত্রে বাঙালী মেয়ের স্নিগ্ধ পেলবতা ও ভীরুতা সঞ্চারিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পল্লীবাহিনী আমোদর তার মৃদু জলধারা এবং জ্যোৎস্নাখচিত স্নিগ্ধ সন্ধ্যাটি তিলোত্তমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র ১ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা এক কক্ষ বাতায়নে তিলোত্তমাকে চিত্রার্পিতার মত দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মগ্ন দৃষ্টি দুর্গের পার্শ্ব-বাহিনী আমোদরের সান্ধ্যসলিলে: সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বর প্রতিবিম্ব স্রোতস্বতী জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল, নদী-পারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবরসকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল ;......আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর স্পর্শশীতল নৈদাঘবায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।'[৭]

ষোড়শী তিলোত্তমার পূর্বরাগের অনিশ্চয়তা এই কলোচ্ছলা নদী এবং আলো-অন্ধকার বিজড়িত সন্ধ্যার সৌন্দর্যে অপূর্বভাবে সমন্বিত হয়েছে, সমস্তটিই যেন একটি অভিরাম চিত্রপট। কাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ না করেও এই ব্যঞ্জনাটুকুর জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র আমোদরের এই পটভূমি-টুকু ব্যবহার করেছেন।

এই উপন্যাসে দ্বিতীয় নদী সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত নয়। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে মাত্র। এবং এই উল্লেখ নিতান্তই ভৌগোলিক। দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দারুকেশ্বর উল্লিখিত। যুদ্ধশেষে তিলোত্তমার শুশ্রূষারত জগৎসিংহের সৈন্যদল দারুকেশ্বর তীরে অপেক্ষমান।

কপালকুণ্ডলা: গঙ্গা: রসুলপুর নদী: সুবর্ণরেখা নদী:

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সূচনায় নদী, সমাপ্তিতে নদী। কাহিনীর সূত্র-পাতেই গঙ্গাসাগরের মোহনায় কুয়াসায় দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রীবাহী তরণী যেন নিয়তির স্রোতে এক অনির্দেশ্য পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। কুজ্ঝটিকার অবসানে আলোকাভ্যাগম ঘটলেও এই দিগ্‌বিস্তীর্ণা রহস্যময়ী নদী কোনো

৭। দুর্গেশনন্দিনী: ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

আশা আশ্বাসের তটে নৌকাযাত্রীদের উত্তীর্ণ করে নি। এক অপরিচিত অরণ্যময় উপকূলে আরও গভীর অনিশ্চয়তা এবং অলৌকিক-প্রায় এক পরিবেশের মধ্যে নায়ককে সঞ্চালিত করেছে। এই অসামান্য পটভূমিতেই যেন অদৃশ্য বিধাতার নিরুপায় ক্রীড়নকের মত নবকুমার ভবিষ্যতের অন্ধকারে অগ্রসর হয়ে গেছে।

নায়িকা কপালকুণ্ডলা অবশ্য আবির্ভূত হয়েছে সমুদ্রতীরে কিন্তু এই সমুদ্র বঙ্কিমবর্ণিত রসুলপুরের নদীর সঙ্গে একাত্ম। কপালকুণ্ডলা নদীনিয়ন্ত্রিত এই পরিবেশের মধ্যে যেন সুইনবার্ণের আফ্রোদিতের মত অভ্যুদিতা, যে একসঙ্গে মৃত্যু আর আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এনেছে :

"When a wonder, worlds delight,
A perilous goddess was born ;
And the waves of the sea as she came
Clove, and the foam at her feet,
Fawning rejoiced to bring forth,
A fleshly blossom, a flame".[৮]

এই নায়িকা ভাগ্যরূপিণী নদীরই দানরূপে "Evil Blossom"-এর মতই নবকুমারের জীবনে বিকশিত হয়েছিল।

উপন্যাসের মধ্যভাগে নদী আর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকায় উপস্থিত নেই। মৃতস্রোতা সরস্বতীর একটি বিবরণ আছে, কিন্তু সেটি মাত্র সপ্তগ্রামের ভৌগোলিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। নবকুমারের গৃহের নিকটবর্তী খালের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু তাও প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র।

কিন্তু নদী আবার তার করালমূর্তি নিয়ে ফিরে এসেছে উপন্যাসের শেষ অংশে। ঈর্ষাবিষে জর্জরিত শনিগ্রহরূপী কাপালিকের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং কারণবারির মত্ততা বিকারগ্রস্ত নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা হননে উত্তেজিত করেছে। তখন সম্মুখে নিবিড় অন্ধকারে কল্লোলিতা খরধারা গঙ্গা, মহাকালীর খড়্গের মত তার শাণিত স্রোত, অবিরত বায়ুসংঘাতে উপকূলচ্যুত মৃত্তিকাখণ্ডের জলমধ্যে পতনশব্দ ; পশ্চাতের শ্মশানে পরিত্যক্ত শব ও অস্থিকঙ্কাল এবং মহাকালীর পূজার আয়োজন। এই বিচিত্র পটভূমিতেই কপালকুণ্ডলা

৮। Atlanta in Calydon—Swinburne.

গঙ্গার প্রবল জলধারার অন্তরালে অদৃশ্য হলেন, যেন করালী নিজ খড়্গেই তাঁর বলি গ্রহণ করলেন। সমগ্র উপন্যাসে কাপালিক এবং কালীর যে প্রভাব বিকীর্ণ হয়েছে এই অংশে তা একটি চরমরূপ ধরলেও নদীই এখানে আবার পরিণামনিয়ন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে রহস্যময় জলধারা কপালকুণ্ডলাকে ফেনোদ্ভবা আফ্রোদিতের মতো সন্ধ্যার স্বর্গলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, সেই জলরাশিই তরঙ্গের অন্ধকার বাহুবিস্তার করে সেই স্বর্ণপ্রতিমাকে আপন বক্ষে পুনরাকর্ষণ করে নিল। এই উপন্যাসে নিছক বর্ণনা হিসাবেও রসুলপুরের নদী এবং গঙ্গার সৌন্দর্য অসাধারণ। আমরা প্রথম অংশ থেকে এই বর্ণনাশক্তির কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। 'আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।'[৯]

এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে রসুলপুরের নদী বঙ্কিমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপন্যাসে পুনস্পৃষ্ট হয়েছে। তরুণ বঙ্কিম যখন কর্ম-সূত্রে নেগুঁয়ায় অবস্থিত ছিলেন তখন এই নদীতীরস্থ বনভূমি এবং বালিয়াড়ি তাঁর অতি সন্নিকটেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপন্যাসে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন :

'সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কয়েকযোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে।...এই সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। স্তূপতলে সামান্য বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে।'[১০]

অন্যত্র—

'ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল ......অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল

৯। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

১০। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্যপশু রব।'[১১]

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শেষাংশে ত্রিবেণীর গঙ্গার একটি তৎকালীন বর্ণনা আছে। গঙ্গা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মাবধি পরিচিত। এই পুণ্যস্রোতার বক্ষে বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপান্তর রাত্রি-দিবা-আলো-অন্ধকার-জ্যোৎস্না-বর্ষা বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী মহাশ্মশানের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। অতএব শেষাংশের নিশ্চন্দ্রতমসায় ভয়াল শ্মশানের পার্শ্ববাহিনী তিমিরময়ী গঙ্গার যে করালীরূপ চিত্রিত হয়েছে তা তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিচিতির ফলেই এমন অনায়াস শিল্পসৌন্দর্য লাভ করেছে।

মৃণালিনী : গঙ্গা : যমুনা :

'মৃণালিনী' উপন্যাসের সূত্রপাতেই যেন 'মৃণালিনী' কাহিনীর অন্তর্গত মূল প্রবাহটি সংকেতিত হয়েছে।

'একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃটদিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃটকাল, কিন্তু মেঘ নাই……বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা-যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা; যৌবনে পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গতসাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল।'[১২]

'মৃণালিনী' উপন্যাসের সূত্রপাতেই গঙ্গা ও যমুনার উদ্দাম জলস্রোত এবং সেই স্রোতে ভাসমান তরীর আরোহী হেমচন্দ্র। এই দ্বি-ধারাকে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর দুটি মিলনোন্মুখ আবেগতীব্র হৃদয়ের সঙ্গে উপমিত করা যায়।

এ ছাড়া রাজ্যচ্যুত হেমচন্দ্র গৌড়ে তুর্কীর আগমন ও বঙ্গবিজয়ের যে ঐতিহাসিক প্লাবন-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন—এই বর্ণনাকে তারও প্রতীকরূপে নির্ণয় করা চলে।

কাহিনীর সূচনা ত্রিবেণী সঙ্গমে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর এই মিলন উপন্যাসেও যেন এইভাবে সাধিত হয়েছে :

সমকালীন ইতিহাসের বিপুলপ্রবাহ : গঙ্গা। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রেম :

১১। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

১২। মৃণালিনী : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

যমুনা। পশুপতির পত্নী মনোরমার আন্তর-রহস্য : লুপ্তধারা সরস্বতী।

গঙ্গার বাস্তব উপযোগিতা ও রূপশ্রীর পরিচয়ও আমরা উপন্যাসে পাই। হেমচন্দ্রের দর্শনলাভের নিশ্চয়তাহীন প্রত্যাশায় মৃণালিনী গঙ্গার বুকে তরী ভাসালেন। তাঁর সহায় একমাত্র ভিখারিণী গিরিজায়া আর অন্তরের দুর্জয় প্রেম এবং আশ্রয় এই গঙ্গা—

'সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল—সভামণ্ডলে পরিচারক হস্তজ্বালিতা দীপমালার ন্যায়। আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায় নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল।'[১৩]

গঙ্গাকেন্দ্রিতা প্রকৃতির একটি সান্ধ্যশ্রীও এই বর্ণনায় আমরা পরিস্ফুট দেখতে পাই।

অন্যত্র—গৌড়াধিপের ধর্মাধিকার পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতার চরম প্রায়শ্চিত্ত করলেন মৃত্যুর মধ্যে। তারপর চিতাশয্যা, পশুপতির মৃতদেহ, মনোরমার সহমরণ প্রস্তুতি। গঙ্গা তেমনি প্রসন্নপ্রবাহিনী, তার তীরে ভাগ্যবিড়ম্বিত দুটি দুর্ভাগ্য হৃদয়ের চিতানলে চরম পরিসমাপ্তি ঘটল।

যমুনা নদী মৃণালিনীর কাহিনীকে অনেকাংশে গ্রথিত করেছে। মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে যমুনায় জলবিহার করতে গিয়ে মৃণালিনী নিমজ্জিতা হয়েছিলেন। তারপর যমুনার স্রোতই তাঁকে হেমচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেয়। এই সংযোগ থেকেই তাঁদের প্রণয় ও পরিণয়। ব্রতী হেমচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী মৃণালিনীকে কৌশলে হরণ করে এই যমুনাতীরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন গুরু মাধবাচার্য। তারপর বিবিধ দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে কাহিনীর শাখাপল্লব বিস্তার, নবদ্বীপে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের পূর্বে হেমচন্দ্র মৃণালিনী পরস্পরের কাছে বিদায়গ্রহণ করেছিলেন এই যমুনার তীরেই।

'যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিলসন্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া চঞ্চলতরঙ্গশিরে নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে

১৩। মৃণালিনী : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন...'[১৪]

এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার জীবনকে মিলনে, বিচ্ছেদে যমুনা অপূর্বভাবে গ্রথিত করেছে।

বিষবৃক্ষ : গঙ্গা :

লক্ষ্য করবার মতো বঙ্কিমচন্দ্রের পর পর তিনখানি উপন্যাসই নৌকাযাত্রা এবং নদীপ্রবাহের দ্বারা সূচিত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় 'রসুলপুরের নদী', 'মৃণালিনী'তে প্রয়াগের যমুনা, 'বিষবৃক্ষে' অনামা বিশালা তটিনী—লক্ষণদৃষ্টে অনুমান করা যায়, গঙ্গা। তিনটি ক্ষেত্রেই নদীস্রোত কাহিনীপ্রবাহের প্রতীক, চরিত্রগুলি সেই প্রবাহে ভাসমান। 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াসাচ্ছন্ন নদী নবকুমারকে 'Strange and beautiful' এর এক অপূর্ব রোম্যান্টিক জগতে নিয়ে গেছে। মৃণালিনীর খরস্রোতা যমুনা প্রবল বেগময়ী একটি কাহিনীকে সংকেতিত করেছে, আর 'বিষবৃক্ষের' ঝড়তুফান নায়ক নগেন্দ্রদত্তর জীবনে প্রত্যাসন্ন দুর্বিপাকের মুখবন্ধ রচনা করে দিয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা'র নদী দিগ্‌ভ্রান্তকারী কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে অপরিচিত অরণ্যতট, বিভীষিকামূর্তি কাপালিক এবং সৌন্দর্যের চকিত-বিস্ময়রূপা 'কপালকুণ্ডলা' এক অনন্য পৃথিবীতে নবকুমারকে পৌছে দিয়ে তার জীবনকে এক অভাবনীয় পথে পরিচালিত করেছে। 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে এই সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এখানেও আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি নগেন্দ্র দত্তকে এক অপরিচিত বনময় গ্রামপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে, নিঃশব্দে দাঁড় করিয়েছে জীর্ণ অট্টালিকার অভ্যন্তরে স্তিমিত দীপালোকিত এক মৃত্যুশয্যার বিভ্রান্ত দর্শকরূপে। এই পটভূমিতে কুন্দনন্দিনীর কৈশোর সৌন্দর্যের প্রথম সন্দর্শন এবং পরিবেশের বিশিষ্টতা নবকুমারের কপালকুণ্ডলা দর্শনের মতোই পাঠকের চেতনাকে চকিত করে।

'বিষবৃক্ষে'র নদীযাত্রা ও ঝড়বৃষ্টি নিঃসন্দেহে আগামী দুর্দিনের প্রতীক। কিন্তু এই অংশটির নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে। গঙ্গাতীরবাসী বঙ্কিমচন্দ্র, নগেন্দ্রদত্তের নদীপথবর্ণনায় কাহিনীর দ্রুততার প্রয়োজন বিস্মৃত হয়ে নিজের আনন্দেই নদী ও নদীতীরে কৌতুকময় এবং জীবন্ত চিত্ররচনা করেছেন। এই চিত্রধর্মী বিবৃতির আধিক্য মূলকাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য নয়, বঙ্কিমের বাস্তবদৃষ্টি এবং চিত্রণনৈপুণ্যই এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

১৪। মৃণালিনী : ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত, অনন্ত, ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে, কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও······বিরাজ করিতেছেন।······আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমিস্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোটলোক কাদা ঘাটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে, আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর্ হটর্ করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না, তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।'[১৫]

অনুরূপ এবং সম্ভবতঃ আরও পরিণত নদীপথের বিবরণ 'ইন্দিরা'য় আছে। আমরা যথাস্থানে তা নির্দেশ করব।

এছাড়া পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে নগেন্দ্র দত্ত যখন কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সেখানে গঙ্গাবক্ষে প্রতিবিম্বিত আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদমালার উল্লেখ আছে। কিন্তু কাশীর রূপবর্ণনাই সেখানে মুখ্য, গঙ্গা প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র।

চন্দ্রশেখর : গঙ্গা :

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গঙ্গা কাহিনীর প্রাণ-ধমনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জীবদেহে প্রবাহিত শোণিতধারার মতো গঙ্গা-তরঙ্গ উপন্যাসের শিরায় শিরায় প্রান্তে প্রান্তে সঞ্চালিত হয়ে তাকে সজীব ও সক্রিয় রেখেছে। গঙ্গার বিস্তৃত বক্ষেই বাল্য-প্রণয়ের প্রথম বিম্বন, ব্যর্থ-প্রেমের আত্মদহন, এই নদীই চন্দ্রশেখরকে বিচিত্র লীলায় প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের ঘাটে ভাসিয়ে এনেছে, আবার এই কলস্রোতে শৈবলিনীর অদৃষ্টদেবতা অনির্দেশ তরণী ছেড়ে দিয়েছেন, এই গঙ্গাবক্ষে সেই ইতিহাসের কল্লোল ধ্বনিত হয়েছে, এরই জলে বহু রক্ত

১৫। বিষবৃক্ষ : ১ম পরিচ্ছেদ।

নির্ঝরিত হয়েছে; পরিশেষে 'নীল আগুনের মতো' জ্যোৎস্নাঝলকিত জাহ্নবী-ধারা শৈবলিনীর শেষ প্রত্যাশাটুকুও তর্পণরূপে গ্রহণ করেছে।

গঙ্গার স্রোত যেন প্রতাপ এবং শৈবলিনী দুজনেরই জীবন-গতির প্রতীক। এক দুর্বার স্রোতোপ্রবাহে ভেসে চলেছে শৈবলিনী—সেই মৃত্যুযাত্রায় প্রতাপ-কেও সে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু প্রতাপ চায় শৈবলিনীকে বাঁচাতে, এই দারুণ বিভ্রান্তি থেকে ত্রাণ করতে, তাকে নবজীবনের তটে উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে। তাই গঙ্গাবক্ষে এই শপথের প্রয়োজন। ফলে বেদনার তটভূমিতে উদ্ধৃতা হয়ে শৈবলিনী নতুনভাবে গৃহজীবনে প্রবেশ করেছে আর কলকল গঙ্গাপ্রবাহ প্রতাপের জীবনকে টেনে নিয়ে গেছে 'অনন্তের' অভিমুখে, মৃত্যুর মহাসমুদ্রে।

'জীবন আমার স্রোতের দীয়া
গুরু ভাসাইলা কোন্ ঘাটে—'

'চন্দ্রশেখরে' গঙ্গা নদীকে মাত্র প্রাকৃতিক উপাদানরূপে নয়, কাহিনীর অন্তরতম নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপেই নির্দেশ করা উচিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বারুণী পুষ্করিণীও অনুরূপ গুরুত্ব দাবি করতে পারে।

অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের মতোই নদীর বর্ণনা দিয়েই 'চন্দ্রশেখর' সূচিত। প্রারম্ভ অংশটি চিত্রময়। একটি বালক ও বালিকা, আম্রকানন, সম্মুখে কলোচ্ছলা সন্ধ্যার গঙ্গা, আকাশে নক্ষত্রোদয়, পাপিয়ার ডাক:

'ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্যজলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্বাদল শয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল।......

...মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গসঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।'[১৬]

এই অংশটি সুন্দর, শান্ত ও চিত্রল। কিন্তু নিপুণ শিল্পী এই প্রশান্ত সৌন্দর্যের পটস্থাপন করেছেন আগামী দুর্যোগের contrast বা প্রেক্ষাভূমিরূপে। তাই গঙ্গার বুকে আরো কিছু জল প্রবাহিত হয়েছিল, বালক-বালিকা যৌবনে

১৬। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

পদার্পণ করলে, অকস্মাৎ উপলব্ধি করা যায়—'বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।'

অতঃপর প্রতাপ ও শৈবলিনীর নিরুপায় আত্মনিমজ্জন ছাড়া আর কী করণীয় আছে?

'প্রতাপ বলিল—

'শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।' শৈবলিনী বলিল 'আর কেন—এইখানেই।'

প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না।'[১৭]

শৈবলিনী মরতে পারল না। প্রতাপকে উদ্ধার করলেন উদারহৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর শর্মা। এই গঙ্গার বক্ষেই কাহিনীতে আর এক জটিলতার সূত্রপাত হল। শৈবলিনীর সৌন্দর্য দর্শনে সন্ন্যাসীপ্রতিম চন্দ্রশেখরের হৃদ্দৌর্বল্য উপস্থিত হল, তিনি গৃহজীবন কামনা করলেন। চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর বিবাহ ঘটল, কিন্তু অন্যগতপ্রাণা শৈবলিনী দেবোপম স্বামীকে ভালবাসতে পারল না; ঘটনাচক্রে যখন সে শয়তান ফর্স্টরের নৌকায় যাত্রিণী, আর অন্তরে তার 'প্রতাপপক্ষী ধরিবার' আকাঙ্ক্ষা তুষাগ্নির মত জ্বলছে—তখন গঙ্গার চলস্রোত তার ভাগ্যপ্রবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমের নিম্নোদ্ধৃত ভাবোক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

'প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহৃত হইতে লাগিল।······ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী-রাগিণীতে কানের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা, তরঙ্গসকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল··· ।'[১৮]

অংশটির তাৎপর্য গভীর। শৈবলিনীর হঠকারী দুঃসাহস এবং অসম্ভবের জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা যেন প্রথম প্রভাত-বায়ুর লীলাচ্ছলেই তাকে স্রোতে ভাসিয়েছিল। কিন্তু 'মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে'—এই মিথ্যার মোহ

১৭। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

১৮। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উষা-কুহেলির মত মিলিয়ে গেল। তারপরেই বাতাস প্রবল, তরঙ্গ উত্তরোল, শৈবলিনীর জীবনতরণী বাংলার ইতিহাসের এক দুর্যোগ-গর্জিত সিন্ধুমোহনায় সর্বনাশের মধ্যে গিয়ে পৌছল।

শৈবলিনীর নাট্যবৃত্তান্তে একটির পর একটি বিচিত্র দৃশ্য অভিনীত হয়েছে গঙ্গাবক্ষে। আমরা পর পর সেগুলি নির্দেশ করছি:

১। ফস্টরের নৌকায় যাত্রাপথে সুন্দরীর নাপিতানীবেশে আবির্ভাব, শৈবলিনীকে মুক্ত করবার চেষ্টা, শৈবলিনীর প্রত্যাখ্যান।

২। রামচরণ ও প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধার—ছোটোখাটো একটি যুদ্ধ;

৩। প্রতাপ ইংরেজের হাতে নৌকায় বন্দী, উন্মাদিনীরূপে শৈবলিনীর সুকৌশলে নৌকায় প্রবেশ।

৪। প্রতাপ এবং শৈবলিনীর পলায়ন—জ্যোৎস্নাঝলকিত রাত্রির গঙ্গায় পাশাপাশি সাঁতার দিতে শৈবলিনীর কাছ থেকে প্রতাপের সেই নিষ্ঠুরতম প্রতিশ্রুতি দাবি। শৈবলিনীর হৃদয় যেন এক মুহূর্তে সমস্ত অবলম্বন হারিয়ে এক অতলান্তে গিরিগহ্বরে আছড়ে পড়ল। তারপর:

'প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল, বলিল—'প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজ হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি। আজ হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজ হইতে শৈবলিনী মরিল।'[১৯]

একদিন প্রতাপ-শৈবলিনীর আত্মমজ্জনের প্রচেষ্টায় এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছিল, আজও সেই গঙ্গার জলেই আর একবার আত্মহননের পরিবেশ রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের বাধ্যতামূলক অবসান ঘটালেন—ধর্ম-নীতি-সমাজ এবং চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব এদের সম্মিলিত বিধানে এই দুরন্ত নারীর হৃৎপিণ্ড যেন সবলে উৎপাটিত করে নিলেন। এর পরেও কাহিনীর আরও অনেকখানি অংশ আছে, কিন্তু এইখানেই—'শৈবলিনী মরিল।'

এই সব অংশ ছাড়াও গঙ্গাবক্ষে নবাব-সৈন্য এবং ইংরেজের যুদ্ধ বর্ণনা আছে (৫ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়), দুর্ভাগিনী দলনীর নৌকাযাত্রা আছে,

১৯। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পঞ্চম খণ্ড, ২য় অধ্যায়) আর আছে জীবনে অসীম নৈরাশ্য, ভীতি এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে গঙ্গাতীরে দলনীর প্রহরযাপন ও পরিশেষে চন্দ্রশেখর কর্তৃক তার উদ্ধার :

'পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল,—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নব বারিপ্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত, ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভমধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোনদিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোনো দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুকুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদীপ্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী চলিল, নিকটে ঝিল্লীরব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহা ভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃতী পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।'[১৯ক]

এই অংশটিতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা ফস্টর-পরিত্যক্তা দলনীবেগমের আতঙ্ক ও অসহায়তা নির্জন এবং সান্ধ্যগঙ্গার পটভূমিতে অত্যন্ত গভীর এবং ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। অদৃষ্টরূপিণী গঙ্গার তরঙ্গে মীরকাশিম-মহিষীও আন্দোলিতা হয়েছেন।

তাই অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

'গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী

১৯ ক। চন্দ্রশেখর : ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্ত ; যত দূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট-দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে।'[২০]

রজনী : গঙ্গা :

রজনীর জীবনেও 'কলকল গঙ্গাপ্রবাহ' এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অন্ধ ফুলওয়ালীর এক অপূর্ব সুন্দর অথচ আকাশকুসুমের মতোই দুর্বলতম প্রেমকামনা চাঁপার স্বামী গোপালের হাত থেকে আত্মরক্ষার এক দুঃসাহসিক প্রয়াসে গঙ্গাকেই অবলম্বন করেছে। এই যাত্রায় রজনীর রক্ষক দুশ্চরিত্র পাষণ্ড হীরালাল। রজনীকে তার সঙ্গে বিবাহে প্রবৃত্ত করতে না পেরে হীরালাল তাকে গঙ্গার নির্জন চরে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

অতএব এখন মৃত্যু ছাড়া রজনীর আর কোন পথ নেই। শচীন্দ্র তার সাধনার ধন, তার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গসীমা ; কিন্তু মিলন অসম্ভব, সামাজিক অবস্থার ব্যবধান দুস্তর, অন্ধ রজনী 'বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ' ও ধ্বনির অধিকারী পুরুষোত্তম শচীন্দ্রনাথকে পাওয়া কল্পনাও করতে পারে না। অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে ? তবুও অন্তরের সুগোপন নিভৃতে 'Desire of the moth for the star.' এর যে দুরাশা মুকুলিত ছিল, আজ এই গঙ্গার নির্জন চরে দাঁড়িয়ে তা উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুতরাং চূড়ান্ত নৈরাশ্য নিয়ে রজনী গঙ্গার প্রবাহেই আত্মবিসর্জন করতে চলেছে :

'দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কানে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব। চিবুক ডুবিল ! অধর ডুবিল ! আর একটু মাত্র ! নাসিকা ডুবিল ! চক্ষু ডুবিল ! আমি ডুবিলাম !

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।'[২১]

কিন্তু রজনীর মৃত্যু হল না। একটি 'গহনার নৌকা' তাকে উদ্ধার করল। তবু তার বিপদ কাটল না। সে একজন ইতরজাতীয় দুর্বৃত্তের

২০। চন্দ্রশেখর : ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

২১। রজনী : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

যারা বনমধ্যে আক্রান্ত হল। ভাগ্যক্রমে তাকে রক্ষার জন্য সেখানে আবির্ভূত হলেন—অমরনাথ—গঙ্গার স্রোতঃপ্রবাহ রজনীর জীবনমঞ্চে আর এক নূতন অঙ্কের পটোন্মোচন করল।

কিন্তু রজনী উপন্যাসে গঙ্গার আসল সৌন্দর্য মজ্জমানা রজনীর, শচীন্দ্রের মানসলোকে একটি অপরূপ চিত্ররূপে অবস্থিতি। সন্ন্যাসীর যোগবল অথবা যাই হোক শচীন্দ্রের অবচেতনলোকে অন্ধ রজনীর যে রূপমূর্তি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল তা আকস্মিকভাবে তার চেতন-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে স্নায়বিক বিপর্যয় রচনা করে দিয়েছে। তারপর শচীন্দ্রের জ্বর-বিকার, তার আচ্ছন্ননিমগ্ন অন্তদৃষ্টি, মানস-চক্ষে মাত্র একটি উজ্জ্বলরূপ, চতুর্দিকে অবলুপ্ত বিশ্বের অন্ধকারে একতম দেবীমূর্তির জ্যোতির্বিকাশ :

'প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্বদিক প্রভাবিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী। রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে। অন্ধ! অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে—জলে নামিতেছে।······রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায় দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে ধীরে ধীরে ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনী! ধীরে! আমি দেখি তোমায়।

···আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম। তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী!···দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী···ঊর্ধ্বে চাহিলাম—ঊর্ধ্বেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশ বিহারিণী রজনী ধীরে ধীরে ধীরে নামিতেছে।[২২]

অংশটির কাব্যসৌন্দর্য যেমন অপরূপ, চিত্রসৌন্দর্যও তেমনি অসাধারণ। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বিলীন প্রায় দশমীর প্রতিমার মতো রজনীর আকণ্ঠমগ্ন রূপটি যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে একটি বর্ণাঢ্য তৈল চিত্র।

আর এই অদ্বিতীয় স্থির-চিত্রে গঙ্গার প্রবাহ সেই অতুলনীয় পটভূমি—যা না থাকলে এর সমস্ত সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যেত; যেমন দেবদারুদ্রুম-শোভিত

২২। রজনী : ৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

অলকানন্দার পরিবেষ্টনী ব্যতীত যোগীন্দ্র শঙ্করের মহাধ্যান পরিস্ফুট হয় না।

কৃষ্ণকান্তের উইল : চিত্রানদী :

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কাহিনীর খুব সামান্য অংশেই নদীর অবস্থান। গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের প্রমোদভবনের পাশ দিয়ে 'শীর্ণশরীরা চিত্রানদী' প্রবাহিত। চিত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব এ কাহিনীতে নেই কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব ভয়ঙ্কর। প্রবাহের পুষ্টতাহীন এই নদী সৌন্দর্যের ছদ্মবেশে অসুন্দরকে আবাহান করেছে এবং চিত্রানদীর তীরে একটি সন্ধ্যার কুৎসিত ছায়া গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডিকে নিষ্ঠুরতম করে তুলেছে। চিত্রা গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রমোদমধুর দিনগুলিকে মাদকতায় ভরিয়ে দিয়েছিল, প্রমোদভবনকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। 'ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর, প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে।……এখানে মনুষ্যসমাগম নাই……। একজন বাঙালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।…অশোক-বকুল-কুটজ-কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী, জাতি, মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী………যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষে দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে।'[২৩]

তারপর মূর্তিমান ন্যায়দণ্ডের মত এলেন ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের প্রেরিত নিশাকর। চমৎকার কৌশলের অবতারণা করে চিত্রার তীরে সন্ধ্যাবেলা অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। রোহিণীর ক্ষণিকের মতিভ্রম ঘটল। সে তার নিয়তির আহ্বানে চিত্রাতটে নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তখন অন্ধকারে : 'নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগালকুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে।………নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।'[২৪]…তার জীবনে চিত্রাতীরে এই যাত্রা মৃত্যু অভিসার। আকস্মিকভাবে মঞ্চে গোবিন্দলালের প্রবেশ। অর্ধপথে রোহিণীর কণ্ঠরোধ—তারপর কুঠিবাড়ীতে ফিরে গিয়ে এক নির্দয় হত্যাকাণ্ড।

২৩। কৃষ্ণকান্তের উইল—২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

২৪। কৃষ্ণকান্তের উইল—২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

চিত্রানদী 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অত্যন্ত স্বল্পস্থানই অধিকার করেছে। কিন্তু পরিবেশ রচনা এবং নাট্যিক প্রয়োজনে তারও কিছু গুরুত্ব এই উপন্যাসে আছে।

আনন্দমঠ : আরণ্য নদী

আনন্দমঠেও নদীর কিছু ভূমিকা আছে। তবে মূলকাহিনীর উপর নদীর বিশেষ প্রভাব নেই, কোন কোন অংশে মাত্র তা পাওয়া যায়।

আনন্দমঠের মূলমন্ত্র—

'বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

সুজলা বঙ্গভূমির পূজা আনন্দমঠের সন্তানদের সাধনা। ছায়াশীতল বঙ্গভূমির শ্যামশোভাকে এখানে পূর্ণতা দিয়েছে নদী। নদী আনন্দমঠে প্রকৃতির অংশ হিসেবে কাহিনীর আনুকূল্য করেছে।

'আনন্দারণ্য……একস্থানে অরণ্যপথ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল কল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মতো কালো, দুইপাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন।'[২৫]

নদীমেখলা বঙ্গমাতা যেন জলের কলতানের মধ্য দিয়ে সন্তানকে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানালেন। কল্যাণীর মনে পড়ে গেল অদ্ভুত স্বপ্ননির্দেশ, মহেন্দ্র সব শুনে স্তম্ভিত। তখন—

'তখন মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। ভৃঙ্গরাজ কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদুকল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদুপবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীলপর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুইজনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন।'[২৬]

২৫। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড : ১২শ পরিচ্ছেদ।

২৬। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড : ১২শ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর কল্যাণীর আত্মোৎসর্গ আর মুমূর্ষু কল্যাণী ও মহেন্দ্রের মিলিত-কণ্ঠে প্রথম মাতৃসেবাব্রতের মন্ত্র উচ্চারণ—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

এই পরমবেদনার মধ্যেই মহেন্দ্রের সন্তানধর্মে দীক্ষা ও কর্মসাধনার সূচনা।

অন্যতর ক্ষেত্রে আধুনিক অস্ত্রে শক্তিমান ইংরেজের সঙ্গে আত্মিক বীর্যে বলবান সন্তানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের রণভূমি—নদীশোভিত বাংলাদেশের এক বন-প্রকৃতি—আনন্দারণ্য। বর্ষার সেই ভরানদীর পরোক্ষপ্রভাবই সেদিন সন্তান-সেবার আত্মোৎসর্গকে বিজয়মালা দান করেছে।

দেশমাতৃকার সেবাব্রতে উৎসর্গিতপ্রাণ সন্তানসেনার কাহিনী আনন্দমঠ। তাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও রণপ্রচেষ্টার সহায়িকা নদীবনপ্রান্তর শোভিত বনপ্রকৃতি।

দেবী চৌধুরাণী : ত্রিস্রোতা নদী :

নদীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে প্রতিফলিত। নদীর স্বকীয় সৌন্দর্য বহু ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ত্রিস্রোতা নদীর একটি রূপময় চিত্র পাই। এই চিত্রের কেন্দ্রবর্তিনী ব্যক্তিত্বশালিনী এক অসামান্যা নারী।

'ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ।............ ত্রিস্রোতার উপরে কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা......বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। ...ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনি কূলে কূলে পূরিয়াছে।......জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে। নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী, সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিণী।'[২৭]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যকল্পনা ছাড়াও দেবী চৌধুরাণীর মহিমময় সৌন্দর্য ও রাজকীয় সাজসজ্জার সঙ্গে ত্রিস্রোতার আরোপিত ব্যক্তিত্বের একটি চমৎকার সমত্ব উপলব্ধি করেছেন লেখক :

'সেই নদীর মত সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা।...পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরামুক্তাখচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পারা, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন

২৭। দেবী চৌধরাণী : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

ঝিকিমিকি—এই শরীরেও তাই জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত সেই শুভ্র বসন, আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি চিকিমিকি —শুভ্রবসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি।

আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশ-রাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে। অঙ্গে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধিপূর্ণ গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে।'[২৮]

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই ত্রিস্রোতার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনেক উপন্যাসই নদীকেন্দ্রিক, নদী কখনো প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে কখনো বা পটভূমিরূপে উপস্থাপিত। নদীপ্রসঙ্গ ও নদীবর্ণনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই হয়েছে। অশান্ত তিস্তা হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমনে একটা বিশেষ ঝঙ্কার তুলেছিল। পরিপার্শ্বিকবর্জিত নদীপ্রকৃতির এমন একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা আর কোন উপন্যাসে নাই।

'বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর। একটু অন্ধকারমাখা পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষা-কালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সে তীব্রগতি নদী-জলের স্রোতের উপর স্রোতে, আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে, কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু ঝিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে; সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার...কূলে কূলে অসংখ্য কলকল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।'[২৯]

নারীর শক্তি ও ঐশ্বর্যের একটি পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমন্বয় ঘটেছে বঙ্কিম-চন্দ্রের মানসকন্যা দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে।

দেবীরাণীর শক্তির আকস্মিক ও দুর্জয় প্রকাশের মতো তিস্তারও এক প্রবল উদ্বোধন ঘটেছে তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদে। বিশ্বাসঘাতক হরবল্লভ ইংরেজ লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান সাহেবের গোয়েন্দা হয়ে দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে

২৮। দেবী চৌধুরাণী: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২৯। দেবী চৌধুরাণী: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

দিতে এসেছেন। সেই সময় অসাধারণ কৌশলে, সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে ইংরেজের পাইককে পরাজিত করে, সাহেব এবং হরবল্লভকে যখন দেবীরাণী বন্দী করেছেন—তখন তাঁর সহায়ক হয়েছে দুরন্ত ঝড় এবং সেই ঝটিকা তাড়িত তিস্তার প্রমত্ত স্রোত :

'কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উঠিয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সাথে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহীসেনা ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া পাল উড়াইয়া চলিল। লেফটেন্যান্ট সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষ-মধ্যে যুদ্ধ জয় হইল।'[৩০]

বাঙালীজাতি চিরকাল নৌ-যুদ্ধপারঙ্গম, কালিদাসের 'রঘুবংশে' আমরা তার বিবরণ পাই। এখানেও বজরার সাহায্যে বিনারক্তপাতে যুদ্ধজয়—এও যেন নৌ-সংগ্রাম পারদর্শিতার একটি অভিব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে রঘুবংশ থেকে রঘুর দিগ্বিজয়ের অংশটি স্মরণ করা যেতে পারে—

'বঙ্গানুৎখান তরসো নেতা নৌসাধনোদ্যতান্—
নিখচান্ জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোন্তরেষু।'[৩১]

সীতারাম : মধুমতী নদী : বিরূপা নদী : বৈতরণী নদী :

'মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি।'[৩২] ভূষণার পূর্বরাজ্যে মুসলমানের সঙ্গে হাঙ্গামার পর মধুমতীর তীরেই এসে রাজা সীতারাম তাঁর নূতন রাজ্য গঠন করেন এবং 'সীতারামের' পরবর্তী সমস্ত ঘটনা ও কাহিনীর অগ্রগতি এই মধুমতীর তীরস্থ রাজ্যে। মধ্যে মধ্যে দু-একটি বিশেষ ঘটনা এই নদীর তীরেই ঘটেছে ; নদী কখনও কখনও পটভূমিকার কাজ করেছে, বিশেষতঃ মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধে এর একটি সাময়িক গুরুত্বও রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে নদীর কোন নিবিড় যোগ নেই। কাহিনীকে তা নিয়ন্ত্রিত করেনি, তবে বৈতরণী ও বিরূপা নদীর এ কাহিনীতে বিশেষ ভূমিকা আছে।

'সীতারাম' উপন্যাসে চারটি নদী পাই, মধুমতী, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী ও

৩০। দেবী চৌধুরাণী : ৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৩১। রঘুবংশ : ৪র্থ, ৩৬ শ্লোক।

৩২। সীতারাম : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

বিরূপা। উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীকে তেমন প্রভাবিত না করলেও নায়িকা শ্রীর জীবনকে এই চারটি নদী একটি বিশেষ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাল্যে স্বামীপরিত্যক্তা শ্রী যৌবনে মধুমতীর তীরে বসে সীতারামের কাছ থেকে জানলেন, তাঁর নিদারুণ কোষ্ঠীফলের জন্যই তিনি পরিত্যক্তা। অন্য নদীটি 'খরস্রোতা'। এর কাহিনীগত তাৎপর্য বিশেষ নেই। এরই জলে শ্রীর সন্ন্যাসপূর্ব স্নান।

তারপর থেকেই শ্রী পলাতকা। বৈতরণীতীরে তাঁর আত্মসংলাপে তাঁর তৎকালীন যন্ত্রণার ছায়া—

'এই ত বৈতরণী। পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়। আমার জ্বালা জুড়াইবে কি ?''[৩৩]

'খরবাহিনী বৈতরণী সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীল-সলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে বাহিত হইতেছিল।'[৩৪] এই ব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যে শান্ত উদাসীনতা সে যেন শ্রীর ভবিষ্যতের ছায়া। এই বিশেষ মুহূর্তটিতেই শ্রীর জীবনে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর আবির্ভাব। উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে শ্রীক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীদের মাঝখানে। শ্রীর যন্ত্রণা জয়ন্তী অনুভব করে তাঁর জীবনের গতিমুখ পরিবর্তিত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। জয়ন্তী শ্রীকে সাময়িকভাবে সন্ন্যাসিনী সাজালেন। সন্ন্যাসিনীর সান্নিধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে পরবর্তীজীবনে শ্রী সত্যই সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন। স্বামী অনুরাগ ভগবদনুরাগে পরিণত হয়েছিল। সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর কাছে শ্রীর এই বৈতরণী তীরে সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মজীবনের একটি ঘটনার বিশেষ প্রভাব আছে। ঘটনাটি শ্রী শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমজীবনী' থেকেই উদ্ধৃত করা হল—

'বৈতরণীর খেয়াঘাটে নীত মৃতপ্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র আকস্মিকভাবে আগত তেজোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী কর্তৃক পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। এই সন্ন্যাসী পরে যাদবচন্দ্রকে বৈতরণীতীরে দীক্ষা দেন।'

৩৩। সীতারাম : ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

৩৪। সীতারাম : ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

বিরূপা নদীর তীরে সন্ন্যাসীর কাছে শ্রী জেনেছিল তাঁর নিদারুণ ভাগ্যলিপি সে প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হবে। সেই আশঙ্কাই তার অশান্ত আকুল প্রিয়সান্নিধ্য-কামনাকে স্তব্ধ করল, সীতারামের আহ্বানেও শ্রী সাড়া দিতে পারল না। অতঃপর বিরূপাতীরেই এল সন্ন্যাসীর পুনর্নির্দেশ—শ্রী এবং জয়ন্তী সীতারামের সাহায্যার্থে যাত্রা করল। ফলে শ্রীর প্রতি সীতারামের নিদারুণ মোহ রাজ্যের সর্বনাশ নিয়ে এল। রাজা সীতারাম রায়ের এই উত্থান ও পতনের ইতি-হাস নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পরিকল্পিত। তাঁর ভাগ্যের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রী শ্রী। মধুমতী, বৈতরণী, বিরূপা এই তিনটি নদী শ্রীর মানসিকতা, ভাগ্য ও জীবনধারাকে অদ্ভুত এক রহস্যের পথে চালিত করেছে। স্বামী সীতারাম শ্রীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণই শ্রীর ইতিবৃত্ত। নদীর সঙ্গে শ্রীর বালিকাজীবনেরও নিবিড় যোগ, বালিকার প্রথম স্বামীপূজা নদীর জলে—

'অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম।'[৩৫] ছোট গ্রামের ছোট নদীটির পানে পূজারতা ছোট বালিকাটি ভাগ্যের এক রহস্যময় পথপরিক্রমা করে কখন এক মহিমাময়ী সন্ন্যাসিনী শ্রী হয়ে বিশাল বিরূপার তীরে এসে দাঁড়িয়েছে—

'এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতাগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিল। কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে……' আর এই মহানদীর বিরাট রূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর প্রশ্নের উত্তরে সেই পূজাপরায়ণা প্রেমিকার উত্তরের কী বিপুল পরিবর্তন……'[৩৬] যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? —না, তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।'[৩৭]

৩৫। সীতারাম: ১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

৩৬। সীতারাম: ১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

৩৭। সীতারাম: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

ইন্দিরা : গঙ্গা :

'ইন্দিরা' উপন্যাসে গঙ্গার একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যরূপ পাই ইন্দিরার বর্ণনায়। নদী এখানে নায়িকার জীবনে ছায়াদায়িনী, আশাসঞ্চারিণী কিন্তু মূলকাহিনীকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। এই বর্ণনায় বাংলার নদীপ্রকৃতির একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। কালাদীঘির ডাকাতির পর সহায়সম্পদহীনা ইন্দিরা, জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় কৃষ্ণদাসবাবুর পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় যাত্রা করলেন। সেইসময় কলকাতায় যেতে যেতে গঙ্গার যেরূপ দর্শন করেছিলেন এ তারই বর্ণনা—

'আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্তজন্য সব ভুলিলাম, গঙ্গা প্রশস্তকায়। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ। ছোট ঢেউএর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি বহুদূর চক্ষু যায়, ততদূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী, জলে কতরকমের দাঁড়িমাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল, কতরকমের লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকতভূমি—তাতে কতপ্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্তনয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।'৩৮

গঙ্গা এখানে দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী, আশ্রয়দায়িনী ইন্দিরার সমগ্র ভবিষ্যতের সম্মুখে যখন একটা দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের পর্দা দুলছিল, তখন গঙ্গার সেই সীমাহীন জলরাশি, তার আশ্রয়দাত্রী, মমতার স্নিগ্ধ রূপের মধ্যে যেন ইন্দিরা একটি গভীর শান্তি পেলেন। তাছাড়া ইন্দিরা যে পারিবারিক সুখ ও প্রীতির অভিলাষিনী, দুটি ছোট মেয়ের মলপায়ে জল আনতে যাওয়া এবং তাদের গানটির মধ্যে সেই পারিবারিক জীবনের শান্তিময় সৌন্দর্য ধ্বনিত হয়েছে।

রাজসিংহ : পার্বত্য নদী :

রাজসিংহ উপন্যাসে নদীর কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে চঞ্চলা পার্বত্য নদী রাজসিংহ উপন্যাসের মহাকাব্যীয় গাম্ভীর্যের মধ্যে সৌন্দর্য আর সঙ্গীতের একটি স্নিগ্ধ কলতান সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেছে।

'পথিকেরা এক অনির্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই

৩৮। ইন্দিরা : ৫ম পরিচ্ছেদ।

পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিনী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে।'[৩৯]

অন্যত্র—

'তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীর সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু, এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণ ধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানেই রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।'[৪০]

এরই মধ্যে একখানি পত্র চঞ্চলকুমারীর, রাজসিংহের নিকটে রাজকুমারীর এই শরণাগতিই পরবর্তী ভারতব্যাপী সমরানল ও রাজসিংহ উপন্যাসের শাখাপল্লব বিস্তারের মূল উৎস।

সমুদ্র

আবাল্য গঙ্গার ক্রোড়ে লালিত বঙ্কিমচন্দ্রের জলের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় যোগ। অর্জুনাদীঘির ছায়া তাঁর কবিতাকে অনুপ্রাণিত করেছে। জলাধার তাঁর বাল্যস্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বলেই হয়ত তাঁর উপন্যাসে কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা জলাশয়গুলি সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধেযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে সমুদ্রের উদ্ভাস তাঁর পরিণত যৌবনে, বিদ্যা ও সংস্কৃতিকে অনুশীলিত মনের সম্মুখে। সমুদ্র তাঁর কাছে বিরাটের এক চকিত আবির্ভাব। বিপুল, ব্যাপ্ত এই সমুদ্র মানুষের প্রতিদিনের গৃহজীবনের আত্মীয় নয়, তার অন্তরাত্মার সম্মুখে মহান্ বিস্ময়ের মত তার আত্মপ্রকাশ।

কপালকুণ্ডলা :

১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলার নেগুঁয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র

৩৯। রাজসিংহ : ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৪০। রাজসিংহ : ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

তাঁর প্রথম কর্মস্থল যশোহর থেকে বদলি হয়ে যান। নেগুঁয়া কাঁথির সন্নিকটে, দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই স্থলেই কপালকুণ্ডলা কাহিনীর উৎপত্তি। তাঁর ভাষায়—

"যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল··· যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গলায় বাস করিতেন, তখনই এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিতেন।'[৪১]

এই সমুদ্র ও কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। একরাত্রে আশ্চর্য রূপবতী জটাধারিণী কোন এক সন্ন্যাসিনীকেও তিনি আকস্মিকভাবে দর্শন করেছিলেন। এই তিনের মিলিত প্রভাবেই সম্ভবতঃ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—শিশুকাল থেকে বিজন সমুদ্রতীরেও অরণ্যভূমিতে কোন কাপালিক পালিতা বালিকা সংসারজীবনে ও সামাজিকপরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করতে পারে কিনা। পূর্ণচন্দ্র বলেন এ প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সকৌতুক উত্তর তাঁর 'সম্ভবতঃ পছন্দ হয় নাই।'

'ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।'[২৪]

নেগুঁয়ার সমুদ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কবিসত্তাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আর তাঁকে 'কপালকুণ্ডলা' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল উক্ত কাপালিক ও সন্ন্যাসিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দর্শন ও দর্শনপ্রভাবিত সৃষ্টি 'কপালকুণ্ডলা' উভয়ই অভিনব। নেগুঁয়ার সমুদ্রতীরে ক্ষণমুহূর্তে দেখা সন্ন্যাসিনী বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনায় 'কপালকুণ্ডলা'র শাশ্বতী কবিতারূপে নবজন্ম লাভ করল। সাগরসৌন্দর্যের রহস্যময় অনুপ্রেরণাই হয়ত বঙ্কিকচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার ও পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার এইরূপ কাব্যীয় রূপায়ণ ঘটিয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' যেন একটি কাব্যের উপন্যাসরূপ। এই কাহিনীর পটভূমি

৪১। বঙ্কিম প্রসঙ্গ : শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৩-৪।

৪২। বঙ্কিম প্রসঙ্গ : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৫।

সমুদ্র, লেখকের সমস্ত কল্পনা, অনুভূতি, কাহিনীগ্রন্থনা, চরিত্রায়ণ এবং চিত্ররচনা সবই সৌন্দর্যধারায় অভিষিক্ত। গ্রন্থের নায়িকা কপালকুণ্ডলা সমুদ্রে উদ্ভূতা সমুদ্রে বিসর্জিতা, যেন সে সমুদ্রেরই মানবীপ্রতিমা।

সমুদ্রতীরে নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রকৃতির একটি অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এই নিসর্গভূমির অধিনায়ক স্বয়ং মহাসিন্ধু—যিনি অনন্ত এবং অপার, মানুষের চিরবিস্ময় এবং জিজ্ঞাসার আকর, যাঁর রহস্যে হোমার থেকে ভিক্টর ইয়ুগো, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন। সাগর অর্থেই বিশালতা, সাগর অর্থেই অকল্পনীয় অপরিচয়ের বিস্ময়। হোমারের ইউলিসিস মহাসমুদ্রে কত বিচিত্র বিপদ এবং বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছেন। কালিদাসের কল্পনায় বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে জলধি, ইয়ুগো ঈশ্বরের মহিমময় প্রকাশ দেখেছেন সাগরে, রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন 'বসুন্ধরা'র আদিজননীর স্নেহোচ্ছ্বাস।

এই সাহিত্যিক উত্তরাধিকারবশতঃ, স্বভাবকবি বঙ্কিমচন্দ্র তথা তাঁর নায়ক নবকুমার সমুদ্রদর্শনমাত্র অভিভূত হয়েছেন। নির্জন তটভূমি, পেছনে নিবিড় বন্যজন্তুময় অরণ্য, বালিয়াড়ীর সমুচ্চশিখরে এক ধ্যানরত ভয়াল ও দুর্বোধ্য কাপালিক—'এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে।'[৪৩]

সর্বোপরি সম্মুখে অতল তরঙ্গবিস্তার—'ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ...'[৪৪]—সমস্ত মিলে নবকুমারের মনে পূর্ব থেকেই যে বিস্ময় ও মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলে আকস্মিকভাবে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব তাঁকে এমন ভাবে উচ্চকিত করে তুলেছিল। সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব যেন চিরনবীন সৌন্দর্যের এক অপরূপ উদ্বোধন।

বিস্ময়ের 'পুনরুদ্বোধনই' রোম্যান্টিসিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এই পরিবেশে, এই মানসিক অবস্থায় নবকুমারের সাক্ষাৎকারের মতো

৪৩। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৪৪। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

পরমতম বিস্ময়ের জাগরণ আর কোন উপায়ে সম্ভব হতো?

সমুদ্রের উদার অতুলন পটভূমিকা না থাকলে কি নবকুমারের এই মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত? নির্জনে সুন্দরী নারীর আবির্ভাবে যে কেউ মুহূর্তের জন্য চকিত হবেন, কিন্তু এতো তা নয়, সমুদ্রের আনুকূল্যে এ যেন এক দীপ্ত বিদ্যুতের আঘাত, এক দৈববীণার ঝঙ্কার, যার ফলে:

'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল।...সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর, হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।'[৪৫]

বস্তুত এই সাক্ষাৎকার ব্যতীত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মাত্র সূচনাই যে হত না তা নয়, তার সমস্ত মাধুর্য এবং রোম্যান্স হীনপ্রাণ হয়ে যেত। সমুদ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের আদিঅন্তর্ব্যাপী ঐকতান তার মর্মচারী ধ্রুবপদ, তার পরিণাম নিয়ন্ত্রণের অমোঘ ধাতা।

এই পরিণাম-নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের উপর সমুদ্রের প্রভাব বিচার করা চলে।

যে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কপালকুণ্ডলা মানুষ হয়েছে, তার ফলে গৃহবন্ধনে তার অন্তরাত্মা পিঞ্জরবন্দিনী বিহঙ্গীর মত আর্তনাদ করে; সমুদ্র ছিল কপালকুণ্ডলার আকাশ—সেই নীলিমার বিস্তারে তার মন ডানা মেলে দিত।

সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্তি, তার উপর দিনরাত্রির বহু বিচিত্র দৃশ্যপরিবর্তন কপালকুণ্ডলাকে 'মিষ্টিক' অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করত, কাপালিকের প্রভাবের সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি তাকে যে ভাবজগতে উত্তীর্ণ করে দিত, তা থেকে স্থূল এবং বস্তুসর্বস্ব গৃহজীবনে অবতরণ তার পক্ষে সুকঠিন ছিল।

সমুদ্র বিরাট, নিয়ত আন্দোলিত, তরঙ্গের রুদ্র-সঙ্গীতে উদ্বেল। যেন আপনভোলা এক উদ্দাম সন্ন্যাসী—নিজের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। সে কারো কাছ থেকে কিছুই নেয়না, অপ্রতিগ্রাহী, কেউ তাকে কোন অর্ঘ্য দিলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এইভাবেই হয়ত সমুদ্র কপালকুণ্ডলাকে নিরাসক্তির দীক্ষা দিয়েছে।

সমুদ্রের সম্পর্কে আরো অন্তর্গূঢ় আকর্ষণ হয়তো কপালকুণ্ডলার আছে। কপালকুণ্ডলার পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে অধিকারীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—'ইনি

৪৫। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃতা হইয়া পর্তুগীজ যানভঙ্গ প্রযুক্ত' তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।'[৪৬] আমরা ইতিহাস থেকে তৎকালীন মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের যে অত্যাচারের কাহিনী পাই, তা থেকে এমন অনুমান করা যায় যে কপালকুণ্ডলার মাতাপিতাও হয়ত বন্দী অবস্থায় ওই জাহাজে ছিলেন। নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী কপালকুণ্ডলা অন্ততঃ অধিকারীর মুখেও শুনতে পেয়েছেন। সমুদ্রের কলরোলে কপালকুণ্ডলা যেন অবচেতনভাবেই তাঁর মাতাপিতার আহ্বান অনুভব করেছেন।

জলদস্যুদের হাত থেকে সমুদ্রই পরোক্ষভাবে কপালকুণ্ডলাকে ত্রাণ করেছিল। তাই সাগরের প্রতি তার রক্ষাকর্তার কৃতজ্ঞতাবোধ।

সর্বোপরি সমুদ্রতটের বিবিক্ততা এবং নির্জন বনভূমি। এই পরিবেশে যে মানুষ হয় স্বভাবতঃই প্রকৃতি তাকে প্রভাবিত করে, তার চরিত্রে একটা অসামাজিক দূরত্ব আসে, লোকালয়ের সঙ্গে সে সামঞ্জস্য করতে পারে না।

সমুদ্র এবং সংলগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কপালকুণ্ডলা সেই মানসিক সংসক্তি লাভ করে নি, যাকে আমরা 'প্রেম' অভিধায় চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু তার স্বভাবদয়ার্দ্রতার জন্য সকলেরই প্রতি সে মমতা অনুভব করেছে। নবকুমারও তা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

যুগলাঙ্গুরীয় :

'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনার মূল প্রেরণা তমলুকে সমুদ্রদর্শন। এখানে মাত্র সমুদ্রই নয়, তমলুকের আকর্ষণও প্রবল। 'কপালকুণ্ডলা'য় সমুদ্র বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্টিক ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা অনেক বাস্তবমুখী। এখানে সমুদ্র মাত্র একটি প্রাথমিক পটভূমিকা সৃষ্টি করেই দূরাপসৃত। তারপরের কাহিনী তাম্রলিপ্ত নগরের অভ্যন্তরে। এ উপন্যাস কপালকুণ্ডলার মত কাব্যপ্রধান না হয়ে ঘটনাপ্রধান হয়ে উঠেছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনা সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে কিছু মূল সূত্রের সন্ধান পেতে পারি 'বঙ্কিম-জীবনী'তে।

'তাম্রলিপ্ত-এর ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুক আসিয়াছিলেন।......তমলুকের দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভোলেন নাই।

৪৬। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ

পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছিলেন।'[৪৭]

সমুদ্রপটভূমিকা হিসাবে 'যুগালঙ্গুরীয়' উপন্যাসে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি পাই—

'দুইজনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপ তলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রচীন নগর তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্তনীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।'[৪৮]

'এই 'দুইজন' গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা—পুরন্দর ও হিরণ্ময়ী। উভয়ের বাল্যপ্রণয়, বিবাহে বাধা, সুতরাং প্রণয়েও বিঘ্ন ঘটল। উভয়ের বিচ্ছেদ আসন্ন—অভিমানে অশ্রুসজল কয়েকটি মানসিক দ্বন্দ্বের মুহূর্তকে সমুদ্রসৌন্দর্য গভীরতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে।

'হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্তী সাগরতরঙ্গে সূর্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে, মৃদুপবনোত্থিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষীকুল শ্বেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন—দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন।'[৪৯]

৪৭। বঙ্কিমজীবনী : ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৪-৬

৪৮। যুগলাঙ্গুরীয় : ১ম পরিচ্ছেদ।

৪৯। যুগলাঙ্গুরীয় : ২য় পরিচ্ছেদ।

জলাধারের দর্পণে

(দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, পরিখা বা ঝিল ইত্যাদি এরা নদী, জলাভূমি বা হ্রদ ইত্যাদির মত প্রকৃতিসম্ভব নয়। মানুষের দ্বারাই এরা রচিত। কিন্তু উদ্যান-বেষ্টিত পুষ্করিণী, সমুদ্রপাড়ের ওপর তাল, বেল বা অন্যান্য ছায়াতরু শোভিত সুবিশাল দীর্ঘিকা, জ্যোৎস্নালোকিত প্রাসাদ-পরিখা অথবা পদ্মবনরঞ্জিত ঝিল সহজেই মানবিক কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়—আকাশ, ইন্দ্রধনু, চন্দ্র-সূর্য-তারা, বনবীথি, পুষ্পশোভা এবং জলচর পক্ষিকুলের সমাবেশে এরা নিসর্গের আত্মীয়তা লাভ করে। মানুষের সাংসারিক সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত জলাশয়ের ধারে এসে এক বৃহত্তর প্রাকৃতিক বিশালতায় মুক্তি পায়; বারুণীতীরের কোকিলকূজন রোহিণীর জীবনতৃষ্ণাকে উন্মত্ত করে নগেন্দ্রের উদ্যানবাটীর নিশীথ নীরে নক্ষত্রবিম্ব সঞ্চালন দেখতে দেখতে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যার কথা ভাবে।) তাই মানবগঠিত হয়েও যে-সমস্ত জলাশয় প্রকৃতির বিশালত্বে বিলগ্ন, তাদের আমরা প্রাকৃতির উপাদানেরই অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বঙ্কিম-উপন্যাসের অন্তর্গত কয়েকটি দীর্ঘিকা পুষ্করিণী, পরিখা যারা কাহিনীতে এক একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবস্থান করছে, কখনও কখনও মনোরম শিল্পসুষমার আরাধনা করে শিল্পীর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করেছে। (এই চিত্রসৃষ্টির মূল প্রেরণার উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কৈশোরের দিনগুলিতে, যাকে আচ্ছন্ন করেছিল শান্ত অর্জুনাদীঘি, একটি নিভৃত খাল আর তার অন্ধকার ছায়াস্তীর্ণ পথ।)

শ্রীযুক্ত শচীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্কিমজীবনী থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত এই অর্জুনাদীঘি ও খালটির পরিচয় আমরা পাই। খালের 'পথটি দুর্গম, ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম-পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কখন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লতাবিতানতলে বসিতেন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের ব্যাপকতর পরিসরে সামান্য অর্জুনাদীঘি, পুষ্পোদ্যান আর কাঁঠালপাড়ার ক্ষুদ্র খাল হয়ত হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের

১। বঙ্কিমজীবনী: পৃঃ ৩৩—শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রতি তাঁর শিল্পিসত্তার কল্পনার আকাশকে যে কতখানি রঙে, রেখায়, রোম্যান্টিক ভাবের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে তার স্বাক্ষর লেখকের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের দীঘিচিত্র ও দীঘিকেন্দ্রিক কাহিনীর পরিকল্পনায় বিরাজিত।) উপন্যাসে পরিকল্পিত দীঘি-হ্রদ পরিখাগুলি কাহিনীর গতিপরিণতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাশিল্পের নৈপুণ্যকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে সেগুলি চিত্রধর্মী বর্ণনাকৌশলে, আশ্চর্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মনিহিত অপ্রকাশিত চিত্রশিল্পী তথা ভাস্করকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোরের অর্জুনাদীঘিকে আমাদের বারবার স্মরণ করতে হবে। অর্জুনাদীঘি, তার লতাবেষ্টনী দেওয়া গৃহ, পুষ্পোদ্যান তাঁর সাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বারুণীচিত্র, বিষবৃক্ষে 'বাপীতট' প্রভৃতি স্মরণীয়। আর এই দীঘির জলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে অপরূপ সৌন্দর্যময়ী কয়েকটি রমণী। এই নারীদের কেউ দীর্ঘিকার অতলে শীতল মৃত্যু কামনা করেছে, কেউ বা তার নক্ষত্রখচিত নিশীথবক্ষে নিজের ভাগ্যলিপি পাঠ করেছে, কেউ বা তার জল নিয়ে খেলা করবার ছলে নিজের ঘরে প্রলয় ডেকে এনেছে।) অর্জুনাদীঘি সেদিনের কিশোরশিল্পীর মানসলোকে যে কল্পনার শিহরণ জাগিয়েছিল, উত্তরকালীন সিদ্ধ সাহিত্যকারের রচনায় তা স্বর্ণসঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে।

(বঙ্কিম-উপন্যাসে দীর্ঘিকাগুলির অধিকাংশই ধনী ভূস্বামীরা বিলাসের উপকরণ হিসাবে বিশেষভাবে সাজিয়েছিল। জনকল্যাণের জন্য রাজাদের নির্মিত দুই একটি সজ্জিত দীঘি ও প্রকৃতিরচিত স্বাভাবিক জলাশয়ও আমরা পাই। দুর্গেশনন্দিনীতে পরিখা দিয়ে আরম্ভ করেছেন লেখক। তারপর কপালকুণ্ডলায় একটি খালের* সন্ধানও পাওয়া যায়।[২] ক্রমশঃ মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর কৃষ্ণকান্তের উইল-এ নানারূপে দীর্ঘিকাগুলি সজ্জিত করে অবশেষে লেখক

---

* সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথসকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত, সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

২। কপালকুণ্ডলা: ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'উদয়সাগরের' বিপুল গাম্ভীর্যে উপনীত হয়েছেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে।

দীর্ঘিকাগুলি কাহিনীর কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনসাধনে সহায়তা করেছে। প্রায় সর্বত্রই মূল ঘটনাগুলির সহায়ক—পরিবেশ রচনাতেই তাদের প্রধান সার্থকতা। কাহিনীগ্রন্থনার মূলসূত্ররক্ষা মনস্তাত্ত্বিক, পটভূমিবিস্তার ও রূপকরচনাও এদের অপরাপর উপযোগিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির আনন্দ ও চিত্রশিল্পীর মানসিকতা উদ্ভাস ঘটেছে এই দীর্ঘিকাগুলির অপরূপ বর্ণাঢ্য উপস্থাপনায়, মধ্যে মধ্যে এক একটি আশ্চর্য স্থির চিত্ররচনায়। কথাসাহিত্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের কবিসত্তার উদ্বোধন ঘটেছে এই সব ক্ষেত্রে, তার একটির পর একটি কাব্যস্বপ্ন আপন লেখনী তুলিকায় যেন বর্ণ ও আলোকের মিশ্রণে চিত্রিত করেছেন। বারুণী-তীরে কয়েকটি দৃশ্য স্মরণ করলেই এর যাথার্থ্য সুস্পষ্ট হতে পারে।

'নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলকাঞ্চনগৌর, স্তরে, স্তরে, স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত ……ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে, লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে,…সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম; চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে……।'[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দীর্ঘিকাগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষামূলক আলোচনা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গের প্রথম সূচনা করলেন লেখক প্রথম পরিপূর্ণ উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে।

দুর্গেশনন্দিনী: একটি দুর্গমূল পরিখা

মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে একটি পরিখা বর্ণিত। এর একটি সুন্দর ভূমিকা উপন্যাসে দেখতে পাই। প্রাপ্তিবিহীন প্রেমের নীরব দহন হৃদয়ে বহন করে কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা কাহিনীকে সুখস্নিগ্ধ পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। একান্ত শিল্পীর মমতায় লেখক এই মহীয়সীর নীরব হৃদয়কে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত করেছেন কাহিনীর শেষাংশে—

'নীলবর্ণগগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে।……সম্মুখে দুর্গপ্রাকারমূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই তলে, জল পরিপূর্ণ দুর্গপরিখা

৩। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীরবে আকাশপট প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।……আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।'[৪]

এইস্থলে পরিখাটির প্রয়োজন সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। আয়েষার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার অসামাজিক প্রেমে প্রাপ্তির যে অসম্ভাব্যতা এই সমস্তের সংমিশ্রণে আয়েষার নারীমনের যে কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে পরিস্ফুট করার জন্যই লেখক এই নিভৃত পরিখাটিকে চিত্রিত করেছেন। 'জলপরিপূর্ণ পরিখা' যেন আয়েষার অশ্রুপূর্ণ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। অথবা এই পরিখা যেন আয়েষা ও জগৎসিংহের মধ্যগত একটি ব্যবধান—দুর্গচারিণী নবাবকন্যা যে ব্যবধান কোনদিনই অতিক্রম করতে পারবেন না।

কপালকুণ্ডলা : একটি খাল

'কপালকুণ্ডলায়' একটি ক্ষুদ্র খাল-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর নিভৃত আলাপের একটি পরিবেষ্টনী রচনা করা। ঘটনাস্থলের পরিবেশ বর্ণনাও লেখকের লক্ষ্য।—

'নবকুমারের বাটীর পশ্চাদভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।'[৫]

এই বর্ণনাটি বঙ্কিমজীবনীকার শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের খালের জঙ্গলদুর্গম পরিবেষ্টনীটিকে মনে করিয়ে দেয়।

মৃণালিনী : রাজপথে দীঘি

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম উপন্যাসে দীঘিকার প্রথম অনুপ্রবেশ। নবদ্বীপের রাজপথের পাশে বৃক্ষসৌন্দর্যে সুসজ্জিতা এই দীঘি সর্বসাধারণের জন্য খনিত উপন্যাসের প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিবেশসৃষ্টিতেই এই দীঘিকার বিশেষ উপযোগিতা। কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের দ্বন্দ্বসংঘাতময় প্রেমের জটিল গ্রন্থিগুলির উপর আলোকপাতের বিশেষ সহায়তা করেছে এই জলীয় পরিবেশ। সুতরাং এই দীঘির অন্যতর প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক।

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর গোপন প্রেম ও বিবাহ তখনও সমাজের আশ্রয় পায় নি। হেমচন্দ্র যবনশত্রুর আক্রমণ থেকে

৪। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ।

৫। কপালকুণ্ডলা : ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশরক্ষার সঙ্কল্পে ব্রতী। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, ঘটনাবিপর্যয় প্রেমে সংশয় আনে। কিন্তু হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়পরিণয়কে গৃহ আশ্রয় দেয় নি, তাঁদের সংশয়, দ্বন্দ্ব, জটিলতা নিরসনের জন্য ক্ষণমিলনের আশ্রয় রচনা করেছে প্রকৃতি। এই নিভৃত বাপীতীরে।

'সেই নিশীথসময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুইজনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্তলতাস্রগ্‌বিশোভী বিশাল বিটপীসকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবালকুমুদ কহলার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদসহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল।

...প্রকৃতি স্পন্দহীনা ধৈর্যময়ী। সেই ধৈর্যময়ী প্রকৃতি প্রাসাদমধ্যে মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।'[৬]

'মৃণালিনী' উপন্যাসে প্রেম পথচারী। প্রেমিকের জন্য নিরাশ্রিতা প্রেমিকা মৃণালিনীর যন্ত্রণালাঞ্ছনারও আশ্রয় এই বাপীতীরসোপান।

রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পতুলিকা এখানে বর্ণময়। একটি রোম্যান্টিক রহস্যময়তায় লেখক দীর্ঘিকাটিকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে একটি রহস্যময়ী রমণী, মনোরমা।

'হেমচন্দ্র...........দেখিলেন। চন্দ্রালোকে সর্ব্বাধঃস্থ সোপানের, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসংবদ্ধকুন্তলা, কেশদাম স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।'[৭]

প্রস্তরসোপানে অনৈসর্গিক প্রস্তরপ্রতিমার মত স্থির মনোরমা, প্রেমের যে অশান্ত যন্ত্রণা তার বিচিত্র জীবনের নেপথ্যে সংগোপনে নিয়ত দহমান, সেই আত্মকেন্দ্রিক দহনজ্বালাকে শমিত করবার জন্যেই নৈশ নিঃস্তব্ধতায় এই দীঘির শীতলতা তার একান্ত মনোগত প্রয়োজন। তার জ্বালার ইঙ্গিতময় প্রকাশ হেমচন্দ্রের প্রশ্নের দুই একটি শান্ত উত্তরে—

হেম: রাত্রে স্নান কেন?

মনো: আমার গা জ্বালা করে।

৬। মৃণালিনী: ৩য় খণ্ড, ১০ পরিচ্ছেদ।

৭। ঐ: ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

হেম : গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন ?

মনো : এখানকার জল বড় শীতল।'[৮]

এই দৃশ্যটি থেকে লেখক কথাশিল্পীর নিপুণকৌশলে ঘটনার গতিকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে আকস্মিকভাবে রাজনৈতিক জটিলতায় প্রবেশ করিয়েছেন।

উপন্যাসের প্রয়োজনীয় ঘটনায় অনুপ্রবেশের জন্য এই দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে দীর্ঘিকা পরিবেশও রচনা করেছে।

বিষবৃক্ষ : বাপীতট

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাপীতট ও কুন্দ একসূত্রে গ্রথিত। এক অনাদৃতা বালিকা এবং স্নেহময়ী প্রকৃতি—দুটিকে আশ্চর্য ছন্দে মিলিয়ে কবি বঙ্কিম অপরূপ সৌন্দর্যচিত্র রচনা করেছেন।

'প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে……বকুলের তলায় সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।……শীতলবায়ু সরোবরপার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধুত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরস্থঃ বকুলপত্রমালায় মর্মরশব্দ করিতেছিল। বকুলপুষ্পসকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পরিতেছিল। ……কুন্দ ভাবিতে লাগিল।'[৯]

সমগ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানির কেন্দ্রবিন্দুটিতে মূর্তিমতী সৌন্দর্য আর সরলতার ছবি কুন্দনন্দিনী। এই বালিকার প্রেমে চণ্ডীদাসের রাধার মত বিবশ আত্মমগ্নতা। সেই ব্যাকুল আবেগ সমগ্র গ্রন্থখানিতে কোথাও বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারেনি। 'বাপীতটে' শীতল জল, মধুগন্ধী বায়ু, প্রস্তরসোপান, বকুলতলা, বিচিত্র পুষ্পের সমারোহ, আর মধ্যে কুন্দ। সুকুমার প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে তার রুদ্ধ হৃদয়ের আবেগ অশ্রুধারায় উৎসারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর প্রেমসংকট ও মৃত্যুবাসনার সঙ্গে জলের নিবিড় সংযোগ। দ্বন্দ্বজটিল মুহূর্তগুলি ঘনীভূত হয়ে ওঠে পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতির পটভূমিকায়। তাঁর চরিত্র প্রধানতঃ আবেগচালিত, তাই হয়ত দীঘির জলের গভীরতা তাদের আকর্ষণ করে মৃত্যুর অতলে টানে। এই জাতীয় দীঘিকেন্দ্রিক

৮। ঐ : ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৯। বিষবৃক্ষ : ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মানসদ্বন্দ্ব বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে সূক্ষ্ম ও সুন্দরতর রেখায় অঙ্কিত। প্রেমিকার চরিত্র ও প্রেমের প্রকৃতি দীর্ঘিকাতটের নিসর্গ-সৌন্দর্যের সঙ্গে সুনিপুণভাবে লেখক সমন্বিত করেছেন।

'বিষবৃক্ষে' কুন্দ কোমল, করুণ, প্রেমের বেদনায় নির্বাক। বাপীতটের সমগ্র পরিবেশটিকেও লেখক স্নিগ্ধতুলিতে অঙ্কিত করেছেন। প্রকৃতি এখানে মমতায় সুন্দর। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর তৃষ্ণায় যৌবনের তীব্র মাদকতা সৌন্দর্যে মদিরতা, চরিত্রে আত্মগরিমার উন্মত্ততা। 'বিষবৃক্ষ' এর মত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে ও বারুণীর প্রস্তরসোপানে উপবিষ্টা নারী আত্মদ্বন্দ্বে সংক্ষুব্ধা, কিন্তু এই নারী যৌবনপ্রমত্তা। এখানকার কাল, কোকিল কুহরিত বসন্তসন্ধ্যা। বারুণীর সৌন্দর্যচিত্রঅঙ্কনে লেখকের তুলিকাও যেন মদিরোজ্জ্বল।

বাপীতটচিত্রের অন্যতর বিশেষ উপযোগিতা কুন্দ ও নগেন্দ্রনাথের নিভৃত সাক্ষাৎকার ও পারস্পরিক হৃদয় সংবাদ বিনিময়ের জন্য একটি উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি।

এই পরিবেশেই যেন নায়ক-নায়িকার প্রেমের স্বরূপ এবং তাদের হৃৎচাঞ্চল্য সম্যক প্রকটিত হয়েছে। সমগ্রগ্রন্থে প্রায় নির্বাক কুন্দর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা, দুর্লভ প্রলোভনের মুহূর্ত এসেছে এই বাপীতটে। কুন্দর উচ্চারিত একটিমাত্র 'না' শব্দ এই কিশোরীর চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তা, চিত্তসংযম ও পরহিতের জন্য আত্মোৎসর্গের শক্তিকে প্রকাশ করে।

চন্দ্রশেখর : ভীমাপুষ্করিণী

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে গ্রাম্য পুষ্করিণী ভীমা। ধনীর প্রসাদসজ্জিতা সে নয়, সুতরাং বারুণীর ঐশ্বর্য তার নেই।

'ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তাল গাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে।'[১০]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কাহিনী বিস্তারের জন্য 'ভীমা' একটি পারিপার্শ্বিক চিত্রমাত্র। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটির গতিপরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সমগ্র কাহিনীটির সঙ্গে ভীমা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।

১০। চন্দ্রশেখর ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ঘটনাগুলি সংঘটিত হবার মূলে ভীমা পুষ্করিণীরই অপরোক্ষপ্রভাব।

প্রতাপের প্রতি দুর্বার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা শৈবলিনীকে স্বামী, সংসার, সমাজ সব কিছু থেকে বিবিক্ত উদাসীন করে রেখেছে।

ভীমা পুষ্করিণীর শীতল জলে ডুবে অপ্রাপ্তির দুঃসহ দাহকে শৈবলিনীর সুসহ করবার প্রয়াস দেখা যায়। ভীমার সঙ্গে শৈবলিনীর গূঢ় মানসিক যোগ, পুষ্করিণীর নিবিড় শীতলতা তাঁর মনকে ঘরবিমুখী করে মৃত্যুর প্রলোভনে টানে। 'শৈবলিনী: তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।'[১১]

'ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে স্বর্ণকমল'[১২]—এর মত শৈবলিনীর অতুলনীয় সৌন্দর্য ইংরেজ ফস্টরকে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করে। এই পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করেই ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর আলাপ ও পলায়নের ষড়যন্ত্র। ফস্টর কর্তৃক অপহরণের সুযোগকেই শৈবলিনী প্রতাপপ্রাপ্তির সুযোগরূপে গ্রহণ করলেন।

শৈবলিনীর জ্বালাময় প্রেম 'ভীমা'র শীতল জলে শিখায়িত হয়ে সমগ্র কাহিনীতে তার দাহ ব্যাপ্ত করে দিল।

গ্রাম্য দীঘি ভীমাও মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীর তুলিকে চঞ্চল করে তুলেছে—

'পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

... ...

শৈবলিনীর......বক্ষঃ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরীসমেত মস্তকের অর্ধ ভাগমাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘ মধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে স্বর্ণকমল ফুটিল।'[১৩]

এখানে শিল্পীর তুলি শুধু সৌন্দর্য চিত্র অঙ্কনে মগ্ন।

১১। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
১২। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
১৩। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণকান্তের উইল : বারুণী

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে দীঘিপরিকল্পনায় বারুণী দীঘির শ্রেষ্ঠতা সর্বাংশে। বারুণী দীঘিকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমন সৌন্দর্য স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বারুণীর পরিবেষ্টনী ও পটভূমির আশ্রয়ে নিপুণ চিত্রশিল্পীর মত একটির পর একটি সৌন্দর্য চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। তার বর্ণ রেখা, আলোক সবই বিচিত্র। বসন্ত বাতাস, চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যা, কোকিলের কুহুতান বারুণীর সৌন্দর্যকে রমণীয়তর করেছে। এই রূপসৃষ্টি বঙ্কিমরচনায় চিত্রধর্মিতার পরিচায়ক।

বারুণী নামটি চয়নেও লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে মনে হয়। বারুণী মদিরার নামান্তর। বারুণী শুধু সুন্দরীই নয়, বারুণীর সৌন্দর্যে উন্মাদনা। বারুণীর মাদকতা গোবিন্দলাল-রোহিণীর মধ্যে যে আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে তারই ফলে সমগ্র কাহিনী তার সর্বনাশা বিপর্যয়ের দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হয়েছে। মনে হয় উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে আরও ব্যঞ্জনাগভীর করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বারুণীর নাম এবং সৌন্দর্যময় পরিবেশটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বারুণী পুষ্করিণীর মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতাও অসাধারণ। গোবিন্দলাল সম্পর্কে রোহিণীর সর্বপ্রথম চিত্তবিকার এরই বসন্তপুষ্পিত তটভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল; এরই জলে রোহিণীর আত্মনিমজ্জন এবং জলতল থেকে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বাসনার কালীদহে গোবিন্দলালের অপমৃত্যু। কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ীতে বারুণী পুষ্করিণীর অস্তিত্ব না থাকলে বুঝি এই কাহিনীর এমন নির্মম পরিণাম দেখা দিত না।

বারুণীর কাহিনী রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র কবির লেখনী আর চিত্রশিল্পীর তুলি যেন একসঙ্গে গ্রহণ করেছেন। বসন্তের বাতাস, জ্যোৎস্না রাত, কোকিলের কুহুধ্বনি, লতাপুষ্পের কুঞ্জ, সর্বোপরি বারুণীর গভীর স্ফটিক জলের আকর্ষণ। কথাশিল্পী এখানে শব্দযোজনার চাইতে বর্ণবিন্যাস করেছেন বেশী। তাঁর মানসরঞ্জনে একটির পর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, প্রকৃতির পটে জীবনের ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে, তার সঙ্গে ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে কাহিনী। তারপরই এল কথাশিল্পীর নিপুণতা, কাহিনীতে আকস্মিক গতিবেগ সঞ্চার, তারপর অবধারিত ধ্বংসপরিণতি। এই প্রসঙ্গে দুই একটি চিত্র ও তার মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তগুলি লক্ষণীয়।

'রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল. অনন্ত গগন নিঃশব্দ, অথচ সেই

কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। ……দেখিল……কুসুমিত কুঞ্জবনে ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল……'[১৪] তারপর—'রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে।'

'……গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিত।'[১৫]

তারপর রোহিণীর আকাঙ্ক্ষা, কামনা, প্রেম, ঈর্ষা অবশেষে বারুণীর জলতলে মৃত্যুমূর্চ্ছা এবং গোবিন্দলালের নিবিড় পরিচর্যায় জীবনলাভ। গোবিন্দলালের রূপমুগ্ধতার সঙ্গে সমবেদনা মিশল—'মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন?'

এর ওপর রোহিণীর নিদারুণ উক্তি—

'আমাকে কেন বাঁচাইলেন?……চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে, পলে রাত্রিদিন মরা অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।'[১৬]

বারুণীতীর থেকে রোহিণী চলে গেল কিন্তু তার রাত্রিদিনের দারুণ তৃষ্ণা গোবিন্দলালের বুকের ভিতর সঞ্চারিত করে দিয়ে গেল। সেই তৃষ্ণার তাপেই গোবিন্দলালের নির্মম পরিণতি ঘনীভূত হয়ে এল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দীঘি বর্ণনা অসাধারণ চিত্রধর্মিতার পরিচায়ক।

রংএ রেখায় উজ্জ্বল বারুণী চিত্রটি লেখকের চিত্রশিল্পীসুলভ নিপুণতার নিদর্শন।

'নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগানে উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই

১৪। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
১৫। ঐ : ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
১৬। ঐ : ঐ ১৭শ পরিচ্ছেদ।

বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপরে নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।'[১৭]

বঙ্কিম উপন্যাসের কাহিনীগুলির জলের সঙ্গে যেন একটা আত্মিক যোগ আছে। এই যোগ যেখানে যত ঘনিষ্ঠ কাহিনী সেখানে তত রসনিবিড়, বর্ণনা তত চিত্রধর্মী, কবিত্বময়। বারুণীজলস্নাত আরও দুই একটি সুন্দর জীবনচিত্র এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কোকিলের কুহুমুখরিত বসন্তকালের একটি জ্যোৎস্নারাত্রি :

'গোবিন্দলাল দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতলে আলো করিয়াছে।'[১৮]

অন্যত্র : গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপাকাঙ্ক্ষার সম্মুখে লেখক তুলে ধরেছেন, রোহিণীর জলসিক্ত দেহ—যেন বারুণীর পূর্ণপাত্র।

'উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে……বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল।'[১৯]

এইগুলি এক একটি অপরূপ চিত্র, বর্ণ শিল্পী বঙ্কিমের প্রতিভার দ্যোতক।

বারুণী পুষ্করিণী 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র একটি বিশেষ অঙ্গ। সমগ্র কাহিনীটিই একদিক থেকে বারুণীকেন্দ্রিত, গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণীর চারিত্রিক দ্বন্দ্বসংঘাতও বারুণীকে ঘিরেই। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একটা অবলম্বনের অপেক্ষা রাখে,……কৃষ্ণকান্তের উইলে জুটেছে বারুণী পুষ্করিণী। কাহিনীর আদিতে, মধ্যে, অন্তে বারুণী, কাহিনীর প্রত্যেকটি পতাকাস্থান বারুণীতীরে বা বারুণীনীরে, বারুণীর জলে কখনো অমৃত, কখনো গরল, অমৃত হোক বা গরল হোক, সর্বদা উন্মাদকতা তার ধর্ম।'[২০]

বারুণীর তীরে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নবপরিণয়ের দিন সুধাসিক্ত। আবার বারুণীই গোবিন্দলাল-রোহিণীর রক্তে তীব্র মাদকতার আগুন জেলে দিল।

১৭। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।
১৮। ঐ : ঐ ১৫শ পরিচ্ছেদ।
১৯। ঐ : ঐ ১৬শ পরিচ্ছেদ।
২০। বঙ্কিম সরণী : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

সেই সর্বগ্রাসী আদিম শক্তি থেকে সমাজের শাসন, ভ্রমরের প্রেম, গোবিন্দলালের আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা, রোহিণীর আত্মসংযম চেষ্টা, কিছুই তাদের সর্বনাশ থেকে ফেরাতে পারল না।

বারুণীর প্রমোদোদ্যানের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু আর বৈরাগ্যের শ্মশান। ভ্রমর — আর রোহিণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলালের মনোবিকার বারুণীর তীরেই। এখান থেকেই অসহ মানসিক যন্ত্রণায় গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ। গোবিন্দলালের অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত ও ভ্রমরের স্বর্ণমূর্তি স্থাপনার মধ্য দিয়ে হয়ত বারুণীর শুদ্ধি ঘটালেন বঙ্কিমচন্দ্র। বারুণীর মদিরা গোবিন্দলালকে পথভ্রষ্ট করেছিল, বারুণীর বিষণ্ণ বৈরাগ্য তাকে সন্ন্যাসপথের নির্দেশ দিয়েছে, শান্তির সন্ধান দিয়েছে। সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের শেষ বিদায়ের পূর্বের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়,—

'শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল—'এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।'[২১]......শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, 'বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।'[২২] গোবিন্দলাল বলিলেন,—বিষয়সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমি ইহা ভোগ করিতে থাক।'[২৩]

ইন্দিরা : কালাদীঘি

প্রাচীনকালে হিন্দুরাজা এবং মুসলিম নবাবেরা প্রায়ই লোকের তৃষ্ণা নিবারণ এবং ক্ষেত্রে জলসেচের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বিরাট বিরাট দীর্ঘিকা খনন করাতেন। এটি তাঁদের কাছে অসীম পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। এই সমস্ত দীঘির সমুচ্চ পাড় এবং তীরস্থ বনভূমি প্রায়ই দস্যুতস্করের আবাসভূমিতে পরিণত হত। জনহীন প্রান্তরে এইরকম কোনো বনাকীর্ণ দীঘির ধারে যাত্রীরা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য সমাগত হলে তারা সুযোগ বুঝে তাদের উপর দস্যুতা করত। 'কালাদীঘি' এইরকম একটি দস্যুপীড়িত স্থান।

২১। কৃষ্ণকান্তের উইল : পরিশিষ্ট।
২২। ঐ : ঐ
২৩। কৃষ্ণকান্তের উইল : পরিশিষ্ট।

ইন্দিরার দুর্ভাগ্য—তার পিতৃগৃহ আর স্বামীগৃহের মধ্যস্থলে সুন্দরী কালাদীঘির কালছায়া।

'পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্ধ ক্রোশ। পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ, তাহার ভিতর দিয়া পথ, চারিপার্শ্বে বটগাছ, তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে তাহারও নাম কালাদীঘি।'[২৪]

এই ডাকাতে কালাদীঘির শিকার ইন্দিরা। নবযৌবনে প্রথম স্বামীদর্শনের উৎকণ্ঠা ইন্দিরার মনে। পথ দীর্ঘ। পথে কালাদীঘির কালোজল ক্লান্ত বাহকদলকে বিশ্রামের আহ্বান জানাল। ইন্দিরার মুগ্ধদৃষ্টিকে আকর্ষণ করল তার স্নিগ্ধ রূপের মায়াজাল—

'দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে পর্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত 'পাহাড়'—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী, পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মি প্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবালে দুলিতেছে।'[২৫]

রক্ষকের অনবধানতা, ইন্দিরার মুগ্ধতা এসবেরই সুযোগ নিয়ে বটবৃক্ষ থেকে দস্যুদল নেমে এল। সেই নির্মম দস্যুতা ইন্দিরার ভাগ্যকে এক বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত করল। গড়ে উঠল উপন্যাসের মূল কাহিনী।

কালাদীঘি এ উপন্যাসে পটভূমিকারূপে আর আসে নি, কিন্তু কালাদীঘির ডাকাতি যেন ইন্দিরার চিন্তা এবং অনুভূতির সঙ্গে একাকার হয়েছে, অসতর্ক মুহূর্তে সে সুভাষিণীকে বলেছে: 'এযে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।'[২৬] ইন্দিরার পরিচয় না জেনে প্রেমান্ধ উপেন্দ্র যখন তাকে ইন্দিরা বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবার উপায় কল্পনা করেছে, তখন সে বলেছে: 'একটা ভারী জুয়াচুরি

২৪। ইন্দিরা: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
২৫। ঐ : ঐ ২য় পরিচ্ছেদ
২৬। ইন্দিরা :

করিব।'[২৭] অর্থাৎ—'এই ইন্দিরা রামরাম দত্তের বাড়ীতে কুড়াইয়া পাইয়াছি।'[২৮] —এখানেও কালাদীঘির ডাকাতির অনুস্মৃতি।

সব দিক বিচার করলে কালাদীঘি 'ইন্দিরা' উপন্যাসে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে ব্যবহৃত।

রাজসিংহ : উদয়সাগর

'সহস্র দীপের রশ্মি-প্রতিবিম্ব সমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডলের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল।……

সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিত গগনস্পর্শী পর্বতমালা পরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমালা প্রভাসিত পটনির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার। দুইজনে বড় অন্ধকারই দেখিল।'[২৯]

মহাকাব্যোপম 'রাজসিংহ' উপন্যাসে উদয়সাগরের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সুতরাং উদয়সাগরকে বাদ দিলে রাজসিংহ উপন্যাসে সৌষ্ঠবহানি হত না। অথচ সমগ্র উপন্যাসখানি পাঠের শেষে উদয়সাগরের সজল অন্ধকার আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জমাট বেদনার মত জেগে থাকে। মবারক, জেব-উন্নিসা, আর দরিয়ার দ্বন্দ্বকঠিন ট্রাজেডিচিত্রের পটভূমি হিসেবে পর্বতবেষ্টিত উদয়সাগর সার্থকতা লাভ করেছে। উদয়সাগরের একটি সুন্দর বর্ণনা উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকেই লাভ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের স্পর্শমণির অলক্ষ্য স্পর্শ যে শাহাজাদীরও গর্ব ও বিলাসের চূড়া থেকে ধূলায় নামিয়ে আনে, সামান্য একজন সেনানায়কের জন্য অশ্রু আকুল করে তোলে। উদয়সাগরের নিভৃত প্রাসাদে মবারক জেব-উন্নিসার প্রেমচিত্র তারই নিদর্শন।

২৭। ইন্দিরা : ১ম খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ।

২৮। ঐ : ঐ ১৮শ পরিচ্ছেদ।

২৯। রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড, ১৪ পরিচ্ছেদ।

অরণ্য ও পর্বতে মানুষ

কপালকুণ্ডলা :

অরণ্য আদিমশক্তির অন্যতম প্রতীক। এই আদিমতা যেমন প্রাকৃতিক ধর্মে অযাচিত করুণাময়ী তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অকল্পনীয়া নিষ্ঠুরা। এই প্রকৃতিই মরুভূমিতে মরুদ্যানের সজল কল্যাণ বিস্তার করে, আবার সেইভাবেই মরীচিকার হাতছানিতে পথিকের সর্বনাশ করে।

তাই অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যেই, নবকুমার দেখেছিলেন, মূর্তিমতী সৌন্দর্যরূপিণীকে, শুনেছিলেন অমৃতক্ষরা কণ্ঠস্বর: 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' আবার এই অরণ্যভূমিতেই মহামায়ার করালশক্তিরূপী কাপালিকের আবির্ভাব।

এই অরণ্যেই কপালকুণ্ডলা তাঁর ধাত্রী নিসর্গের আহ্বান শুনেছেন। আবার এই বনভূমিই মতিবিবির চক্রান্তের উপযুক্ত ভূমি। এই অরণ্যের অন্ধকার এবং লতাগুল্মের জটিলতাই নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে। তাঁর মনে হিংসার শ্বাপদসঞ্চার ঘটিয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মর্মমূলে অরণ্যসঙ্গীত। অরণ্য এখানে শুধু পটভূমি নয় কাহিনীর প্রাণশক্তি। ভাগ্যের এক অমোঘ নির্দেশের মত বনভূমি উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে আকর্ষণ করেছে; কপালকুণ্ডলা অরণ্যসত্তার সঙ্গে একাত্ম, নবকুমার ভাগ্য-বিপর্যয়ে বনভূমিতে আগন্তুক। কিন্তু বনভূমিতে দুজনের এই সাক্ষাৎকার কল্যাণকর হয় নি; যেন বনদেবতার বিরূপতায় নায়ক-নায়িকা চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আরণ্যপ্রকৃতি অরণ্যে পরিত্যক্ত নবকুমারকে অন্তেবাসীর মত দূরে না রেখে একেবারে অন্তঃপুরে টেনে নিয়ে রহস্যের দ্বার খুলে দিলেন।

'……দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়।……সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র।……রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক

বালুকাস্তূপশ্রেণী……স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে।'[১]

'কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া……বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাহারা ক্ষণকাল জন্য অপূর্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছুদূর আসিয়া আশ্রম কোন পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র।'[২] ……তারও পরে নবকুমার—'সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবা মাত্র দেখিলেন……সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি।'[৩]

নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার এই প্রথম সাক্ষাৎকার যতই রমণীয় হোক এর নেপথ্যে যেন বনদেবতার ক্রোধবজ্র উদ্যত হয়ে উঠেছে।

অরণ্যদেবতার দুর্নিবার আকর্ষণ ভয়ালরূপে দেখা দেয় কপালকুণ্ডলার গৃহসন্নিধানের অরণ্যসীমায় অরণ্যসত্তার লৌকিক দূত যেন কাপালিক, ভাগ্যের মত অমোঘ তার দাবী। তারই মধ্য দিয়ে পলাতকা কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করেছে অরণ্যপ্রকৃতির ক্রুদ্ধ আহ্বান। এই দুর্যোগক্ষণের পূর্বলগ্নে সপ্তগ্রামের নিবিড় অরণ্যে ওষধিসন্ধানী কপালকুণ্ডলার মুগ্ধমনের সম্মুখে বনভূমি জ্যোৎস্নাস্নাত শান্ত সৌন্দর্যের বিস্তার করেছে। এ যেন অপহৃতা অরণ্যসন্তানকে আকর্ষণ করবার দুর্বার তৃষ্ণায় বনদেবতার মায়াজাল।

"গ্রামের কিছুদূরে নিবিড় বন……যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্ম মধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন শব্দ; কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাত

১। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৩। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

শব্দ ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের কচিৎ গতিজনিত শব্দ ; কচিৎ অতিদূরস্থ কুক্কুররব।......"[৪]

কিন্তু পটপরিবর্তন হল ক্রমশঃ। কপালকুণ্ডলা 'যে পথে যাইতেছিলেন তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল ; বন নিবিড়তর হইল ; মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না।'[৫]

... ...

...আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল ; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা...শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্‌ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ...'[৬]

কাপালিকের এই পদধ্বনি যেন কপালকুণ্ডলার গৃহজীবনে অরণ্যসত্তার অনুসরণ, যেন আরণ্য প্রতিহিংসার পূর্বাভাস।

চন্দ্রশেখর :

'গাঢ়, অনন্ত, সর্বাবরণকারী অন্ধকার......সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।......ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল।...শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না।......

স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্রজন্তুপরিবৃত পর্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।......পথ নাই—লতা, গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার।......এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী তলস্থ নবরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার-মাত্রাত্মক শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই।......

৪। কপালকুণ্ডলা : ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ
৫। ঐ : ঐ ঐ ।
৬। ঐ : ঐ ঐ ।

তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপর শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে।······শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।'[৭]

'মহান্ধকারময় পর্বতগুহাপৃষ্ঠচ্ছেদী' উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার···অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ—নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্‌টাপ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু কে জানে? সেই গুহামধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।'[৮]

বিবাহের পুণ্য-সংস্কারের মধ্য দিয়ে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের অনুগামিনী। 'প্রতাপ-পাখী' ধরবার অসম্ভব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গী শৈবলিনীকে শেষ পর্যন্ত পুনরাশ্রম পেতে হয়েছে চন্দ্রশেখরের ক্ষমার উদার নীড়টিতে। কিন্তু তার আগে এই বিপথচারিণীকে সংহত করে তার বিভ্রান্ত মনকে দুঃখের কঠিন প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন লেখক। তারই জন্য সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি নিষ্ঠুর আয়োজন; ঘন দুর্যোগরাত্রির গাঢ় অন্ধকারে ভীষণতর পার্বত্যপরিবেশে। রেনেসাঁস সংস্কৃত মানসিকতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করলেও অনৈসর্গিকতাকে স্বীকার করতে চাননি। অথচ অতিপ্রাকৃতের পরিমণ্ডলের রহস্যের আলো অন্ধকারময় অনুভূতির মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের রূপ হয় ভয়ঙ্কর। হিন্দুর গতানুগতিক সামাজিক প্রায়শ্চিত্তরীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসী নন, প্রায়শ্চিত্তের মানসিক প্রক্রিয়ার ওপরই মনে হয় তাঁর আস্থা অধিক, শৈবলিনীর মানসপ্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্যই হয়ত এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র মুঙ্গেরের এই পর্বত, কণ্টকময় পার্বত্যবনভূমি ও সর্বোপরি ভয়ঙ্কর পার্বত্য-গুহার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই পর্বত, বনভূমি, 'মহান্ধকারময়, পর্বতগুহা' সকলের সম্মিলিত প্রভাবে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তচিত্র ভয়ানক রসে সমৃদ্ধ হয়ে :। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত পার্বত্যপরিবেশ ও তারই সঙ্গে

৭। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৮। চন্দ্রশেখর: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

শৈবলিনীর যন্ত্রণাময় অনুভূতি গ্রন্থের এই বিশেষ উদ্দেশ্যটিকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

আনন্দমঠ :

'অতি বিস্তৃত অরণ্য অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্তশ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার।

……একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। ……কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়……।'[৯]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পূর্বাভাস রচিত হয় এই অন্ধকারমহারণ্যের উপস্থাপনায়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই বিশাল বনভূমি যেমন ভয়াবহ, তেমনি রহস্যময়। সব চাইতে বিস্ময়কর অরণ্যের অপূর্ব স্তব্ধতা—সেই নৈঃশব্দ্য মানুষকে অভিভূত, বিমূঢ় করে দেয়। মনে হয় যেন অরণ্যরূপী কোন মহাসাধক, অলকানন্দাতটবর্তী দেবদারুবনে ধ্যানস্থ শঙ্করের মতো তপোমৌনী, বাতাসের এতটুকু গুঞ্জন, পত্রপল্লবের একটি মর্মরও সেই তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে সাহস করছে না।

'বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'[১০]

এই আকুল জিজ্ঞাসার যে উত্তর অরণ্যের মহামৌন থেকে উৎসারিত হয়েছে, তাও রহস্যময় যেন কোন আর্ত সাধকের প্রার্থনায় দেবলোকের বাণী—যেমন করে প্রাচীন গ্রীক-মন্দিরে 'ওর‍্যাক্‌ল' মন্দ্রিত হয়ে উঠত, এ যেন ঠিক তাই। এই রহস্যময় নিশীথ বনানী, এই তপস্যার মতো অকল্পনীয় মৌন, অশরীরী দুই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, এরা সূত্রপাতেই আনন্দমঠকে এক অনন্য স্বতন্ত্রতা দিয়েছে।

'শব্দ হইয়া সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল?……তোমার পণ কি?'……'ভক্তি'।'[১১]

৯। আনন্দমঠ : উপক্রমণিকা।
১০। ঐ : ঐ
১১। আনন্দমঠ : উপক্রমণিকা।

'উপক্রমণিকা'র এই আরণ্যক মহারাত্রি এবং সংকেত গভীর সংলাপের মধ্য দিয়ে সাধনা, জীবনপণ এবং ভক্তির যে মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হয়েছে তাই-ই 'আনন্দমঠ'-এর ধ্রুবপদ। এ থেকেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি, এই উপন্যাসের গতিপরিণতিতে অরণ্য একটি মুখ্য ভূমিকা অধিকার করে আছে। 'রবিনহুড' কাহিনীর 'শরডডের' মতো অথবা আর, এল, স্টিফেনসনের 'ব্ল্যাক অ্যারো' উপন্যাসের বনভূমির মতো 'আনন্দমঠে'র কাহিনীর সঙ্গে অরণ্য অঙ্গাঙ্গী। মূল উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্র সিংহের মন্বন্তরের তাড়নায় সপরিবারে গৃহত্যাগ করবার পরে। মহেন্দ্র পথিমধ্যে একটি পরিত্যক্ত চটিতে পত্নী কল্যাণী এবং শিশুকন্যা সুকুমারীকে রেখে দুগ্ধের সন্ধানে গেলে কল্যাণী দস্যুদল কর্তৃক অপহৃতা হলেন। এই দস্যুরা সকন্যা কল্যাণীকে নিয়ে প্রবেশ করল উপক্রমণিকার সেই আনন্দারণ্যে। কাহিনী তার নাটকের মধ্যে পদক্ষেপ করল।

কল্যাণীকে অপহরণ করে যেখানে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে অরণ্যের সৌন্দর্য অপরূপ। খুব অল্প কথায় এখানে বনের রূপ অতি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে :

'যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক বনে ফুল আছে ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল।'[১২]

এরপরে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বার বার অরণ্যের পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত বিবরণ এসেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দস্যুদল অনুসৃতা পলায়নপরা কল্যাণীর চতুষ্পার্শে যে বনভূমি বিকশিত হয়েছে, তা একাধারে যেমন ভয়াল, তেমনি রমণীয় :

'বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার:। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া

১২। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

নিরস্ত হইবে ; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল, ভিতরে বনের অন্ধকার আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরো আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন।'[১৩]

এই অরণ্যসৌন্দর্য কখনও জলকল্লোলের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে—

'এক স্থানে আরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে।...... দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ, নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর, নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে! · ...'[১৪]

এই আশ্রম-অরণ্য কখনও দিনরাত্রির আলোঅন্ধকারে সৌন্দর্যের মায়াজাল বিস্তার করে, কখনও তাতে রণদুর্গের কৌশলময় পরিবেশ প্রতিভাত হয়।

'সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির ও সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরবেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে।......দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে।'[১৫]

আনন্দমঠের অবস্থিতির পক্ষে যোগ্যতম পরিবেশ, ভগ্ন শিলাখণ্ডসমূহ থেকে বোঝা যায়—প্রাচীনকালে এখানে দেবালয়াদি বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন মন্দির এবং সন্তানাশ্রম রচিত হয়েছে। এই পরিবেশ যেমন ভক্তসাধকের তদ্গত সাধনার অনুকূল, তেমনি সন্তানদের যে বিদ্রোহী কর্মোদ্যম, তার পক্ষেও অত্যন্ত সুবিধাজনক। এখানে কোনো বহিরাগত

১৩। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।
১৪। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।
১৫। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

সন্তানদের তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, আবার কোনো রাজপুরুষের পক্ষেও আনন্দারণ্যের এই কেন্দ্রটির সন্ধান পাওয়া অসম্ভবপ্রায়।

দেবী চৌধুরাণী :

উত্তরবঙ্গের এক অরণ্যঅঞ্চল সাধারণ এক গ্রাম্য বধূকে অসাধারণ নারীত্বে মহিমান্বিতা দেবী চৌধুরাণী রূপে গড়ে তুলে প্রফুল্লর ভাগ্যবিধাতা যেন দরিদ্রের কুটীরের এক মুষ্টি ধুলিকে তুলে নিয়ে স্বর্ণাঞ্জলিতে পরিণত করলেন। অরণ্যভূমি এল অভিশাপের ছদ্মবেশে আশীর্বাদ নিয়ে। ভবানীপাঠকের শিক্ষায় প্রফুল্লর জীবনে অভিনব রূপান্তর ঘটল। এই অরণ্যভূমির যন্ত্রাগারে অসংস্কৃত নগণ্য একটি অয়সখণ্ডকে ইস্পাতের তরবারিতে রূপায়িত করলেন ভবানীপাঠক—তা যেমন দীপ্ত, তেমনই খরধার। অথবা বলা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর অনুশীলন-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ ঘটালেন প্রফুল্লর মাধ্যমে, তৎকালীন সমাজের কোনো দরিদ্র কন্যা অথবা ধনীগৃহের কোনো কুলাঙ্গনা তাঁর মৌল চারিত্রিক উপাদান যেমনই হোক—এই রকম আরণ্যপরিবেশ ছাড়া তাঁকে এভাবে শিক্ষিতা করা যেত না। পরিবেশ ও অদ্ভুত ভাগ্যবশেই প্রফুল্লর শিক্ষা সম্পূর্ণ সহায়ক হয়েছে। তার আরণ্যজীবনে প্রবেশের ঘটনা, সেখানকার আত্মগঠনপর্ব ও জীবনধারা ইত্যাদি লক্ষ্য করলে মনে হয় 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে অরণ্যকে পটভূমি করার প্রধান কারণ এই।

দুর্বৃত্ত দুর্লভচন্দ্র প্রফুল্লকে রাত্রের অন্ধকারে অপহরণ করে নিয়ে চলেছিল। জঙ্গলের কল্পিত বিভীষিকা ভীরুর লোভ থেকে প্রফুল্লকে রক্ষা করল। তারপর ভাগ্যের অলক্ষ্য নির্দেশে প্রফুল্ল অজ্ঞাতেই অরণ্যমাতৃকার একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। আশীর্বাদের মতই বনলক্ষ্মী আপন মৃত্তিকাতল থেকে বিপুল ঐশ্বর্য অন্নহীনা প্রফুল্লর হাতে তুলে দিলেন।

"প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে।............

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল......শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট..... ...যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ……….।'[১৬]

তারপর প্রফুল্লর অট্টালিকার নীচে বিশঘড়া ধনের প্রাপ্তি। পরবর্তী কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ভবানীপাঠকের বরকন্দাজদলের রাণী—দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর 'দরবার' বা 'এজলাস'ও বসত জঙ্গলে—বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে।

'নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। ………বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে।……প্রায় দশ হাজার লোক…………।'[১৭]

এই জঙ্গলরাজ্যের 'দেবী'র দরবারে 'রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।' 'অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দেবী ভগবতীর অংশ লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ।………'[১৮]

আরণ্যভূমির এক দেশপ্রেমিক গুরু অরণ্যআশ্রমে কী করে সামান্যা পল্লী-বালিকাকে মহিমান্বিতা দেশজননীতে রূপান্তরিত করতে পারেন উপরোক্ত ঘটনাবলী তারই পরিচায়ক।

আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে অরণ্যভূমিকা :

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' এই উপন্যাস দুটিতেই তত্ত্বের প্রকাশ। উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থদুটি কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে বিষয় অন্যত্র আলোচ্য। বিদেশী শাসনের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের লক্ষ্য। জাতি পরাধীন, এদেশে শৌর্যবীর্য, অস্ত্র, দুর্গ সবই দুর্লভ। কিন্তু বাঙালীর লাঠি তখনও ছিল, আর ছিল অরণ্যদুর্গ। বিদ্রোহী জাতি হিসাবে বাঙালীর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল না, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিমানসে স্বদেশপ্রেমিক সৈনিককে লাঠিয়াল দস্যুর বেশে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। তাঁদের হাতিয়ার লাঠি, অনুশীলিত দেহবল ও মনোবল আর সর্বোপরি অরণ্যদুর্গ ঘন জঙ্গলের আচ্ছাদনে আত্মগোপন। রাজসিংহ উপন্যাসে রাজপুতজাতির হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বলন্ত; তাদের যুদ্ধ পর্বতকে আশ্রয় করে, প্রস্তরখণ্ড তাদের বিশিষ্ট অস্ত্র। বাঙালীর পাহাড় নেই,

---

১৬। দেবী চৌধুরাণী : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

১৭। দেবী চৌধুরাণী : ২য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

১৮। দেবী চৌধুরাণী : ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

বনজঙ্গল আছে। 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী'র অনুপ্রেরণা, মূলে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ এবং দেবীচৌধুরাণী নামে পরিচিত দস্যুনেত্রীর কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুটি কাহিনীর মাটি দিয়ে চিন্ময় মূর্তি গড়েছেন। এই কাহিনী দুটি অরণ্যের বুকেই প্রস্ফুটিত, শাখা পল্লবিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটি উপন্যাসেও অরণ্যের সামান্য প্রভাব আছে কিন্তু সেগুলির গুরুত্ব সমধিক নয়।

রাজসিংহ :

দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতির অপরিমেয় বীর্য আর যুদ্ধকৌশলের পরিচয় আমরা রাজসিংহ উপন্যাসের মধ্যে পাই। এই উপন্যাস ঐতিহাসিক। কাহিনীর সঙ্গে রাজপুত মোগল সংঘর্ষের ইতিহাস ওতঃপ্রোতোভাবে মিশে আছে। বনকোলাহলমুখরিত ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে রাজপুতনারীর অতুলনীয় সৌন্দর্য, রাজপুতনার শৈলদুর্গ, পার্বত্যপরিবেশ ও আরণ্যক রুদ্রতা। তাই মহাকাব্যোপম রাজসিংহ উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলির মত গিরি-পর্বত-বনভূমিও বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এই গ্রন্থে উপস্থিত হয়েছে।

শৈলশিখর, পার্বত্যগুহা এবং সংশ্লিষ্ট অরণ্যভূমি 'রাজসিংহের' সামরিক সংঘর্ষের প্রধান অকুস্থল। এই বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বীর রাজপুতজাতির প্রতি তার আনুকূল্য আমাদের রুশদেশীয় 'General Winter'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। শীত ঋতুর ভয়াবহতায় একদিন বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ানকে সর্বস্বান্ত হয়ে রুশ অভিযান থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ঠিক এই ভাবেই পার্বত্য নিসর্গের সহযোগে রুদ্রপ্রতাপ সাহান্‌শা আলমগীরকেও রাজপুতনার গিরিসঙ্কটে 'পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিকের' মতো পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। এই পার্বত্য রণকৌশলের নমুনা হিসাবে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আওরংজেব প্রেরিত মোগল 'অশ্বারোহী সেনা পার্বত্যপথে চলিল।......বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় এই অশ্বারোহীশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।......হঠাৎ......বিকট শব্দ...... পর্বত শিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে।...... বুঝিতে না বুঝিতে......আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল...তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি..........এই পর্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয় তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ

বাহির করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক একজন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আপন আপন সম্মুখে একটি একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহী-দিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল।............'[১৯]

স্বল্পসংখ্যক রাজপুত সেনার বীর্যবত্তা ও রণকৌশলের কাছে এই ভাবেই মোগল শক্তি বার বার পরাজিত হয়েছে। রাজসিংহ উপন্যাসের কাহিনীতে ব্যাপ্ত করে আছে এই জয়-পরাজয়ের ইতিহাস।

এই উপন্যাসের অন্যত্র পর্বতমালার পটভূমিতে শাহাজাদী আর সেনাপতির অদ্ভুত অসমপ্রেমের অশ্রুসজল কাহিনী রচনা করেছেন লেখক।

'সহস্র দীপের রশ্মি প্রতিবিম্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডলের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেবউন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল।.........

সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিত গগনস্পর্শী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল তাহাতে দীপমালা প্রভাসিত পট-নির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চূড়া তার উপর চূড়া বড় অন্ধকার। দুই জনে বড় অন্ধকারই দেখিল।'[২০]

১৯। রাজসিংহ : ৮র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২০। রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি কবির কাছে চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার। নীল আকাশ আর অসীম সমুদ্র তার দৃষ্টির সামনে অনন্তের দ্বার মুক্ত করে দেয়; পর্বতের তুষারশীর্ষে প্রকৃতির নিভৃত রহস্য মগ্ন হয়ে থাকে ধ্যানমৌনী রূপে; পাখির কাকলিতে দেবলোকের বাণী সে শুনতে পায়, তার মনে হয়:

"That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart.
In profuse strains of Unpremeditated art."[১]
(To a Skylark)

আর ঋতুচক্র। সে এক নিরবচ্ছিন্ন নৃত্যলীলা—আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নিত্য মুক্তি। এই ঋতুলীলায় কবি বিশ্বনটরাজের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন, প্রার্থনা করেন:

'নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাচের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।'[২]

এই উৎসবে যারা সহচরী, তারা হল ফুলের দল। ঋতুসঙ্গিনী এই পুষ্পরাজি গ্রীষ্মের দারুণ দহনে বকুল চাঁপা হয়ে দেখা দেয়; বর্ষার কদম্ব-কেতকী যূথীর অর্ঘ্য সাজায়; শরতে শুভ্র শেফালী, পদ্ম আর কাশফুল শারদ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি হয়ে ওঠে, বসন্ত শিমুলে-পলাশে-রঙ্গনে-কৃষ্ণচূড়ায় অরণ্যে বহ্নি জ্বালিয়ে তোলে।

কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচেতনার প্রাথমিক উদ্বোধন ঘটে গ্রাম্যপ্রকৃতির সাহচর্যে। বাংলাদেশের শুভ্র-সুগন্ধি পুষ্পরাজি তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু রোম্যান্টিক ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রকৃতি ও পুষ্প অনুরাগের উৎস তাঁর কৈশোরের দূরচারী কল্পনার সঙ্গী 'ফুলবাগান,' অর্জুনাদীঘি, গ্রামের খাল, খালের ধারের লতাবিতান, ঝোপ-জঙ্গলে ভরা খালে যাবার দুর্গম পথ।

গ্রামের অর্জুনাদীঘির পাড়ের নীচে দশ-পনের বিঘা জমির উপর বঙ্কিমচন্দ্র আপনহাতে ফুলবাগান তৈরী করেছিলেন। ফুলের আর ফলের গাছে সেই বাগান সুসজ্জিত ছিল, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'ফুলের বাগান'। হুগলী কলেজের

১। P. B. Shelley
২। 'নটরাজ'—বনবাণী; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগান থেকে ভাল ভাল গাছ এনে স্বহস্তে রোপণ করে এই বাগান তিনি সাজিয়ে তুলেছিলেন। এই বাগানে অর্জুনাদীঘির তীরে নির্মিত সুন্দর একটি লতাগুল্মে আচ্ছাদিত গৃহে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিভৃত কাব্যসাধনা করতেন। হয়ত এই পুষ্পদীঘিই ছিল তাঁর কবিসত্তার প্রেরণার উৎস। এই পুষ্পোদ্যানের প্রভাব তাঁর কবিতাতে আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করতে পারি। 'অধঃপতন সঙ্গীত' কবিতার প্রথম স্তবকেই দেখি :

'বাগানে যাবি রে ভাই? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সরোবর তীরে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকাজাতি,
বিগ্নোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে।
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকর লেখা তাহে, বিজলি চমকে ॥'[৩]

এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে তাঁরই উদ্যানের প্রতিচ্ছবি। ফুল এবং জলের সান্নিধ্য, সম্ভবতঃ অর্জুনা পুষ্করিণীর প্রভাবেই, তাঁর অনবদ্য 'জলে ফুল' কবিতাটি সৃষ্টি করেছে :

॥ ১ ॥

'কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন বনে
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

॥ ২ ॥

কে আনিল তোরে ফুল তরঙ্গিনী তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে।'[৪]

৩। 'অধঃপতন সঙ্গীত' : বঙ্কিমচন্দ্র, ' বা কবিতাপুস্তক।'

৪। 'জলে ফুল' : বঙ্কিমচন্দ্র, ' বা কবিতাপুস্তক'।

উত্তরকালে এই পুষ্পরাজি বঙ্কিমের বিবিধ উপন্যাসে নায়িকাদের জীবনপট নির্মাণে সহায়তা করেছে, অনেক সময় তাদের দুঃখসুখের সঙ্গে অভেদাত্মক হয়ে উঠেছে। রজনীর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে, মৃণালিনী যেন স্বয়ং দুঃখ-সরোবরে একটি হিমনিষিক্ত শতদল। মনে হয় তারা এই ফুলবাগানেরই বিচিত্র ফুলরাজি।

অর্জুনাদীঘির এই পুষ্পোদ্যান আর গৃহের একটি পূর্ণতর চিত্রই যেন পাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে,' গোবিন্দলালের সেই বারুণী পুষ্করিণী, উদ্যান ও গৃহটির বর্ণনায়। এই অর্জুনাদীঘি আর পুষ্পোদ্যান যে বঙ্কিমমনের কী মুগ্ধভাব আর প্রীতিতে জড়িত বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনাই তার পরিচয় দেয়—'বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জঁাকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা নানা ফলের পাতর বসানো। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলো এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপরে আকাশ, সেও সেই বাগানের ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।'[৫] অন্যত্র বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে ও নিজের ফুলবাগানকেই যেন সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত করেছেন। 'দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারিবার বেড়াইতেন।'[৬]

বারুণীর পুষ্পোদ্যানের বর্ণনায় বঙ্কিম বলেছেন—'বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রী-প্রতিমূর্ত্তি

৫। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।
৬। বঙ্কিম জীবনী : শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১।

……তাহার চারিপার্শ্বে বেদিকা উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল, পীত, রক্ত, শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারি পাতার গাছের শ্রেণী।'[৭]

কাহিনীর বস্তুগত প্রয়োজনে ফুল এবং সম্পর্কিত প্রকৃতির বাস্তব বর্ণনা ছাড়াও নিসর্গের ভাবগত উপস্থাপনাতেও বঙ্কিম অনন্য শিল্পী। মানুষের হৃদ্‌বৃত্তির ঘাত-সংঘাত, বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত অথবা প্রতীকী অভিব্যঞ্জনা—এসব ক্ষেত্রেও তিনি সার্থকভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। এই দ্বিতীয় প্রয়োজনেও তিনি অর্জুনাদীঘির কাছে ঋণী। দীঘি ও উদ্যানের অদূরবর্তী সর্পভয়জড়িত এবং বনাচ্ছন্ন নির্জন খালটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র কথনো কথনো একাকী এই পথ দিয়ে বেড়াতে যেতেন, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হতো, খালের কালো জল, জঙ্গল এবং অন্ধকার—সব মিলে তাঁর মনে যে মৃদু শঙ্কার শিহরণ রচনা করত, 'আনন্দমঠ' অথবা 'দেবী-চৌধুরাণী'র অরণ্যভূমি কল্পনায় হয়তো তা লেথকের চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আসন্ন সন্ধ্যায় ছায়াচ্ছন্ন লতাবিতানে উপবেশন, ঘনায়মান অন্ধকারে ভয়চকিত খালের দুর্গমপথে নিঃসঙ্গচিন্তায় মগ্ন হয়ে চলতে চলতে হয়ত অদৃষ্টের ইসারাপাঠেরই চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে শচীশচন্দ্রের একটি বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ হইতে খাল বেশী দূর নয়—অর্জুনাদীঘির কিছু দক্ষিণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কথন কথন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লতাবিতান তলে বসিতেন। বসিয়া কথন 'শস্যশ্যামল' প্রান্তরপানে চাহিয়া থাকিতেন, কথন স্তরপরম্পরা বিন্যস্ত 'শ্বেতাম্বুদমালা বিভূষিত' আকাশপানে চাহিয়া থাকিতেন, কথন 'জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থিরমূর্তিতে' বসিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালার তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেন।"[৮]

উপন্যাসের পাতায় পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র যে গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্যময় নিসর্গচিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাঁর শিল্পীমানসে এইভাবেই তাঁর প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল।

৭। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৮। বঙ্কিম-জীবনী : পৃঃ ৩৩ : শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবি কেবল যে তাঁর সৌন্দর্য আস্বাদন করেন, তাই নয়, তাঁর চোখও সেই নিসর্গের রূপাঞ্জনে নন্দনদৃষ্টি লাভ করে ; তখন বস্তুজগতের প্রিয়পরিজনও সে অঞ্জনে রঞ্জিত হয়। তখন শিশুর মুখে তিনি প্রথম ফোটা যূথীর পবিত্রতাকে প্রত্যক্ষ করেন, মায়ের হাসিতে শরতের শেফালী ঝরে এবং প্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয় :

'চঞ্চল লোচনে বঙ্ক-নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলথ
অলিভরে উলটায়।' (বিদ্যাপতি)

কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাকেও সমৃদ্ধ করেছে অনুরূপ কল্পনার স্পর্শ :

'বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে—'[৯]

প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন পুষ্প। পুষ্পের স্বভাবসম্পদ শিল্পীর সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে বিচিত্রভাবে। এখানে আমাদের আলোচ্য, শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পুষ্পানুরাগ ও কথাশিল্পে তার প্রতিফলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে পুষ্প ও পুষ্পোদ্যানের যোগ সুনিবিড়। তাদের জীবনের হাসিকান্না আঘাত সংঘাতের সঙ্গে সেই পুষ্পরাজি হেসে উঠেছে, ঝরে পড়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পুষ্পোদ্যানপ্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের মনোহর পুষ্পোদ্যান তাঁদের ভয়াবহ ট্র্যাজিডির অনুষঙ্গী। ভ্রমরের মৃত্যুর পর—

'গোবিন্দলাল……ভ্রমরের শয্যাগৃহ তলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন…সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে। দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফোটে না।'[১০]

৯। 'আদর' : বঙ্কিমচন্দ্র, 'গদ্য-পদ্য বা কবিতাপুস্তক
১০। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

অন্যত্র—'বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যানে · — ফল ফলে না……বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।'[১১]

লেখকের পুষ্পপ্রীতি শুধু কয়েকটি ফুলের নামোচ্চারণ বা ফুল বাগানের বর্ণনার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকেনি, তাঁর সমগ্র অনুভূতিই যেন পুষ্পবাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির অপূর্ব কাব্যসুষমা হয়ত তারই ফলশ্রুতি। প্রাচীন কবি ও অলঙ্কারিকদের প্রচলিত রীতির অনুসরণে পুষ্পবিশেষণযুক্ত অনেক অলঙ্কারই তিনি তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও এইসব অলঙ্কার এবং চিত্রকল্পের সুনির্বাচিত ও সুচিন্তিত প্রয়োগে একাধারে তাঁর রসবোধের গভীরতা অন্যদিকে তাঁর বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিভা প্রকটিত হয়েছে।

রসিকপাঠকের অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্তরে পর্যন্ত বিস্ময়ের দোলা দিয়েছে। প্রাচীন রীতির অনুসরণে জলনিমগ্না মৃতপ্রায়া রোহিণীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

'……অধর এখনও বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।'[১২]

কালিদাসকৃত সজাতীয় উপমা স্মরণ করা যেতে পারে, 'তন্বীশ্যামাশিখরিদশনা-পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।'[১৩]

'পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখসুধাকরে সুধাহাস।'[১৪]

'বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভি—
বন্ধু বপূ ভিঃ প্রতুষিতাম্॥'[১৫]

অলঙ্কার নির্মিতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তা পাঠককে অভিভূত করে—

'কুন্দনন্দিনীতে যেন পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।'[১৬]

লেখকের অসাধারণ অলঙ্কার বিন্যাস তাঁর মানসলোকের সূক্ষ্মতম স্পন্দনটিও

১১। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

১২। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

১৩। মেঘদূতম্ (উত্তর) ২১ সংখ্যক।

১৪। অন্নদামঙ্গল—ভারত রায়গুণাকর।

১৫। রঘুবংশম্। ১১।২৫॥

১৬। বিষবৃক্ষ : ৫ম পরিচ্ছেদ।

বহন করে আনে—দয়িত শচীন্দ্রের স্পর্শে অন্ধ রজনীর সুগভীর প্রেমানুভূতি অতুলনীয়:

'সে নবনীতসুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ……।'[১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের পুষ্প-প্রীতির পরাকাষ্ঠা 'রজনী' উপন্যাসের নায়িকা স্বয়ং অন্ধ নারীর মানসিক আবেগ পুষ্পসৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। অর্জুনাদীঘির তীরে 'ফুলবাগানে' কিশোর বঙ্কিমও হয়ত রজনীর মতোই ফুলের রাজ্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।

ফুল সাহিত্যের প্রধানতম ঐশ্বর্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্যেও কুসুমসম্ভার বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির এই অনন্য উপচারটি বঙ্কিমচন্দ্র দুই হস্তে চয়ন করেছেন। কতকগুলি ফুল তাঁর সাহিত্যে বার বার এসেছে, হয়তো কোনো বিশেষ মানসিক প্রবণতাই তার কারণ। মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হিসেবেই নয়; সেই বিশেষ ফুলগুলিকে তিনি রূপ বা গুণ বর্ণনার আনন্দিত শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কার প্রয়োগে এবং মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনেও ব্যবহার করেছেন।

প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের ফুল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। কখনো কাহিনীস্থিত কোন উদ্যানপ্রসঙ্গে, কখনো চরিত্রবিশেষের আলঙ্কারিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে, কখনো বা পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে এদের দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে। এই পুষ্পমেলায় জিরানিয়ম্, ইউফর্বিয়া, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, অরকেরিয়া প্রভৃতি বিদেশী ফুলও বিচিত্র রং আর রূপের শোভা বিস্তার করে দুই একবার দেখা দিয়েছে সৌখীন ধনী গোবিন্দলালের সাধের পুষ্পোদ্যানে —

'বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে…বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ'[১৮]—হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোরের 'ফুলবাগান' এর স্মৃতির পথ ধরেই তারা এসেছে। বিদেশী ফুল আর একবার দেখি এই বারুণীর উদ্যানেই, কিন্তু সে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যানের ধ্বংসাবশেষের উপর ভ্রমরের স্মৃতির উদ্যান। সে শুধুই শ্বেতপুষ্পের অঞ্জলি—'আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।'[১৯]

১৭। রজনী: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।
১৮। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।
১৯। কৃষ্ণকান্তের উইল: পরিশিষ্ট।

লেখকের কাছে বার বার যাদের ডাক পড়েছে তারা দেশী সুগন্ধি ফুল। বর্ণের উজ্জ্বলতা বা রূপের সমারোহে যারা মানুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায় না, শুভ্রতায় যারা স্নিগ্ধ পবিত্র এবং গন্ধের মাদকতায় বিহ্বল না করে যারা ভাবের মাধুর্যে মনকে পরিপূর্ণ করে তারাই বঙ্কিমের প্রিয় এবং মমতাস্নিগ্ধ। পুষ্পনির্বাচনের প্রবণতা তাঁর অন্তরলোকের একটি বিশেষ পরিচয় পরিস্ফুট করে। বঙ্কিমের কবিসত্তা অন্তর্মুখী, রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু রূপাতীত তাঁর ধ্যানীচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই দয়িত শচীন্দ্রের স্পর্শে রজনী বলে—

'সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম। সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরশে ফুল, আমার বুকের ভিতরে ফুলের রাশি।'[২০]

লেখকের অলঙ্কার সৃষ্টিতেও লক্ষিত হয় তাঁর এই পুষ্পপ্রীতি। আবেগ ও সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণে কী স্নিগ্ধ সুষমা লাভ করেছে এই অংশটি :

'ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝরঝর করিয়া পড়িয়া যায়। রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।'[২১]

... ...

কবিতায় এবং সাহিত্যের অন্য যে কোন প্রয়োজনে ফুলের ভূমিকা অসামান্য। তিনদিক থেকে তার মহিমা। (ক) প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডারে সে মণিরত্নের সমারোহ, (খ) তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌন্দর্যরূপ আছে—যেখানে তার মাধ্যমে এক একটি বিশ্বসত্যও বিকশিত হয় : যেমন হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা'। (গ) নারীর, বিশেষভাবে প্রেয়সীর কল্পনায় পুষ্পের উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির ব্যবহার। যেমন :

'ধূপের ধোঁয়ার কেশটি শুকায়
বিনিসুতার হার সে গড়ে,
দোলন-চাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে।'[২২]

২০। রজনী : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
২১। রাধারাণী : ৫ম পরিচ্ছেদ।
২২। কিশোরী : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এ ছাড়াও অন্যবিধ প্রয়োগ কিছু আছে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণরূপে স্বয়ংসিদ্ধ একটি সৌন্দর্য বা তত্ত্বরূপে এবং রূপবর্ণনায় আনন্দিত শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার প্রয়োগে ফুল সাহিত্যের একটি প্রধান সামগ্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক রূপেই অক্ষয়খ্যাতির অধিকারী হলেও অন্তরধর্মে তিনি ছিলেন কবি—রোম্যান্টিক কবি। রুশোর ভাবধারার অনুসরণে যে রোম্যান্টিকতা ফরাসি দেশ থেকে সারা ইয়োরোপে উচ্ছলিত হয়ে পড়ল, তারও মর্মকেন্দ্রে প্রকৃতি-প্রেম। রুশো এক জায়গায় বলেছেন, 'বিশ্বস্রষ্টার হাতে সব চমৎকার ভাবে চলেছিল, কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপেই সমস্ত কিছু বিকৃত হয়ে গেল।'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে এই রুশোরই ভাবশিষ্য। তাঁর "Social contract" ('Le Contract Sociale') থেকে যেমন তিনি সাম্যতত্ত্বের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন তেমনি প্রকৃতিপ্রেমও লাভ করেছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় যেন রুশোর চিন্তারই একটি তির্যক প্রতিফলন।

বঙ্কিমের প্রথম দিকের কবিতায় আদিরসের প্রাধান্য থাকলেও তাতে প্রকৃতির ভূমিকাও অপরিসীম। তাঁর প্রথম কাব্য 'ললিতা'র পাতা থেকেই নিদর্শন পাওয়া যাবে:

'স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারিধারে
মোহে তায় দুইজনে, আপনাকে ভুলিল।
দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন।
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইরে।
আ মরি। কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥
বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক মেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার,
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥'[২৩]

অন্যত্র 'কামিনীর প্রতি উক্তি' থেকে 'তোমাতে লো বড় ঋতু'তে প্রকৃতি

২৩। ললিতা : বঙ্কিমচন্দ্র।

এবং নারীর এক অপূর্ব অন্বয়সাধন ঘটানো হয়েছে :

'সরস বসন্ত করে, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, করিছ তেমন॥
সুচারু বিমল শশী, তোমার বদন।
ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন॥
কমলে কমল কত, কমল কাননে।
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে॥
প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব।
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব॥

তোমার সুগন্ধ যুক্ত, কমল বদন।
তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন॥
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিঃশ্বাস।
না বুঝে কহিছে, লোক, দক্ষিণ বাতাস॥
বসন্তে বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব।
তাহার প্রমাণ দেখি অধরেতে তব॥'[২৪]

। বসন্ত ।

পূর্বে যে তিনটি ভূমিকায় পুষ্পের সাহিত্যিক রূপের উল্লেখ করা হয়েছে, এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য অবলম্বনে একে একে তাদের আলোচনা করা যেতে পারে। লেখক পুষ্পসৌন্দর্যকে বিভিন্ন ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিম উপন্যাসে ফুলের সমাদর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ রূপে। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের আহৃত পুষ্পের স্বকীয় সৌন্দর্যরূপই আমাদের আলোচ্য।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবে, বঙ্কিম সাহিত্যে কয়েকটি ফুলের অনুবৃত্তি ঘটেছে বারবার, মনে হয় সেই সব ফুলের প্রতি লেখকের একটি বিশেষ অনুরাগ আছে। বঙ্কিমের মানস পুষ্পোদ্যানের রাণী সম্ভবতঃ মল্লিকা। যে জাতীয় ফুলের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক মল্লিকা যেন তাদেরই মুখ্য

২৪। 'কামিনীর প্রতি উক্তি' : 'বসন্ত', বঙ্কিমচন্দ্র, "পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাল্যরচনা"।

প্রতীক। মৃদু সুগন্ধি এই শ্বেতপুষ্পটি বেলফুলের সমজাতীয়। সংস্কৃত কবিরা একে কৃতজ্ঞ পুষ্প বলেও মনে করেন। মল্লিকা প্রাচীনকাব্যের রোম্যান্টিক অনুষঙ্গ মনে আনে। তার বর্ণচ্ছটা বা গন্ধের মাদকতা নেই, শুভ্র রূপের একটি মাধুর্য আর স্নিগ্ধ গন্ধ নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফুটে ওঠে। নসীরামবাবুর ফুলবাগানে বসে বৈশাখমাসের সন্ধ্যাবেলা কমলাকান্ত 'ফুলের বিবাহ' দেখছিলেন। বিচিত্র দেশী ফুলের সমাবেশ ছিল সেখানে। সকলকেই নিয়ে বিবাহোৎসব কিন্তু সে উৎসবে বিবাহের কন্যা মল্লিকা—'মল্লিকাফুলের বিবাহ·····'। বিভিন্ন অলঙ্কার-প্রয়োগে, মানস অনুভূতির প্রকাশে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবে এই ফুলটিকে লেখক বারবার তার উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন।

প্রসাদপুরে, জমিদারপুত্র গোবিন্দলালের গৃহোদ্যানে, বারুণী পুষ্করিণীস্থিত উদ্যানে মল্লিকার শোভা অন্যান্য ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফুটে উঠেছে—

'সেই, যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ·····'[২৫] 'সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি।'[২৬] রূপোন্মাদনায় গোবিন্দলালের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে সত্য কিন্তু অন্তরের নিভৃতে স্নিগ্ধ গভীর প্রেমের ধারাটি অব্যাহত। হয়তো তার প্রকৃতির যথার্থ গুণ সংযম ও অন্তর্মুখিতা কাহিনীর শেষাংশে দেখি কঠিন শোক তার ভোগমুখী মনকে শান্তিসন্ধানী সংসারবিবাগী করে তুলেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই লেখক গোবিন্দলালের উদ্যানে পূজাসুরভিতে স্নিগ্ধ যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতীর অভাব রাখেন নি। 'বিষবৃক্ষে'র প্রতিহিংসাপরায়ণা হীরাদাসীর ছোট উঠানটির এককোণাতেও মল্লিকাফুল বিকশিত। সাহসিকা নায়িকা ইন্দিরার স্বামী সম্ভাষণের আভরণ সোনার অলঙ্কার নয়—'মল্লিকাফুলের কুঁড়ির' গহনা।

যে ফুলে লেখকের অনুরাগ বেশী বিচিত্র অলঙ্কারযোগেও লেখক বারবার সেইসব ফুলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 'কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্যে বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়, নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়।'[২৭]

তিলোত্তমার সৌন্দর্য—দুর্গেশনন্দিনী, 'নিমাই······মল্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন,······ জীবানন্দকে খাইতে দিল।'[২৮]

২৫। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।
২৬। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।
২৭। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
২৮। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

'যেখানে শিশুসকল নবীনবয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয় তৃপ্তিকরহাস্য হাসিত।'[২৯]

লেখক সৌন্দর্যরসিক শিল্পী, তাঁর নায়ক-নায়িকা তাঁর বিভিন্ন চরিত্রগুলি এক একটি রূপের আকর। আর সেই রূপকে অলঙ্কৃত করেছে লেখকের সৃষ্ট পুষ্পীয় অলঙ্কার।

'তাঁহার বর্ণ টুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর।'[৩০]

—রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের রূপ বর্ণনা।

'নানাবিধ উজ্জ্বল কোমলবর্ণের কমনীয় দেহরাজি,—কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্বাদলশ্যামা.........'

মল্লিকার পরেই যে ফুলটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিক স্থান অধিকার করে আছে তার নাম বকুল। রূপের হাটে বকুল দেউলিয়া। আয়তনে সে স্বল্পতম। বিরাট বৃক্ষের অজস্র সবুজ পাতার অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে ক্ষুদ্র ফুলের রাশি। বাতাসের দোলা লেগে কয়েকটি বৃষ্টির বিন্দুর মত হঠাৎ অন্যমনা পথিকের গায়ে ঝরে পড়ে মৃদু সুরভিতে তাকে চকিত করে দেয়। বকুলের এই অলক্ষ্য কৌতুক আর রহস্যময় প্রকৃতিই হয়ত লেখককে এত আকর্ষণ করেছে। আর মনে হয় রূপ অপেক্ষা সুগন্ধের দিকেই তাঁর অধিক অনুরাগ। সেই গন্ধের মত স্নিগ্ধ আর গভীর হওয়াই তাঁর কাম্য।

বকুল অলঙ্কার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু নায়ক-নায়িকার জীবনদ্বন্দ্বে এক একটি বিশেষ পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে বকুল বৃক্ষ।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের গৃহোদ্যানে বকুলবৃক্ষ বিদ্যমান। অন্যতমা নায়িকা কুন্দনন্দিনী প্রচ্ছন্নভাবে নগেন্দ্রকে দেখবার জন্য আত্মগোপন করেছিল বকুলবৃক্ষের অন্তরালে। 'কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্তি দেখিতে পাইলেন।'[৩২] 'মৃণালিনী'তে নবদ্বীপের রাজপথ পার্শ্বস্থিত দীঘির তট, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নগেন্দ্রনাথের প্রেমোদ্যানকে শোভিত করেছে বকুল বৃক্ষ। ভ্রমরের স্মৃতির উদ্দেশে নবনির্মিত বারুণীতীরস্থ উদ্যানে নূতন করে বকুলের গন্ধের অঞ্জলির আয়োজন হয়েছে।

২৯ আনন্দমঠ : ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

৩০। রাধারাণী : ৫ম পরিচ্ছেদ।

৩২। বিষবৃক্ষ : ৩৩শ পরিচ্ছেদ।

বকুলের একটি আলঙ্কারিক কাব্যময় বর্ণনা পাই 'বসন্তের কোকিল' এ। কমলাকান্ত কোকিলকে ডেকে বলছেন—

'বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুর শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণ যৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উচ্ছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও।'৩৩

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বকুলবৃক্ষ ও বকুলফুলের ভূমিকা, বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে, পটভূমিরচনায় ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অসাধারণ। বঙ্কিম-মানসকন্যা কুন্দ কবিহৃদয়ের সমস্ত মমতায় নিষিক্ত। স্নিগ্ধ মাধুর্য ও শুচিস্মিত সরলতায় কুন্দ যেন স্বর্গাস্খলিতা দেবকন্যা। অপরিচিত এবং হৃদয়হীন কণ্টক-সমাকীর্ণ জগতে যে অসহায়ভাবে ক্ষতবিক্ষত, যার কোথাও কোন আশ্রয় নেই। তাই 'প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী।'৩৪ (লেখকের কৈশোরস্মৃতি) 'পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তর খচিত লতামণ্ডপ ছিল। দুইধারে দুইটি বহুকালের বড় বকুলগাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে, একাকিনী বসিয়া……'৩৫

আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত কুন্দ সেই সন্ধ্যায় কোন মানুষের সমবেদনার স্পর্শ পায়নি, তাকে স্নেহ আর মমতার ছায়াময় আশ্রয় দিয়েছে প্রকৃতি, কুন্দের মতোই কোমল সুন্দর পুষ্পরাজির শোভা ও সৌরভ দিয়ে দিয়ে তাকে ব্যজন করেছে: '……শীতল বায়ু সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্রমালায় মর্মর শব্দ করিতেছিল, এবং নিদাঘ প্রস্ফুটিত বকুলপুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুল পুষ্পসকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর

৩৩ কমলাকান্তের দপ্তর : বসন্তের কোকিল : সপ্তম সংখ্যা

৩৪। বিষবৃক্ষ : ১৬শ পরিচ্ছেদ।

৩৫। ঐ : ঐ পরিচ্ছেদ।

সুগন্ধ আসিতেছিল।'[৩৬] সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য সুন্দর চিত্র হয়ে উঠেছে। বর্ণনার নৈপুণ্য ও কল্পনার সৌন্দর্য লেখকেরও কবিসত্তারই পরিচায়ক। এখানে বকুল এবং অন্যান্য পুষ্পরাজি পরিবেশ কুন্দনন্দিনীর সুকুমার নির্বাক ব্যক্তিত্ব ও তার সুকঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশের একটি সার্থক পটভূমি রচনা করেছে।

মল্লিকা বকুলের মতই পদ্মও বঙ্কিমের অনুরাগ আকর্ষণ করেছে বার বার। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পদ্ম অলঙ্কারনির্মিতির উপকরণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপে পদ্মকে আমরা বিশেষ পাই না। পদ্মকে নিয়ে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের রীতিই অনুসরণ করেছেন; যদিও কখনও কখনও প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কার নির্মিতিতেও তাঁর একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের পুষ্পনির্ভর অলঙ্কারসমূহ আলোচনাকালে এই প্রসঙ্গ আমরা বিশদ করব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাকৃতিক উপাদান লক্ষ্য করলে মনে হয় ফুলগুলি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপেই উপস্থাপিত হয় নি, পাত্র-পাত্রীর রূপ ও ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটনেও সহায়ক হয়েছে। প্রতিটি ঋতুর পুষ্প-বৈচিত্র্যকে প্রতিপুষ্পের ভাব ও রূপগত বৈশিষ্ট্যকে এমন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখক লক্ষ্য করেছেন বলেই তাঁর পক্ষে এমন মৌলিক পুষ্পালঙ্কার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই পুষ্পপ্রভাবিত অলঙ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্কিমের স্বকীয়তায় সুন্দর, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য গতানুগতিক রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কখনও সংস্কৃতরীতিতে কিঞ্চিৎ মৌলিকতার আধান করে অভিনব অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন লেখক সংস্কৃত কাব্যকারদের প্রচলিত ঐতিহ্যের এই স্বাত্মীকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহৎ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের অলঙ্কার সৃষ্টিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও অলঙ্কার প্রয়োগের মিশ্রিত রীতিও লক্ষিত হয়।

'শৈবলিনী······প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—তীমার সেই শ্যামতরঙ্গে স্বর্ণকমল ফুটিল।'[৩৭]

'মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্তসুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে।

৩৬। ঐ : ঐ পরিচ্ছেদ।

৩৭। চন্দ্রশেখর : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

'......গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচনপদ্ম দুইটি মুদিয়া রহিয়াছে।...... ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে......যেন কুসুমরাশির উপর কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে।'[৩৮]

এই প্রসঙ্গে এবং অলঙ্কার সাদৃশ্যে কালিদাসের নবযৌবনা উমার রূপবর্ণনা স্মরণে আসে।

উন্মীলিতং তুলিকয়েবচিত্রং সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাচতুরগ্রশোভির্বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন ॥[৩৯]

নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত আলেখ্যর ন্যায় এবং সৌরকর বিকশিত শতদলের ন্যায়, গিরিদুহিতার কমনীয় কলেবর যৌবনাগমে কমনীয়তম হইল।

ভাবগত উপমা—

'দলনীর মুখ ফুটিল না।......মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়। মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।'[৪০]

'বর্ষাকালের পদ্মের মত, মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।'[৪১]

'কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল।'[৪২]

'সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি যেন সকালের পদ্মের মত......'[৪৩]

'ভঙ্গীও সুকুমার, নবীন সূর্যোদয়ের সদ্য প্রফুল্লদল মালা নবীননলিনীর প্রসন্নব্রীড়াতুল্য সুকুমার।'[৪৪]

রূপগত উপমা—

'স্ত্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারিনিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্য সুন্দরমুখী।'[৪৫]

৩৮। চন্দ্রশেখর .ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
৩৯। কুমারসম্ভব ১ম সর্গ, শ্লোক সংখ্যা ৩২
৪০। চন্দ্রশেখর ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৪১। মৃণালিনী ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।
৪২। বিষবৃক্ষ ৫ম পরিচ্ছেদ।
৪৩। ইন্দিরা ১২শ পরিচ্ছেদ।
৪৪। মৃণালিনী ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।
৪৫। সীতার : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

ইন্দিরার চোখে প্রথম দেখা সুভাষিণীর রূপবর্ণনায় দেখি—'এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারিদিক হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেড়িয়াছে।......ঠোঁট দুইখানি পাতলা, রাঙ্গা টকটকে ফুলের পাপড়ির মত উল্টান, মুখখানি ছোট, সবশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল।'[৪৬]

নারীসৌন্দর্য বর্ণনার রমণী ও পদ্মের রূপবৈচিত্র্য-বর্ণনায় দেখা যায়,—'যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।'[৪৭]

'আয়েষার সৌন্দর্য্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়, সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।'[৪৮]

কোন রমণীর রূপ অপরাজেয় স্থলপথের ন্যায়; নির্বাণ, মুদিতোন্মুখ, শুষ্ক পল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ, বিমলা সেইরূপ সুন্দরী।'[৪৯]

নায়ক-নায়িকার চিত্তবিশ্লেষণপ্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ উপলব্ধি পুষ্পমূলক অলঙ্কারে সমন্বিত করেছেন। রজনীর প্রথম প্রেমানুভূতিতে দয়িত শচীন্দ্রের করস্পর্শ—

'যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্মদলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল।'[৫০]

নারীসৌন্দর্যের প্রতীকরূপে অন্যত্রও পদ্মকে স্মরণ করিয়ে দেন লেখক। মুঙ্গেরে জগৎশেঠের আবাসে নর্তকীদের নৃত্যলীলা চলছে। চারিদিকে সহস্র প্রদীপ আর নর্তকীদের অঙ্গাভরণে সেই দীপালোক প্রতিফলিত হচ্ছে। যেন উজ্জ্বলের সঙ্গে উজ্জ্বলের মিলন ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

'যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবরলোচনে বিদ্যুৎকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়,

৪৬। ইন্দিরা : ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৭। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

৪৮। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটি স্মরণীয়। 'নবরবিকরফুল্ল কমলিনী' —সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম।

৪৯। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

৫০। রজনী : ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীলসরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীদলরাজি……জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।'[৫১]

গোলাপের গন্ধের মাদকতা স্পর্শের পেলবতা লেখককে মুগ্ধ করেছে। যেমন করেছে যূথি, জাতি, শেফালিকা প্রভৃতি শুভ্র কোমল সুগন্ধি ফুল। গোলাপ তাঁর হাতে প্রতীক হয়ে উঠেছে কিন্তু গোলাপের বর্ণ-বৈচিত্র্য, রূপের ঝলক তাঁর চোখে নেশা ধরায় নি। তাই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র গোলাপের রূপবর্ণনায় অথবা গোলাপকে নিয়ে অলঙ্কারসৃষ্টিতে অগ্রসর হন নি। গোলাপ অবশ্য তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তিনি তাঁর প্রিয় পুষ্পকন্যা মল্লিকার বর স্থির করেছেন 'গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়'কে। তাঁর অনেক গুণ……। ……'গোলাববংশ বড় কুলীন, গোলাপের গৌরব অধিক।'[৫২]

প্রতীক (Symbol), অলঙ্কার, রূপকল্প (Image) প্রভৃতির ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা ঋদ্ধিমতী। বাংলা সাহিত্যের সেই অরুণলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ লেখনী মাত্র উচ্চাঙ্গের সাহিত্যই সৃষ্টি করেনি, শব্দ এবং অর্থালঙ্কারের ঐশ্বর্যে সাহিত্যবস্তুর আঙ্গিককে ও রাজমহিমা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভাষা প্রধানতঃ 'পুষ্পাভরণা।'

বঙ্কিমসাহিত্যে প্রতীক হয়ে ওঠবার মর্যাদা পেয়েছে গোলাপ; নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি তার নিদর্শন:

আয়েষার নিভৃতহৃদয়ের প্রেম ও বাসনার প্রতীক গোলাপ। বন্দী মানসিংহ পুত্রের শুশ্রূষা করতে গিয়ে তাঁকে হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেন আয়েষা। কিন্তু জগৎসিংহের অন্তর তিলোত্তমাময়। এই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখে আয়েষা নীরবে গোলাপের দল ছিন্ন করে আপন প্রণয়োন্মুখ হৃদয়ের উন্মথিত বাসনাকে নিবৃত্ত করলেন। গোলাপের ছিন্নদলের মধ্যেই তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটল।[৫২ক]

"আয়েষা কররী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে

৫১। চন্দ্রশেখর : ৫ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৫২। 'ফুলের বিবাহ' : বঙ্কিমচন্দ্র।

৫২ক। 'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বেপিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।' কুমারসম্ভব ষষ্ঠ, ৮৪॥'

ছিঁড়িতে কহিলেন……।……স্নেহময়ী রমণী……কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কর ধারণ করিলেন,……মুখপানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন '…বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—' রাজকুমার কহিলেন— '……সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

…রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল।……দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন……। রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'একি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?'

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন……,[৫৩]

অন্যত্র পুষ্পের মাধুর্য যেখানে অনুভূতিকে মন্দিত করেছে, সেখানে অন্যান্য পুষ্পরাজির সঙ্গে গোলাপও একাত্ম হয়ে আছে।

নব অনুরাগের আবেগে রজনীর কাছে শচীন্দ্রনাথের স্পর্শ পুষ্পময়। সেখানে অন্যান্য ফুলের সঙ্গে গোলাপের স্পর্শ, ঘ্রাণও রাঙ্গিয়ে তুলল তাঁর হৃদয়কে— 'সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম।'[৫৪]

কিন্তু অশোকের রক্তবর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে। তাই পুনঃ পুনঃ অশোকবৃক্ষ এবং অশোকপুষ্পের সমারোহ ঘটেছে। তাঁর লেখনী মধ্যে মধ্যে অশোকের রূপবর্ণনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

কমলাকান্ত 'বসন্তের কোকিল'কে লক্ষ্য করে বলছেন—'অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গাফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর (কোকিল) জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো……'[৫৫]

ফুলের বিবাহসভায় অতিথি অশোককে দেখেছেন কমলাকান্ত: 'অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত।'[৫৬]

আলঙ্কারিক প্রয়োজনেও অশোককে গ্রহণ করেছেন লেখক।

'অশোক ফুলের স্তবকের মত আপনার গৌরবে আপনি নম্র।'[৫৭]

৫৩। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ২৫শ পরিচ্ছেদ

৫৪। রজনী : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৫৫। বসন্তের কোকিল : বঙ্কিমচন্দ্র।

৫৬। 'ফুলের বিবাহ' : কমলাকান্ত।

৫৭। কমলাকান্তের দপ্তর : ফুলের বিবাহ।

সংস্কৃত অভিধানে চম্পককে বলা হয়েছে : 'চাম্পেয়ঃ হেমপুষ্পক :।' অমরের এই নামকরণের সমর্থন পাই শব্দকল্পদ্রুমেও—'স্বর্ণপুষ্পঃ। স্থিরগন্ধঃ।' স্বর্ণপুষ্প সার্থক উপমান হয়ে উঠল 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'—

'গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া চম্পকনির্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন।'[৫৮]

'বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ (রোহিণী) পালঙ্কে··'[৫৯]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসৃষ্টিতেও চম্পক অন্যতম। নবদ্বীপের রাজপথের দীর্ঘিকে অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে চম্পকবৃক্ষও শোভাদান করেছে।

করবী যেন শৈবলিনীর অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে শান্ত নীড়ের আশ্বাস। ভবিষ্যতের এক যন্ত্রণাদীর্ণ মুহূর্তে শৈবলিনীর স্মরণপটে জেগে উঠেছিল স্বহস্তরোপিত রক্তকরবীর মঞ্জরী। শৈবলিনী প্রতাপের প্রত্যাশায় লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে দেশত্যাগিনী। সুন্দরীর দেওয়া সুযোগ সে গ্রহণ করেনি, প্রতাপের জন্যই স্বেচ্ছাবন্দীত্ব বরণ করেছে। কিন্তু যথাকালে প্রতাপ ইংরেজের হাতে বন্দী হল, প্রতাপের গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থেকে শৈবলিনী সে দৃশ্য দেখল। তখন তার ক্ষণিকের জন্য অনুতাপ জাগল। সে ভাবল, কোন্ অসম্ভব দুরাশায় কিসের সন্ধানে সে ছুটেছে। সেই ক্ষণিক তাপে শৈবলিনীর মনে পড়ল বেদগ্রামে তার পতিগৃহ, সেখানে তার স্বহস্তরোপিত রক্তকরবীর মঞ্জরী তার সুখ ও শান্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল :

'যেখানে প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া করিয়া দুলিত। কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসীমঞ্চ····· কত কি মনে পড়িল।'[৬০]

দোপাটি ফুলের রূপ আর রং আছে, গন্ধ নেই, হীরার উঠানটিতে একবারের জন্য তাকে ফুটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন লেখক। হয়ত মনের কোথাও হীরার সঙ্গে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'উঠান নিকোন—একপাশে রাঙ্গা শাক, তার

৫৮। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৫৯। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

৬০। চন্দ্রশেখর : ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

পাশে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল।'[৬১] এই ফুলগুলি হীরার পুষ্পপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতিরও পরিচায়ক।

যূথি, জাতি, মল্লিকা, কামিনী প্রভৃতি শুভ্র পুষ্পের প্রতি বঙ্কিমের যে পক্ষপাত, তাতে বেলফুলের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু রজনীর পিতাকে নিত্য 'বেলফুল' বেচবার ভার দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। 'বেলফুলে'র সঙ্গে নাগরিক বিলাসিতার একটি পণ্যমূলক সম্পর্ক আছে বলেই সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলটির বিষয়ে নিরুৎসুক হয়েছেন। আর তারই সমজাতীয় 'মল্লিকা'-'বৈষ্ণব' ও সংস্কৃত সাহিত্যের রোম্যান্টিক অনুষঙ্গে মনকে আকুল করে।

'ফুল্লমল্লীমালতীযূথ মত্ত মধুপভোরণি'—বিদ্যাপতি।

মল্লিকা তাই রোম্যান্টিক; আর সেই জন্যই লেখকের তাকে নিয়ে এত মগ্নতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যূথিকার কোন বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায় না। যেখানেই এই পুষ্পটি উল্লিখিত, সেইখানেই জাতি-মল্লিকা ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ লেখক এই ফুলটিকে কোন বিশিষ্ট তাৎপর্য না দিয়ে সমজাতীয় শুভ্রকান্তি এবং সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্পের সঙ্গে একটি স্তবকেই বিন্যস্ত করেছেন।

কিন্তু যূথী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে উদাসীন ছিলেন তাও নয়। এই অনাড়ম্বর ছোট ফুলটি বাংলাদেশের ভীরুস্বভাবা কিশোরীর মতো, তার সকরুণ এবং নিরুপায় ভালবাসার মতো বঙ্কিমের কল্পনায় রূপায়িত হয়েছে। যূথিকে উপমান করে বঙ্কিমসৃষ্ট একটি সুন্দর অলঙ্কার স্মরণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে—

'রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোঁয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি।'[৬২]

যূথিকা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভূতি 'পুষ্পনাটকে' সমধিক প্রকটিত। রচনাটি ব্যঙ্গমূলক, যে সমস্ত সমালোচকেরা প্রতি শিল্পবস্তুর অন্তরালেই তাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধান করেন, খুব সম্ভব এই নাটিকায় তাদের কটাক্ষ করা হয়েছে।

'বৃষ্টিবিন্দু:—যূথিকে! আমি তবে যাই।

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাক না—থাক না—থাক না।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

৬১। কৃষ্ণকান্তের উইল ১ম খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।
৬২। সীতারাম ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

যূঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

(যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা)

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যূঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যূঁই। একটু সঞ্চিত মধু আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

(বায়ুকৃত পুষ্পপ্রতি বলপ্রয়োগ।)

যূঁই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি।) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছ, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—

(বৃষ্টিবিন্দুর পতন)'৬৩

কিন্তু তা সত্ত্বেও যূথিকার প্রণয়, বৃষ্টিবিন্দুকে বক্ষে ধারণ করে রাখার অসামর্থ্য এবং বাতাসের দস্যুতা সব মিলে এর মধ্যে কবি বঙ্কিমের একটি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসই বর্ষিত হয়েছে। বাতাসের দস্যুবৃত্তির অংশ কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"যূঁই।—(বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যূঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্যপ্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা। একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে প্রাণাধিক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্পদেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ, পরিমল দে—

যূঁই। ছাড়, নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

৬৩। পুষ্পনাটক: বঙ্কিমচন্দ্র।

বাতাস। হুঁ হুম!

(ইতি যূথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন)[৬৪]

লবঙ্গলতা ফুলকে লেখকের একবার মাত্র প্রয়োজন হয়েছে অলঙ্কার নির্মিতির জন্য—

'তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গকলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষে চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত····· উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত, ······দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল।'[৬৫]

পুষ্পময়ী প্রকৃতির আর একটি সৌন্দর্যময়রূপ দেখি সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানে। বারুণী রূপময়ী, নায়ক-নায়িকা রূপের আকর, কোকিলের কুহুরবে আর পুষ্পগন্ধে বসন্তসন্ধ্যার বাতাস মদির হয়ে উঠেছে। রূপমোহ সঞ্চারিত হল রোহিণী, গোবিন্দলালের শিরায় শিরায়।

লেখক বর্ণনায় চিত্রধর্মিতা ও সংগীতময়তা এনে অপূর্ব পুষ্পপটভূমি রচনা করেছেন। পুষ্পময়ী নিসর্গসুন্দরী কৃষ্ণকান্তের বারুণীতীরে আর বিষবৃক্ষের বাপীতটে, উভয় এই অভিনব-পুষ্পপটভূমি রচনা করেছে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎকারের। সমগ্র পরিবেশটি নায়িকার ব্যক্তিত্বের অনুসারী। আপনার নিভৃত বেদনার সমুদ্রে মগ্না কুন্দের জন্য বিষবৃক্ষে প্রকৃতি স্নিগ্ধা, আশ্রয়দায়িনী, মমতাময়ী, পুষ্পরাজি আদরের স্পর্শে যেন কুন্দের বেদনায় সমব্যথী হয়েছে। রোহিণী আত্মসচেতন, ভোগলিপ্সু, আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে চলেছে। অতৃপ্ত বাসনা আর ভাগ্যের পীড়নে অধীরা রোহিণী। বারুণীর পুষ্পোদ্যান যেন তারই জন্য পুষ্পে, গন্ধে, সুরে ছন্দে উন্মাদনাময় হয়ে উঠেছে।

"রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল অনন্ত গগন নিঃশব্দ অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত। শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণগুণে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে

৬৪। 'পুষ্পনাটক: বঙ্কিমচন্দ্র, গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'

৬৫। রজনী: ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল!'[৬৬]

এই লেখকেরই সৃষ্ট অন্য আর একটি পুষ্পপটভূমির চিত্র—

'প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে…বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী…। কোথাও কতকগুলি শালফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট হইতেছিল।……শীতল বায়ু সরোবর পার হইয়া ইন্দীবর কোরককে ঈষন্মাত্র বিধুত করিয়া, আকাশচিত্র স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুল-পত্রমালায় মর্ম্মরশব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল ফুলের গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুলপুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল।'[৬৭]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নায়কনায়িকাকে শুধুমাত্র পুষ্পোদ্যান উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তাঁদের জীবনের এক একটি চরম সংঘাতের লগ্নে পুষ্পোদ্যান আর তার পুষ্পরাজিকে এক আশ্চর্য সার্থক পটভূমিকা করে তুলেছেন। এই পটভূমির চিত্রধর্ম্মিতা ও সংগীতময়তা অতুলনীয়।

কয়েকটি সমজাতীয় সুগন্ধি পুষ্পকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিভিন্নপ্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করেছেন। এই পুষ্পসমূহের মধ্যে যারা নিজের স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তারা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হল। এই জাতীয় ফুলের সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের কয়েকটি নিদর্শন আমরা উল্লেখ করতে পারি। এই পুষ্পগুলিকে সজ্জার উপকরণরূপে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে বার বার গ্রহণ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যখন গৃহাশ্রয়ী, তখন পুষ্পগুলি তাঁদের পুষ্পোদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছে, আর যখন গৃহবিচ্যুত পথাশ্রয়ী, তখন তাঁদের জীবনদ্বন্দ্বের পটভূমিকারূপে দীঘি ও রাজপথ ইত্যাদিকে শোভিত করেছে। গোবিন্দলালের বারুণীতীরস্থ পুষ্পোদ্যান :—

'বারুণীর কূলে উদ্যানমধ্যে এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা……তাহার চারিপার্শ্বে

৬৬। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, শেষপূর্ব স্তবক।

৬৭। বিষবৃক্ষ : ১৬শ পরিচ্ছেদ।

বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়াম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে … ।'[৬৮]

প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের প্রমোদ উদ্যান—

'সেই অশোক, বকুল, কুটজ, কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন…… সেই যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ……এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম।……যুবতীর……কটাক্ষে এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে।'[৬৯]

মৃণালিনীর নায়ক-নায়িকা পথাশ্রিত—

'দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল।'[৭০]

'সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল কুমুদকহ্লার সহিত বিস্তৃত হইয়াছিল।'[৭০ক]

অন্যান্য উল্লেখও পাই—

'সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি, যেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত, আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল—সর্বাঙ্গে যেন সকালবেলার সর্বত্র পুষ্পিত শেফালিকার মত …..'[৭১]

'সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি…।'[৭২]

অলঙ্কার সৃষ্টিতেও এরূপ বহু ফুলের সমাবেশ ঘটেছে।

বনপুষ্পের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটু বিশেষ প্রীতি আছে মনে হয়। নায়ক-নায়িকার জীবনের যে সহজ মুহূর্তগুলি ভবিষ্যতে জটিলতম গ্রন্থি সৃষ্টি করেছে সেখানে বনপুষ্পের ভূমিকা। মিলন যেখানে সহজপথে আসেনি, সেখানে লেখক

৬৮। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।
৬৯। ঐ : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।
৭০। মৃণালিনী : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।
৭০ক। মৃণালিনী : ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।
৭১। ইন্দিরা : ১২শ পরিচ্ছেদ।
৭২। রজনী : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

নিজেই প্রকৃতির মুক্ত আঙ্গিনায় বনফুলের মালা দিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন সম্পন্ন করেছেন।

চন্দ্রশেখরের সূচনাতে—

'ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক; তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল…… বালকের নাম প্রতাপ, বালিকার শৈবলিনী।

………বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া বালকের গলায় পরাইল।'[৭৩]

ভারতসম্রাট অওরংজেব আর রাজপুতবীরকুলতিলক রাণা রাজসিংহের মধ্যে যে ভারতব্যাপী মহারণ তারও সূচনা এক বন্যকুসুমের পটভূমিতে।

'উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্যকুসুমসকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে।……রাজসিংহ পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।'[৭৪] রূপনগরী রাজকন্যার প্রণয়নিবেদন ও আশ্রয়-প্রার্থনাই রাজসিংহকে অওরংজেব-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করল।

দারিদ্র্যের মণিহার বনফুলের মালাই বালিকা রাধারাণীর জীবনের পরম শুভক্ষণটিকে নিয়ে এল বর্ষাঘন রথযাত্রার সন্ধ্যায়। মা রুগ্না, ঘরে পথ্য নেই।

'রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল।'[৭৫]

'মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল।………ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল।'[৭৬] 'রুক্মিণীকুমার' এসেছিলেন রথের মেলায়, অন্তরের ঐশ্বর্য দিয়ে বনফুলের মালার সঙ্গে রাধারাণীর হৃদয়ও জয় করে নিলেন দুর্যোগের সেই শুভলগ্নটিতে।

'আনন্দমঠে'র বনভূমি বনপুষ্পের শোভায় আলোময়, গন্ধ সেখানে আলো

৭৩। চন্দ্রশেখর : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৭৪। রাজসিংহ : ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।
৭৫। রাধারাণী : ১ম পরিচ্ছেদ।
৭৬। রাধারাণী : ১ম পরিচ্ছেদ।

হয়ে উঠেছে। মন্বন্তরে অন্নাভাবের জ্বালায় ঐশ্বর্যবান মহেন্দ্রসিংহ স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। স্ত্রী কল্যাণীকে দস্যুরা হরণ করল। সেই ক্ষুৎপীড়িত অন্নাভাবকাতর ক্ষুধামত্ত মানুষের জান্তব হিংস্রতা—এই বিভীষিকার মধ্যেও বঙ্কিমের শিল্পীদৃষ্টি প্রকৃতির নিভৃতনিকেতনে সুন্দরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

'যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই। দরিদ্রের হৃদয়াস্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল।'[৭৭]

রসুলপুরের নদীর মুখ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত যে বালুকাস্তূপশ্রেণী, যেখানে নবকুমার পরিত্যক্ত হয়েছিলেন সেখানে আর একটি ফুলের গাছ পাই, ঝাঁটি ফুল, সংস্কৃত কবিরা যাকে বলেছেন কুরুবক।

'স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগ মণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাঁটি, বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।'[৭৮]

শিয়ালকাঁটা ফুল নিতান্ত বন্য, রজনীতে অমরনাথের চিন্তায় কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তার একটা স্থান হয়ে গেছে—'আমি কোন্ ছার! টিড্‌লী, হক্সলি, ডর্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটাফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন নি।'[৭৯]

নগণ্য ঘেঁটুফুলেরও একবার ডাক পড়েছিল সুভাষিণী-কন্যা হেমার বামুন-ঠাকুরাণীকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটবার জন্য—'খোঁপায় ঘেঁটুফুল।'[৮০]

চিত্রকল্প ও অলঙ্কারে পুষ্প

বিশেষ এক একটি ফুলকে সাহিত্যপ্রয়োজনে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অলঙ্কার সৃষ্টির প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছে বঙ্কিম-সাহিত্যে; তাছাড়াও সাধারণভাবে পুষ্পশোভা ও প্রকৃতিকে মানবিক সৌন্দর্যের ওপর আরোপ করে চমৎকার স্বকীয়

৭৭। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৭৮। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৭৯। রজনী: ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৮০। ইন্দিরা: ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।

অর্থালঙ্কার ও চিত্রকল্প (Image) সৃষ্টি করেছেন লেখক। এই জাতীয় কয়েকটি উদ্ধৃতি নিদর্শনস্বরূপ এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

শচীন্দ্রনাথের বিকারাচ্ছন্ন মনে রজনীর প্রতি প্রথম প্রেমোন্মেষের পর শচীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ওষুধের প্রভাবে পলায়িতা জলনিমগ্না রজনীকে দেখেছেন—

'সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী !………… বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে।'[৮১]

অন্ধ রজনীর কাছে প্রিয়স্পর্শের অনুভূতি পুষ্পস্পর্শের ন্যায়, সে স্পর্শ গন্ধময়, স্বরময়—

'পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ ! সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি… ……… ।'[৮২]

কুন্দনন্দিনীর নামকরণেই শুধু লেখক একটি ক্ষুদ্র শুভ্র পুষ্পকে স্মরণ করেন নি, তার রূপ ও প্রকৃতিও কুসুমসুকুমার। তার বর্ণনায় লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে একটি মুগ্ধ কোমলতা—

'যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।'[৮৩]

সুন্দরী রোহিণী বারুণীতে কলসীকাঁখে জল আনতে চলেছে, তার চলার ভঙ্গীতে ফুলের স্মৃতি জেগেছে লেখকের মানসপটে—

'চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল …… . …'[৮৪]

স্বামী জীবানন্দ সন্ন্যাসী, সুতরাং শান্তি শ্রীহীন দারিদ্র্যের এক অবহেলিত জীবনের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। ক্ষণিকের জন্য গৃহপ্রত্যাগত স্বামীর সঙ্গে দীনবেশেই সাক্ষাৎ করেছিল শান্তি, কিন্তু সেই আশ্চর্য রূপকে দারিদ্র্যের মলিনতা আবরিত করতে পারে নি—

'মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল, যেন

৮১। রজনী : ৪র্থ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৮২। রজনী : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৮৩। বিষবৃক্ষ : ৫ম পরিচ্ছেদ।

৮৪। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোনো গাছে কত ফুলের ছিল ; হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল।'[৮৫] চঞ্চলা শান্তি সংসারের শাসনে পলাতকা, দীর্ঘদিন পরে যৌবনোন্মেষে স্বামী জীবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে আকস্মিকভাবে উভয়ের প্রথম প্রেমের জাগরণক্ষণটি সার্থক পুষ্পোপমায় কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

'নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।'[৮৬]

গৌড়ে হেমচন্দ্র যখন মনোরমাকে প্রথম দেখলেন তখন শুভ্রবেশিনী মনোরমার পবিত্র সৌন্দর্য মাত্র একটি ক্ষুদ্র বাক্যে সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন—

'হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা।'[৮৭]

অন্যত্র পশুপতি মনোরমাকে স্মরণ করছেন—

'সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণ-পুত্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—'[৮৮]

গৌড় ধ্বংসের পর পশুপতির মৃত্যু হলে তাঁর চিতায় উঠে যখন মনোরমা সহমরণে প্রাণত্যাগ করলেন, সেই দৃশ্যটির বর্ণনা করেছেন লেখক—

'মনোরমা……সহাস্য আননে সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।'[৮৯]

এই মনোরমার সৌন্দর্য লেখক অন্যত্র বর্ণনা করেছেন,—মনোরমা যেন পুষ্পময়ী। অবশ্য এ বর্ণনারীতিতে লেখকের স্বকীয়তা অপেক্ষা প্রাচীনকাব্যের অনুসরণই অধিক লক্ষিত হয়।

'সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা,……ভ্রমরভয়স্পন্দিত নীল পুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল……অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত প্রাতঃসূর্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগলতুল্য,……দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত… . …

৮৫। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ।
৮৬। আনন্দমঠ : ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।
৮৭। মৃণালিনী : ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।
৮৮। মৃণালিনী : ৪র্থ খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।
৮৯। মৃণালিনী : ৪র্থ খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

গমন সুকুমার, বসন্তবায়ু সঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য;⋯⋯ পশুপতির মুখাবলোকনজন্য উন্নতমুখী,⋯⋯⋯যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন, ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার।⋯⋯পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।'[১০]

প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ থেকে নিপুণ ভাস্করের মতো সৌন্দর্য চয়ন করে একটি সৌন্দর্যের দেবীপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন বঙ্কিম, আর মন্দিরের পাষাণী দেবীর পার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোয় পশুপতির সঙ্গে নিজেও এ মূর্তি দর্শন করছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিমানস এমনই পুষ্পস্বরভিত যে বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়েও ফুলের কথা বিস্মৃত হন নি।

হেমচন্দ্র উপবনগৃহে সংস্থাপিত হয়ে সান্ধ্যপ্রকৃতি ও নিকটস্থ নদীর সৌন্দর্য যখন উপভোগ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন:

'প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগ ফুটিতে লাগিল।⋯⋯⋯ নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল।'[১১]

পুষ্পে ব্যক্তিত্বের আরোপ

কমলাকান্তের নেশাচ্ছন্ন চোখে ফুলগুলি প্রাণস্পন্দনে আশ্চর্য ব্যক্তিত্বময় হয়ে উঠেছে। 'বসন্তের কোকিল' রচনায় সুখবিলাসীদের কটাক্ষ করে 'বসন্তের কোকিল'কে আহ্বান করেই এখানে পুষ্পগুলিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। রূপক হলেও স্বভাবজাত রূপের উচ্ছ্বাসে পুষ্পরাজি এখানে প্রাণবন্ত!

'বসন্তের কোকিল,⋯⋯⋯তুমি নিজে কালো-পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই 'কু' ⋯⋯⋯⋯⋯যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল— তখনই ডাকিয়া বলিও, 'কু-উঃ'। যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, 'কু-উঃ'। যখন দেখিবে, বকুলে অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর

১০। মৃণালিনী: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

১১। মৃণালিনী: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

গাছে ধরে না। ……অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে— তখন…………সেই…… শুভ্রমুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকশিত করিবার উপক্রম করিতেছে, ………তখন, হে কালামুখ! আবার কু-উঃ বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও।'[৯২]

'ফুলের বিবাহ' রচনায় প্রায় সমস্ত দেশী ফুলকেই সমাদৃত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে লেখক ফুলগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আরোপ করেছেন। এই জন্যই প্রায় প্রতিটি ফুলেরই রূপগত ও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আমরা পাই।

বিবাহের সভায়—'অনেক বরযাত্রী চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী শ্বেতজবা, রক্তজবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল।……অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিঁপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়………কুরুবক; কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্রী আসিয়াছিলেন………'[৯৩]

এই প্রসঙ্গে অশোকের উপমা দিয়ে মনে হয় লেখকসমাজের একশ্রেণীর ধনিক ও তাদের চাটুকার গোষ্ঠীকে কটাক্ষ করেছেন।

'বাসরঘরে'ও কিছু ফুলের সমাবেশ দেখতে পাই—'প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূঁই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল;

৯২। কমলাকান্তের দপ্তর : বসন্তের কোকিল।

৯৩। কমলাকান্তের দপ্তর : ফুলের বিবাহ।

রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে, এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত……নীলশাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল।'[৯৪]

পুষ্পরূপক

কিছু কিছু ফুলকে লেখক রূপকহিসেবে ব্যবহার করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'মনুষ্যফল' রচনাটিতে শিমূল ও ধুতুরা ফলের সঙ্গে তুলিত করে মনুষ্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন—

'এক জাতি লোক—দেশহিতৈষী…… শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফোটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে।'[৯৫]

'অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কন্টকময় ধুতুরা।' [৯৬]

'দপ্তরে'র 'একটি গীত' রচনাটিতে কমলাকান্ত তত্ত্বচিন্তায় মগ্ন। প্রৌঢ়ার রূপের বিকাশকে মধ্যাহ্নপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন লেখক—"প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্ন পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে।[৯৭]

'বুড়া বয়সের কথা' বলতে গিয়ে কমলাকান্ত যৌবন আর বৃদ্ধবয়সের অবস্থার প্রভেদ আলোচনা করতে ফুলের উপমা গ্রহণ করেছেন।

'যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া, আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ, হারাধন পোদ…… নির্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।'[৯৮]

৯৪। কমলাকান্তের দপ্তর : ফুলের বিবাহ।
৯৫। 'মনুষ্যফল' : কমলাকান্ত।
৯৬। 'মনুষ্যফল : কমলাকান্ত।
৯৭। 'একটি গীত' : কমলাকান্ত।
৯৮। বুড়া বয়সের কথা : কমলাকান্ত।

অন্যত্র—

'আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিনী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাতবৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যানবায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজ গদার মাকে দেখ ···মলিনবসনা বিকটদশনা তীব্ররসনা দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশকণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিনী।'[৯৯]

নামকরণে পুষ্প

বঙ্কিমচন্দ্রের পুষ্পপ্রীতি উপন্যাসের নায়িকা এবং আরও কয়েকটি চরিত্রের নামকরণেও দৃষ্ট হয়। নামচিহ্নিত ব্যক্তিটি অনেকক্ষেত্রেই তন্নামীয় পুষ্পের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেনি, কিন্তু নায়িকাচরিত্রের ক্ষেত্রে নামকরণ সার্থক।

'কুন্দ' আর 'সূর্যমুখী' বিষবৃক্ষের নায়িকাদ্বয় কুন্দ আর সূর্যমুখী ফুলের নামেই শুধু চিহ্নিত নয়, এই দুই নারীর ব্যক্তিত্ব কুন্দ আর সূর্যমুখী পুষ্পের পুষ্পব্যক্তিত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূর্যমুখী ফুলের মতই নগেন্দ্রপত্নী সূর্যমুখীর উন্মুখহৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম, বাসনা, কামনা, কর্মপ্রচেষ্টা নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, সূর্যমুখী ফুলের মতই তার প্রকাশের ব্যাপকতা, বিকাশের পূর্ণতা। নগেন্দ্রনাথ যে মুহূর্তে বিমুখ হলেন সূর্যমুখীর সমস্ত শক্তি সমস্ত ব্যাপ্তি নিঃশেষ হয়ে এল।

ক্ষুদ্র শুভ্র কুন্দকুসুমটির মতই নায়িকা কুন্দনন্দিনী আপন অপাপবিদ্ধ পবিত্রতা আর নিভৃত প্রেমের বেদনার বৃত্তে আত্মমগ্ন হয়ে আছে।

আর নায়িকা মৃণালিনীর জীবন জল-পদ্মটির (মৃণালিনী) মতই দুঃখকণ্টকে বিদ্ধ। মৃণালিনী নিজেই হেমচন্দ্রের উদ্দেশে গান রচনা করে আপনভাগ্য বর্ণনা করেছেন, পদ্মের সঙ্গে উপমিত করে।

'কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥'[১০০]

৯৯। বুড়া বয়সের কথা : কমলাকান্ত।
১০০। মৃণালিনী : ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

ইন্দিরা সুভাষিণীর গৃহে সকলের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করে 'কুমুদিনী' নামেই নিজেকে সর্বত্র পরিচিত করেছেন। কুমুদ শব্দটির অভিধানগত অর্থ লাল-পদ্ম, শালুক ইত্যাদি এবং কুমুদিনী বলতে বোঝায় কুমুদের ঝাড়, কুমুদ-শোভিত সরসী।

ইন্দিরার কুমুদিনী নামগ্রহণের কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে? লক্ষ্মী-রূপিণী 'ইন্দিরা' আজ সব হারিয়েছে বলে কি রাত্রির কুমুদিনীর মতো অন্ধকারেই বিকশিতা হতে চায়?

সুগন্ধ ফুল ফলযুক্ত লতা। লবঙ্গলতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই ফুলটির কোন বিশেষ সাদৃশ্য নেই। তবু 'রজনী' উপন্যাসের অন্যতমা নায়িকার নামকরণের সময় লেখকের লবঙ্গলতার কথাই মনে পড়েছিল।

চাঁপা, রজনীর যার সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছিল তারই প্রথমা পত্নী। গ্রাম্য প্রাকৃত মহিলা, ছলে, বলে, কৌশলে স্বীয় অধিকার অর্জন করতে জানেন। এই মহিলাটিকে চাঁপা নামে অলঙ্কৃত করবার সময় সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের চাঁপা-ফুলের কথা মনে পড়েনি। একটি গ্রাম্য সাধারণ নামই তাঁর চিন্তায় দেখা দিয়েছিল।

কমল পদ্মেরই নাম। সূর্যমুখীর আদরের ননদিনী কমলমণি। মধুরস্বভাবা রহস্যপ্রিয়া এই রমণী, প্রেমে মমতায়, আনন্দে যেন প্রস্ফুটিত পদ্মটির মত আপন সৌন্দর্যের ভারে টলমল করছে।

পুষ্পপ্রভাবিত ব্যক্তিত্ব

রজনী অন্ধ পুষ্পপসারিণী। আবাল্য পুষ্পচয়ন করে, মালা গেঁথে আর পুষ্পপসরা সাজিয়ে তার সমস্ত বাসনা, বেদনা, অনুভূতি পুষ্পময় হয়ে গেছে। তার রোম্যান্টিক ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মন যেন পুষ্পবাসিত এক সুরসর্গে আত্মবিস্মৃত। তাই রজনী তার নব অনুরাগের শিহরণ, দয়িতের স্পর্শানুভূতিকে বর্ণনা করে—

'আ মরি মরি—সে নবনীত সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ।'[১০১]

১০১। রজনী: ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

তরু-লতা-গুল্মরাজি :

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসম্ভারে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশই মুখ্য, দেশজ পুষ্প-পল্লব, তরুলতা, তৃণরাজি, শস্যভারনত দিগন্ত-বিস্তার সমভূমি, জটাজটিল বটবৃক্ষ, দীর্ঘদেহ শাল-তাল, আম্র-পনস-জম্বুবন, কলনাদিনী গঙ্গাপ্রবাহ প্রভৃতিই তাঁর কথাসাহিত্যের বর্ণনাগত ও ব্যঞ্জনাগত উপকরণ। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এই বিবিধ উপকরণগুলি আহরণ করে দেখব। বর্তমানক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহৃত তরুলতাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

বৃক্ষ এবং লতাগুল্মাদির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অকপটভাবেই স্বদেশনিষ্ঠ। ফুলের ক্ষেত্রে বিদেশী পুষ্প হয়ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যানভূমি আলোকিত করেছে, কিন্তু বঙ্কিমের তরুলতা প্রায় সমস্তই দেশজ। তাল-নারিকেল-আম্র-বট প্রভৃতি থেকে বাবলা-হিজল পর্যন্ত সবই সমভাবে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত হয়েছে।

যদিও বঙ্কিমনিসর্গ ভাবময়, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই বৃক্ষগুলির উল্লেখ বিশেষ কোনো অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয় নি। এরা প্রায়ই প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত অথবা বর্ণনার মধ্যে সমাগত। সমগ্রভাবে এই দেশজ পাদপগুল্ম বঙ্কিমসাহিত্যে সমগ্র বাংলার এক চিত্রব্যঞ্জনা উপস্থিত করলেও উপন্যাসের মধ্যে বিকীর্ণরূপে এরা মাত্র বস্তুরূপেই প্রকটিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি দিকও স্মরণীয়। কবি কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে তরুরাজিকে বিশেষ কোনো তাৎপর্যে ভূষিত না করলেও কখনো কখনো এদের সাহায্যে তিনি অপরূপ লেখনী-চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাহিনীর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়েও প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ও পটভূমিকে এই চিত্রাবলী অনেকখানি সুন্দর ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। বৃক্ষাদি বিষয়ে শব্দচিত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের এই নিপুণতার পরিচয় উদ্ধৃত বর্ণনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আহৃত তরুলতার একটি বর্ণনাত্মক তালিকা রচনা করছি। যেমন :

"বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়া ছিল।···পথিপার্শ্বস্থ

সরোবরের পদ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল।"

—বিষবৃক্ষ ২৩শ পরিচ্ছেদ।

"দূরস্থ বৃক্ষশ্রী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে……।"—

দুর্গেশনন্দিনী ২য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

"অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্তশ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র। ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে।"—আনন্দমঠ: উপক্রমণিকা।

"বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল। অপরাহ্নে তাহার তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুসুমিত অশোকশাখা নিষ্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকাদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিল…"—মৃণালিনী: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এই অধ্যায়ে অশোকবৃক্ষ হেমচন্দ্রের মানসদ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার সঙ্গে সংবদ্ধ।

নগেন্দ্রনাথের শয়নাগারের সম্মুখে, বাড়ীর চারিদিকে।

"শয়নাগারের সম্মুখে কতকগুলো ঝাউগাছ…বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।"

বিষবৃক্ষ—১৮শ পরিচ্ছেদ।

ললিতগিরির উপত্যকাভূমির বর্ণনাপ্রসঙ্গে অজস্র তালবৃক্ষের চিত্র পাই।

"গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত।…তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র। তার উপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল সুপত্র শোভাময়!"—সীতারাম: ১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

ফলসম্ভার ঃ

ফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে বোধ হয় না। তাঁর কথাসাহিত্যে কয়েকটি গ্রীষ্মকালীন ফলের উল্লেখ পাই। এই ফলবৃক্ষগুলি ধনীর উদ্যানগুলিকে অলঙ্কৃত করেছে মাত্র।

একমাত্র আম্রফলে অন্যত্র লেখক কিঞ্চিৎ রোম্যান্টিক ভাবনার ছায়াপাত ঘটিয়েছেন।

মৃণালিনী যখন হেমচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে বিবাহের পর পিতৃগৃহে বাস করতেন তখন উপযুক্ত বাহক না পেয়ে আম্রফলে উভয়ের প্রণয়পত্র লেখা হত। "হেমচন্দ্র একটি আম্রফলের উপর আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন; (মৃণালিনী)···তৎপৃষ্ঠে উত্তর লিখিয়া পত্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন।"

মৃণালিনী : ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন ফলের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি ফলকে বিশেষ প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। কমলাকান্তের ২য় সংখ্যা 'মনুষ্যফল' একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনা। দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি সাদৃশ্য কল্পনা করে কৌতুকের যে চমক সৃষ্ট করা হয় 'উইট'-এর তা একটি প্রধান গুণ। মনুষ্যফলে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্নজাতীয় মানুষের সঙ্গে কতকগুলি ফলের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। কাঁঠালকে ধনীব্যক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। এদের কতকগুলি খাজা, কতকগুলি "ভুতুড়ি সার", কিছু ইঁচড়েই পক্ব হয়। অবশিষ্ট কাঁঠালগুলির জন্য নায়েবগোমস্তা ইত্যাদি শৃগাল এবং অর্থীপ্রার্থী ইত্যাদি মাছির ভীড়।

কুষ্মাণ্ডকে দেশীয় হাকিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন বঙ্কিম। এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বঙ্কিমের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা নির্মম ব্যঙ্গরূপে উপস্থিত হয়েছে: "অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।" কুষ্মাণ্ড দুই প্রকার। দেশী এবং বিলাতী, বস্তুতঃ দেশী বলতে চালকুমড়ো এবং বিলাতী বলতে সাধারণ কুমড়ো বুঝায়। দুই-ই বঙ্গজ। যে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ হাকিম সাহেব সেজে বিলিতী কুমড়োয় পরিণত হন, তাঁদের গৌরব কিছু অধিক বটে কিন্তু রূপে গুণে দুই-ই সমান।

আম্র বিদেশী ফল, এরাও বিদেশী, কাঁচায় টক, "পাকিলে সুমিষ্ট বটে তবু হাড়ে টক যায় না।" ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রতি কটাক্ষ।

তেঁতুলকে বঙ্গদেশীয় লেখক-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ তাও নিকৃষ্ট অম্ল।'...

"তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল।"

বড় বড় লম্বা সমাস ও বচনসর্বস্ব নিতান্তই কণ্টকময় ধুতুরা। সিদ্ধির সঙ্গে ধুতুরার বিচি মিশিয়ে দিলে নেশা জমাট হয় তাই বাঙালী লেখকরা "প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে সেই বচনধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তোলে।"

কৈশোরে ডাবের মত স্নিগ্ধ, তরুণীর স্নেহের সঙ্গে নারিকেলের জলের সাদৃশ্য আছে। "তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়।" নারিকেলের শাঁস মেয়েদের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনীয়। অল্পবয়সে নরম কিন্তু পরিণতবয়সে স্বামীর পক্ষেও তাতে দন্তস্ফুট করা কঠিন। সর্বশেষে নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা রজ্জু অর্থাৎ প্রেমের রজ্জু এবং রূপের রজ্জু। "রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে!"

বাঙালী দেশহিতৈষী শিমুলের ফুলের মত। পুষ্পাবস্থায় বেশ আরিক্তম দীপ্তি, ফল ফাটলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ, পরিণামে কেবল অন্তঃসারশূন্য তুলা। এছাড়াও এই ফলগুলির 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'এ উল্লেখ আছে।

বিহঙ্গ ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ধ্রুবপদের মতো পূর্বাপর রক্ষা করেছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কবিসত্তা প্রধানতঃ রোম্যান্টিক যুগের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণেই তাঁর কাছে প্রকৃতি প্রাণময়ী ও রহস্যময়ী ; সে এমন একটি শক্তি যা মানুষকে অনন্তের অভিমুখী করে আবার জীবনের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ববেদনায় কখনো সহায়িকা কখনো বা বিরূপা হয়ে দেখা দেয়। দিবারাত্রি, পুষ্পাবলী, পক্ষীকাকলী, ঝড়-বৃষ্টি, জ্যোৎস্নার উদ্ভাস জলাধার অথবা নদীপ্রবাহ—এরা বারে বারে বঙ্কিমসাহিত্যে নব নব ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি এনেছে।

বাংলার বিহঙ্গকুল বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে, তার তরু-লতা-পুষ্প-জলাধারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে একটি ঐকতান সুরের মতো। বঙ্কিম-কথাশিল্পে নিসর্গবর্ণনায় পাখীরও একটি ভূমিকা আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুষ্পসম্ভার,

দিনরাত্রি অথবা নদীপ্রবাহের মত পক্ষীবিশেষের উপস্থাপনায় ভাবগত তাৎপর্যও আরোপিত হয়েছে, কখনও বিশেষ পটভূমি বা পরিবেশকে অলঙ্কৃত এবং উদ্দীপিত করেছে। বিশেষ একটি অনুভূতির প্রকাশ করতে লেখকের বার বার হয়ত একটি পাখীর কথাই মনে পড়েছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই পক্ষী নিসর্গসৌন্দর্যেরই অঙ্গ হয়ে আছে।

প্রভাতী সৌন্দর্যবর্ণনায় 'বিষবৃক্ষে' কোকিলের কুহুতান শুনি পাপিয়া ও অন্যান্য পক্ষীগণের কলধ্বনির সঙ্গে। কুন্দ নগেন্দ্রের উদ্যানে তাঁর দর্শনের জন্য প্রতীক্ষারতা—"তখন পাপিয়া…ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকলপক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল।"[১]

"কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।"[২]

গোবিন্দলালের চিত্রা নদীতীরস্থ প্রাসাদের নিকটস্থ পুষ্পকুঞ্জ কোকিল-কূজন মুখরিত—

"সেই অশোক, বকুল, কুটজ, কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন…"[৩]

"যখন আমার ঘুম ভঙ্গিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে।"[৪]

বিচিত্র পক্ষীকলরবে প্রভাতের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে। এদের মধ্যে কোকিলের কুহুধ্বনি বসন্তকালকে দ্যোতিত করেছে।

নিসর্গ সৌন্দর্যের চিত্রে—কোকিল ও অন্যান্য পক্ষীর সমাবেশ দেখতে পাই। "চারিদিকে জঙ্গল…কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি… মাঝে নীলজলপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে বক, হংস, ডাহুক, তীরে কোকিল চক্রবাক;"[৫]

১। বিষবৃক্ষ : ২৩শ পরিচ্ছেদ।

২। ঐ ঐ

৩। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

৪। ইন্দিরা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৫। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

শৈবলিনীর ফষ্টর কর্তৃক অপহৃতা হ'বার পর বেদগ্রামের স্বামীগৃহের স্মৃতি-চিত্র পাই।

"শৈবলিনী…জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফটিকবিক্ষেপ দেখিতেন। তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত।"[৬]

বঙ্কিম-সাহিত্যে কোকিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ দুইটি ক্ষেত্রে। "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর বারুণী পুষ্করিণীর তটে বিকশিত পুষ্পবিথারের মধ্যে গোবিন্দলালের অনিন্দ্যকান্তি পুরুষমূর্তির যেন দৈব আবির্ভাব এবং অনুতাপে হৃদ্‌বিদ্ধা রোহিণীর সেই পুরুষোত্তমসন্দর্শন—এরই মধ্যভাগে কোকিলের কলধ্বনি এক অমোঘ ভূমিকায় অবতীর্ণ। বসন্তকাল, পুষ্পবাসিত উদ্যান, কোকিলের কুহুতান এবং অতৃপ্তিদগ্ধা রোহিণীর যন্ত্রণাতুর মানসিকতা—সমস্ত মিলিত হ'য়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর বিষপুষ্প যেন এখানে ইন্দ্রধনু-রাগে রঞ্জিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কিছু সপ্রতিভ কৌতুকের ভঙ্গিতে রোহিণী এবং কোকিলের ভাষ্য রচনা করেছেন:

"…রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত। শীতল সুগন্ধিপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুন্‌গুনে শব্দিত। অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।…সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে।…রোহিণী সরোবর-সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্টকোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।"[৭]

মানবের প্রেমার্তির সঙ্গে কোকিলকূজিতের অন্তর্নিহিত সংযোগ ভারতীয়-সাহিত্যের চিরাচরিত সংস্কার। ইংরেজ কবি Wordsworth Cuckoo-র ডাকে ভাবলোকের যাত্রী হন:

৬। চন্দ্রশেখর: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৭। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"O blessed Bird ! the earth we face
Again appears to be
An unsubstantial fairy place ;
That is fit home for Thee."[৮]

কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্যে এবং বৈষ্ণবকবিতায় কোকিলকূজন বিরহ এবং প্রেমবেদনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে দেখি—

"আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ
বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষুঃ।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং নীহারপাতবিগমাং
সুভগো বসন্তে।"[৯]

[বসন্তকালে, নীহারপাত অবসিত হওয়ায় সুখস্পর্শ সমীরণ কুসুমিত সহকারশাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে, কোকিলের কলমধুর ঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত করিয়া মানুষের হৃদয় হরণ করিতেছে।]

শ্রীগীতগোবিন্দের 'সানন্দগোবিন্দ' অংশটিতে সংগীতটির তৃতীয় স্তবকে পাই—

"শৃণু রমণীয়তরং তরুণী-জন-মোহন-মধু-রিপু-রাবম্।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ ভাবম্॥"[১০]

[মধুরিপুর (শ্রীকৃষ্ণের) যুবতি-জনমোহজনক রমণীয়তর আলাপ শ্রবণ কর এবং কন্দর্পের আদেশপালনকারী কোকিলসমূহে প্রীতিভাব অবলম্বন কর।]

বৈষ্ণবপদাবলীতে বিরহকাতরা রাধার অন্তর্বেদনায় এই কোকিলের আর্তি :

"কোকিল রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।"

—গোবিন্দদাস।

আবার মিলনলগ্নে এই একই কোকিলের আনন্দধ্বনি :

"কুসুম-ভরে নবপল্লবদোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥

৮। To the Cuckoo—Wordswarth
৯। ঋতুসংহারম্ : 'বসন্তবর্ণনম্' : কবি শ্রীকালিদাস। শ্লোকসংখ্যা ২২।
১০। গীতগোবিন্দ—শ্রীজয়দেব।

তাহে নবকোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁজন আরতি চন্দন বায়॥"[১১]

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কোকিলকে এই প্রথাসিদ্ধ তাৎপর্যই দিয়েছেন। রোহিণীর অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা এবং বসন্তসমীরিত কুসুমসম্ভার, এই উভয়ের মধ্যে কোকিলের উপস্থিতি তার অন্তরযন্ত্রণাকে যেমন তীব্র করেছে তেমনি তার অবদমিত প্রবৃত্তিবেগকে অকস্মাৎ একটা প্রবল আবেগে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। উদ্যানমধ্যে গোবিন্দলালের আবির্ভাব সমস্ত আয়োজনটিকে সম্পূর্ণ করে দেবার ফলে এইখানেই উপন্যাসের জটিলতম গ্রন্থি রচিত হয়েছে।

বসন্তকালে প্রথাসম্মত কোকিলের বর্ণনা করেও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাহিনীর একটি গুরুতর নাট্যিক প্রয়োজন সাধন করেছেন বলে এই কোকিলকূজনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কোকিল বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র আর একটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জনা রচনা করেছেন 'কমলাকন্তের দপ্তরে'। এই প্রসঙ্গটির নাম "বসন্তের কোকিল।" এই কোকিল পক্ষিবিশেষ নয়—এটি এখানে প্রতীকমাত্র। রচনাটির প্রথমাংশে কোকিল পরান্নজীবী, 'পরপালিত' এবং চলিতমতে সে "সুখের পায়রা।" সুসময়ে যারা ভাগ্যবানের চতুর্দিকে স্তুতিগান করে এবং দুঃসময়ে যাদের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, কোকিল সেইজাতীয়ঃ "তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ষার কেহ নও।"[১২]

কোকিলের "কু-উঃ" ধ্বনির মাধুর্য সন্দেহাতীত এবং "ঐ পঞ্চম স্বরটি তাহার জিত।" সে পরনিন্দক, সমস্তই তার নিকট 'কু'—কিন্তু তার অঙ্গের কালিমা এবং মনের মালিন্যসত্ত্বেও মধুর স্বরে সে দিগ্বিজয় করে থাকে। কোকিল মধুকণ্ঠ দুর্জনদের অন্যতম। রচনাটির তৃতীয় অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকের ভঙ্গী পরিত্যাগ করেছেন। এখানে তিনি কোকিলের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সেই ভক্তের কণ্ঠস্বর, যে আকাশের নালিমার মধ্যে উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নালোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পঞ্চমতান বিকীর্ণ করে। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র সেই অনন্তসুন্দরের চিরসাধক, কোকিলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চরিতার্থ হতে চেয়েছেন। ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা হয়ত নেই কিন্তু তবু এই রচনারই প্রসঙ্গে শেলীর "To a Skylark" মনে পড়ে—

১১। বসন্তবিহার—বলরাম দাস।

১২। কমলাকান্তঃ ৭ম সংখ্যা, বসন্তের কোকিল।

"Better than all measures
Of delightful sounds,
Better than all treasures
That in books are found,
Thy skill to poet were, the scorner of the ground!
Teach me half the gladness
That thy brain must know,
Such harmonious madness.
From my lips would flow
The world should listen then—as I am listening now."[১৩]

'কমলাকান্তে'র একটি অতিরিক্ত রচনা "কাকাতুয়া"। রচনাটি গ্রন্থে সঙ্কলিত ছিল না—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংকলনে এটি পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হয়েছে। রচনার ভঙ্গী দেখে এটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বলে সম্পূর্ণ স্বীকার করা শক্ত। যদিও তীব্র ব্যঙ্গ এবং বুদ্ধির দীপ্তি এতে বিদ্যমান, তবু রচনাটিতে অসংযত আতিশয্য এবং চপলতার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, কমলাকান্তের রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসিকতার মধ্যেও দার্শনিক গভীরতার সেই ধর্ম এতে অনুপস্থিত। যাই হোক সে বিচার পণ্ডিতেরাই করবেন।

এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটির নায়ক কোন মুসলিম গৃহস্থের একটি কাকাতুয়া—যার মাত্র দুটি কাজ। প্রথমতঃ, নির্বিচারে শিশুদের ঠোকরান এবং দ্বিতীয়তঃ, পুরাবৃত্তের চর্চা। কমলাকান্ত এই পক্ষীটিকে স্বগৃহে নিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য কাকাতুয়া একটি প্রতীকমাত্র। তার মুখে যে 'Platectud', 'Platectud' বাণী শোনা যায় তার সঙ্গে ইংরেজী 'Platitude' শব্দের কোনও সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রতীকটির সাহায্যে এক অস্ত্রে দুই শত্রুকে আঘাত করেছেন। একদিকে ভারতবাসীকে Plantain অর্থাৎ অষ্টরম্ভা প্রদর্শনকারী শোষক ইংরেজরাজ, অন্যদিকে ভারতবিদ্বেষী Weber প্রমুখ তথাকথিত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের দল, বঙ্কিমচন্দ্র রূপকচ্ছলে এই প্রসঙ্গে ভারতনিন্দুক এই প্রাচ্যবিদ্‌দেরই আঘাত করেছেন। যথা "সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়া

১৩। P. B. Shelley—To a Skylark.

বলিতে পারিতেছি না। বই কাছে নাই। কিন্তু আমার বোধ হয় Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।"[১৪]

এই শেষোক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে বঙ্কিমের তীব্র আক্রমণ অন্যত্র প্রকট যথা লোকরহস্যে রামায়ণের সমালোচনা ও "কোন স্পেশিয়ালে'র পত্র" এবং কমলাকান্তে "বড়বাজার"। অনুগ্রহজীবী বাঙালী সমাজকে এখানে পিঁপড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি, অতিভাষণে এবং অকারণ চাপল্যে এটি কমলাকান্তের যোগ্যরচনা নয় এবং যদি স্বরচিতও হয়, তবু এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে বর্জন করেছেন।

কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও দেশাভিমান এবং আত্মসমালোচনার জন্য প্রবন্ধটির অন্য মূল্যও আছে।

দোয়েল তার কলগীতে প্রকৃতির নীরবশোভাকে সংগীতময় ক'রে।

'রজনী' উপন্যাসে প্রথম যৌবনে জীবনে বীতরাগ হয়ে অমরনাথ উদ্দেশ্য-হীনভাবে নানাদেশে ভ্রমণ ক'রে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করলেন। গ্রামপ্রান্তে দোয়েলের সপ্তস্বর মুখরিত অমরনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন—

"বাঙ্গলায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্য্যটনে গিয়াছিলাম। এক দোয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে ; চারিদিকে বৃক্ষরাজি ঘনবিন্যস্ত। ...শ্যামরূপের রাশি রাশি ; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল।"[১৫]

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং দোয়েলের গানে অমরনাথের উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে আবার নারীরূপিণী সৌন্দর্য রজনীর আবির্ভাব।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের প্রাসাদপুরের গৃহসন্নিকটস্থ চিত্রানদী-তীরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে—

"ধীরে ধীরে চিত্রানদী বহিতেছে—...বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে।"[১৬]

পাপিয়ার 'পিউ কাহা' 'পিউ কাহা' রবের মধ্যে যেন একটি ব্যর্থতার

১৪। কমলাকান্ত : পরিশিষ্ট, 'কাকাতুয়া'।

১৫। রজনী : ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৬। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ

কান্না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাপিয়াও যেন ব্যর্থ প্রেমের প্রতীক। পাপিয়ার গান নিসর্গসৌন্দর্যকে সঙ্গীতময় করেছে। কখন, কখনও তারই সঙ্গে মিশেছে নায়কনায়িকার আনন্দিত মিলনমুহূর্ত, কখনো অতৃপ্তির কারুণ্য, কখনো বা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

(২) সৌন্দর্যময় পরিবেশ রচনায় পাপিয়ার উপস্থিতির অন্যতর সার্থকতা।

সূর্য্যমুখী কর্তৃক লাঞ্ছিতা ও পলাতকা কুন্দ মাত্র একবার নগেন্দ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উষাকালে সঙ্গোপনে দত্তবাড়ীর উদ্যানে প্রতীক্ষমানা :

ক) "কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই।···উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল।"[১৭]

পাপিয়ার গান সেদিনের ভোরের আকাশ সঙ্গীতময় করে কুন্দর জীবনেও সুখের আশ্বাস এনেছিল। কিন্তু কুন্দর সেই সুখমরীচিকার সমাপ্তি আত্মঘাতে।

এখানে কুন্দর হৃদয়ের সঙ্গে পাপিয়ার ডাকের যোগ লক্ষিত।

অন্যতর সার্থকতা পক্ষীকাকলীমুখরিত উষাকালের সৌন্দর্যবর্ণনা।

'চন্দ্রশেখর' এ প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের চিত্র :

'ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল···'

'মাথার উপরে শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর্ তর্ রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।'[১৮]

প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ মুক্ত অঙ্গনে দুটি মুগ্ধ কিশোরহৃদয়ের তৃষ্ণার প্রতীক যেন পাপিয়া। নদীর কলকলতান, আম্রকানন, বনফুলের মালা আর পাপিয়ার গান সেদিন যে মিলনকে আভাসিত করেছিল, তা পরবর্তীকালে সত্য হয়ে ওঠে নি। শৈবলিনীর জীবনে পাপিয়া আর কোনদিন গান করে নি। সেদিন

১৭। বিষবৃক্ষ : ২৩শ পরিচ্ছেদ।

১৮। চন্দ্রশেখর : উপক্রমণিকা, ১ম পরিচ্ছেদ।

সুখমগ্না যে বালিকা পাপিয়াকে ব্যঙ্গ করেছিল, চিরতৃষ্ণাতুর সে পাখীটির অশান্ত জ্বালা যেন সে শৈবলিনীর হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছে। একটি নিদারুণ অতৃপ্ত পরিসমাপ্তিতেই প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের পরিণতি।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আর একটি ব্যর্থ পরিণামসম্ভাবী প্রেম রোহিণী-গোবিন্দলালের। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের গৃহের সন্নিকটে চিত্রানদী প্রবাহিত—

"ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে।"[১৯]

চিত্রার প্রবাহের পাশে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রেমস্বপ্নকে মাদকতায় ভরিয়ে তুলেছে পাপিয়া, দোয়েলের গান। এই অভিশপ্ত প্রেমেরও পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে এসেছে নায়ক-নায়িকার জীবনে।

নির্জন নদীতীরের একটি প্রাণময় নিসর্গশোভাও এখানে প্রস্ফুটিত।

(ক) "কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন। কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ। সেই যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী......যুবতীর... কটাক্ষের মাধুর্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে।"[২০]

কোকিল, ভ্রমর, রাজহংস এখানে অন্যান্য পাখী ও ফুলের সঙ্গে মিলে প্রকৃতিকে সুন্দরতর করেছে, গোবিন্দলাল রোহিণীর মিলনের দিনগুলোকেও আরও মাদকতায় ভরিয়ে তুলতেও সহায়তা করেছে।

লেখক রাজহংসকে অন্যত্র দয়িতের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন।

'মৃণালিনী'তে মৃণালিনী ভিখারিণী গিরিজায়ার মুখে স্বামী হেমচন্দ্রের রচিত গান শুনে তার প্রত্যুত্তরে আপন অবস্থা জানিয়ে গিরিজায়াকে যে গান শিখিয়েছিলেন সে গানের 'রাজহংস'কে দয়িত হেমচন্দ্রের প্রতীকরূপেই বর্ণনা করেছেন।

কখনও মৃণালিনী জলে রাজহংসের লীলা বর্ণনাছলে হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও ভাগ্যবিড়ম্বনার চিত্রটি তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

"চন্দ্রশেখর" গ্রন্থে শৈবলিনী যখন দয়িত প্রতাপকে লাভ করবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ফস্টরের ষড়যন্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন তখন ফস্টরের বজরায় নিদ্রিতা শৈবলিনী স্বপ্ন দেখছিলেন—

১৯। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

২০। কৃষ্ণকান্তের উইল : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

"সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থি-শাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটি শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফস্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়। কিন্তু চরণে মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।"[২১]

প্রতাপের রূপ ও ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠতা ও শৈবলিনীর প্রেম প্রতাপকে শৈবলিনীর অবচেতনমনের কল্পনায় হংসরাজের আসন দিয়েছে। রূপলুব্ধ ফস্টর পেয়েছে শূকরের আকৃতি। প্রতাপকে পাওয়ার জন্য শৈবলিনীর অশান্ত তৃষ্ণা ও ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন করে প্রতাপকে লাভ করার উন্মত্ত আকুলতা শৈবলিনীর স্বপ্নের পদ্ম, রাজহংস ও শূকরের রূপকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুতরাং এই উপন্যাসেও রাজহংসকে দয়িতের প্রতীকরূপে দেখতে পাই।

বাংলাদেশের নিসর্গ-সৌন্দর্যকে সংগীতময় করেছে তার বিহঙ্গকাকলী। তার নদী, তরু, পুষ্পরাজির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে পক্ষিকুল।

'বিষবৃক্ষ'-এর একটি প্রভাত বর্ণনায়—

"বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাত-মধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে, গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সম্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না।"[২২]

২১। চন্দ্রশেখর : ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২২। বিষবৃক্ষ : ২৩শ পরিচ্ছেদ।

"ইন্দিরা"র কালাদীঘির তীরে ইন্দিরার জলে ও আকাশে পাখীর সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধতা ও আকাশে মানসবিহার—

"…জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফটিকভঙ্গ হইতেছে—

… … …

আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম…নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের নীলিমা-মধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম।"[২৩]

'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে তাম্রলিপ্তনগরের সমুদ্রতীরের একটি পক্ষিশোভিত সৌন্দর্যের বর্ণনা—

"শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন, নীলজল দেখিলেন, …দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন।"[২৪]

'চন্দ্রশেখরে' পলাতকা শৈবলিনী গৃহস্থজীবনের স্মৃতিতে পক্ষী—

"সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা…নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত। তাহা মনে পড়িল।… পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল।"[২৫]

'আনন্দমঠে' রাত্রিশেষে প্রভাতের আগমনঘোষণা—

"সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময় —পক্ষীকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল।…"[২৬]

সুড়ঙ্গপথে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র—

"সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক

২৩। ইন্দিরা: ২য় পরিচ্ছেদ।

২৪। যুগলাঙ্গুরীয়: ১ম পরিচ্ছেদ।

২৫। চন্দ্রশেখর: ২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

২৬। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ

হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গাহিয়া উঠিল।…”[২৭]

আনন্দারণ্যের নিসর্গশোভায় পক্ষিসমাবেশ—

“ক্ষুদ্র নদী কল্ কল্ শব্দে বহিতেছে।……দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে। নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে।

… … …

মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। “ভৃঙ্গরাজ” কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল।”[২৮]

মনুষ্যেতর প্রাণী

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ফুল পক্ষী ইত্যাদির ন্যায় জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গেরও প্রভূত ব্যবহার আছে। কমলাকান্তের দপ্তরে এগুলি রূপকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত, অন্যত্র গৃহস্থের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী গৃহপালিত পশুরূপে এরা আবির্ভূত হয়েছে। রাজপুরুষ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। বনভূমি ইত্যাদির বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবে এরা স্থান পেয়েছে, এছাড়াও আলঙ্কারিক প্রয়োজনেও এদের কিছু কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। এইখানে পক্ষিব্যতিরিক্ত অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর তালিকা ও পরিচয় আহরণ করা হল।

বাংলাসাহিত্যে অশ্বারোহীরূপেই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ। ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে যে অশ্বারোহী বিষ্ণুপুর থেকে গড়মান্দারণের পথে যাত্রা করেছিলেন তার অন্য নাম বাংলাসাহিত্যে সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা অর্ধঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীতে অশ্ব এতবার এতভাবে, উপস্থিত হয়েছে যে তাদের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া অসম্ভব। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ ও সীতারাম—সর্বত্রই অপরিহার্যভাবে অশ্ব ও অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ মেলে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুর্গেশনন্দিনীর প্রারম্ভ-পরিচ্ছেদে

২৭। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

২৮। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।

জগৎসিংহের দুর্যোগের মধ্যে অশ্বারোহণে যাত্রা, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'মাণিকলাল' কর্তৃক সুকৌশলে অশ্ব ও অস্ত্র অপহরণ, 'সীতারামে'র প্রথম পরিচ্ছেদে সীতারামের অশ্ব নিয়ে গঙ্গারামের পলায়ন এবং শান্তি কর্তৃক লিওলেকে ভূতলে নিক্ষেপ করে অশ্বযোগে তিরোধান। সামাজিক উপন্যাসেও কোথাও কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে অশ্বের উল্লেখ আছে। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) একাকিনী ও দুর্জনদ্বারা আক্রান্তা রোহিণী অশ্বারোহী হরলাল দ্বারা উদ্ধার পেয়েছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম' প্রভৃতি ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসমিশ্রিত উপন্যাসে যোদ্ধা ও সৈনিকপুরুষদের সঙ্গে অশ্ব সর্বত্রই রয়েছে।

'কমলাকান্তের পত্র' পর্যায়ে 'পলিটিকস্' নামীয় রচনায় একটি ভিক্ষার্থী কুকুরের ছবি—যে অন্নভোজনরত শিবে কলুর পুত্রের কাছে এক মুঠো ভাত এবং একটি মাছের কাঁটার জন্য ল্যাজ নেড়ে, কাতর মিনতি জানিয়ে, 'পলিটিক্যাল এজিটেশন' করছে আর পরিশেষে কলুগৃহিণীর ইষ্টকাঘাতে আর্তনাদ তুলে পালিয়েছে। কমলাকান্ত এর মধ্যে ভারতীয় এবং অন্যান্য দুর্বল রাজনীতির স্বরূপ দেখেছেন—ভিক্ষাপ্রার্থনা, প্রহার ও পলায়ন। সুতীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা কুকুর চিত্রিত। সাহিত্যে তার বিচিত্র বর্ণনা।

"অতি দূরস্থ কুক্কুররব" (কপালকুণ্ডলা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

"কদাচিৎ একটা কুক্কুর" (বিষবৃক্ষ, ১৮শ পরিচ্ছেদ)

নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে ভাতের উমেদারিতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কাঙালী এবং কুক্কুর বসে আছে। (বিষবৃক্ষ, ৭ম পরিচ্ছেদ)

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশচন্দ্রের কলিকাতাস্থ বাড়ীর বৈঠকখানার পাপোষে মাথা রেখে "একটা দো আঁশলা গোছ টেরিয়র।" (বিষবৃক্ষ, ১৫শ পরিচ্ছেদ)

'কমলাকান্তে' বিড়াল নামীয় প্রবন্ধে স্মরণীয় চরিত্র বিড়াল ইংরেজ লেখক লী হান্টের 'The Cat by the Fireside' থেকে রচনাটি অনুপ্রাণিত। বিড়াল এখানে ক্ষুধিত দরিদ্রজনের প্রতিনিধি, নৈয়ায়িক, কূট তার্কিক। "দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না"—এই সত্যটি সে কমলাকান্তের কাছে উপস্থিত ক'রে প্রমাণ করে দিয়েছে, তার "হাঁড়ি খাইবার right আছে" এবং তার সিদ্ধান্ত এই:

"যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস

করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।" (কমলাকান্ত : ১৩শ সংখ্যা—বিড়াল)

"বিড়ালের উমেদারি করে না তারা বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া খাইতেছে।" (বিষবৃক্ষ : ৭ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীশচন্দ্রের অন্তঃপুরে মধ্যাহ্নকালে যখন কমলমণি উল বুনছেন, এবং সতীশচন্দ্র সন্দেশ খাচ্ছেন, তখন একটি বিড়াল "থাবা পাতিয়া বসিয়া উভয়কে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।" বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতা করে বলেছিলেন, বিড়াল যেন গম্ভীর হ'য়ে ভাবছে যে তার জন্য আহারের ব্যবস্থা না করে মনুষ্যজাতি উলবোনা এবং পুতুলখেলার মত তুচ্ছ কাজ ক'রে, ভবিষ্যতে এদের কি গতি হ'বে, ভাবতে ভাবতে উদাসীন বেড়াল সেখান থেকে চলে গেল। (বিষবৃক্ষ : ১৫শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকান্তের উইল ২য় পরিচ্ছেদে রূপসী রোহিণী যখন রন্ধনে ব্যাপৃত তখন দূরে প্রতীক্ষমান একটি বিড়ালের প্রতি 'বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ' নিক্ষেপ করছিল এবং "বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলালবাবু জুতাসমেত মস্মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।" (কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)

এই অংশটিতে রোহিণীর কটাক্ষক্ষেপণে তাঁর চরিত্রের একটি দিক যেন প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই বিড়ালের মধ্যে গোবিন্দলাল-জাতীয় পুরুষের একটি সূক্ষ্ম সঙ্কেত যেন নিহিত আছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একটি বিশেষ প্রতীকী প্রয়োজনে বিড়াল ব্যবহৃত হয়েছে। গোবিন্দলাল যখন কোকিলকূজিত বসন্তসন্ধ্যায় বারুণীতীরস্থ গৃহে জলমগ্না রোহিণীর মূর্চ্ছিতদেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য তার অধরে ফুৎকার দিয়েছেন তখনই যেন সর্বনাশের বজ্রধ্বনি নিঃশব্দে নিনাদিত হয়েছে। শিল্পী বঙ্কিম এই একান্ত দুর্লগ্নটিকে মাত্র একটি প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত করেছেন।

"সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" (কৃষ্ণকান্তের উইল—১ম খণ্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ)

'কপালকুণ্ডলা'র প্রথমাংশে একাধিক স্থানে ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে। 'আঃ,

তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' (শিয়াল ব্যাঘ্র অর্থে ব্যবহৃত) (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। কাপালিক নবকুমারকে বলেছেন, "নির্বিঘ্নে তিষ্ঠ, ব্যাঘ্রের ভয় করিও না।" (১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। তীর্থযাত্রীদের কাল্পনিক ব্যাঘ্রের বিবরণও উপাদেয়; "প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাপ লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক—" কেহ বলিলেন, "না প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পালাইতে পারিল না।" (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ)।

দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিতা ও মর্মপীড়িতা ইন্দিরা ব্যাঘ্রের হাতে মৃত্যুকামনা করেছে:

"এমন সময়ে দূরে কি একটা বিকট গর্জ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া, রক্ত শুষিয়া খাইবে। ভাবিলাম তাও সহ্য করিব; শরীরের কষ্ট বৈ ত না। মরিতে পাইবো, সেই পরম সুখ। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, একটু প্রফুল্ল হইয়া, স্থিরভাবে রহিলাম, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যতবার ঘস্ ঘস্ শব্দ হয়, ততবার মনে করি, ঐ সর্বদুঃখহর প্রাণ-স্নিগ্ধকর বাঘ আসিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম।" (ইন্দিরা: ৩য় পরিচ্ছেদ)

রাজসিংহপুত্র কুমার জয়সিংহ আকস্মিকভাবে যেখানে মোগলসৈন্য ধ্বংস করেন সেখানে তাঁকে ব্যাঘ্রের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে:

"এমন সময় সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকবরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত মোগলকে দংষ্ট্রামধ্যে পূরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল।" (রাজসিংহ: ৭ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

সূর্য্যমুখী যখন শুনলেন নগেন্দ্রের আর সূর্য্যমুখীতে সুখে নাই, তাঁর মন-প্রাণ কুন্দগত, তখন ভূলুণ্ঠিতা সূর্য্যমুখীর নির্মম যন্ত্রণার নীরব দর্শক নগেন্দ্রনাথ—

লেখক তুলনা করেন : "হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন।" (বিষবৃক্ষ : ২১শ পরিচ্ছেদ)।

"সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, ভল্ল কাদিতে অতিশয় ভয়ানক।"

ক্যাপটেন টমাস শিবগ্রামে যে ডনি ওয়ার্থের অতিথি ছিলেন, সেই ডনি ওয়ার্থ উক্ত অরণ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়েছিলেন। টমাস এই অরণ্যে ব্যাঘ্রের সন্ধানে প্রবেশ করে সন্ন্যাসীবেশিনী শান্তিকে দেখতে পান। (আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)

"রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার" ভবানন্দ আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে এই ভীষণ অরণ্যে চিন্তামগ্ন। (আনন্দমঠ : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

'কপালকুণ্ডলা'য় বনভূমির নৈশরূপ বর্ণনায়—"কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ" (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)।

দস্যুলাঞ্ছিতা ইন্দিরার মৃত্যুকামনায় সাপের কল্পনা—"তখন মনে হইল, বড় ঝোপজঙ্গল সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তাহার ভিতর কত বেড়াইলাম। হায়! মনুষ্য দেখিলে সকলেই পালায়—বনমধ্যে কত সর্‌সর্ ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিলাম, কিন্তু সাপের ঘাড়ে ত পা পড়িল না ;..." (ইন্দিরা : ৩য় পরিচ্ছেদ)

আত্মগ্লানিতে জর্জরিত ভবানন্দ এই সর্পময় ভগ্ন অট্টালিকায় একটি কক্ষে চিন্তাবিষ্ট। "সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস।" (আনন্দমঠ : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

সর্পের বিশেষ ভূমিকা ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ৭ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। অওরংজেবের রোষাগ্নিদগ্ধ মবারককে গোপনে বধ করবার জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ সর্প ব্যবহার করা হয়েছে। অংশটিতে নাটকীয়তা এবং বৈচিত্র্য আছে :

"তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটি পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।" (রাজসিংহ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ) উপমার্থে একটি চিত্র ফুটে ওঠে।

"এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না!" মবারককে সর্পদংশনে হত্যা করিয়ে জেব-উন্নিসার অনুতাপজ্বালার চিন্তা। (রাজসিংহ : ৮ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

"ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে।" (কমলাকান্ত—'কে গায় ঐ')

উপমারূপে সর্প :

"অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের বাহুতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি"—

(কপালকুণ্ডলা : ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

"দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।" (কপালকুণ্ডলা : ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শৈবলিনীর স্বপ্ন ও নরকদর্শনে বিভীষিকারূপে সর্পের উল্লেখ। সর্প যেন তার পাপদাহনের প্রতীক : "অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে। সকলের মিলিত নিঃশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্পসকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল।" (চন্দ্রশেখর : ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গেই ৪র্থ খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে সর্পারণ্যের কল্পনা—"সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ·········সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার!"

হস্তীর আক্রমণে বখতিয়ারের জীবননাশের উপক্রম, কিন্তু শত্রুকে স্বয়ং বধ করবার অভিপ্রায়ে হেমচন্দ্র তাকে উদ্ধার করেছিলেন—মাধবাচার্য্য ও হেমচন্দ্রের সংলাপে তা জানা যায়। ('মৃণালিনী' ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।)

(মূল অধ্যায়টি 'মৃণালিনী'র প্রথম মুদ্রণে ছিল, পরে বর্জ্জিত করা হয়)।

'হাতী, ঘোড়া ও বানরের' প্রাসঙ্গিক উল্লেখ 'বসন্তের কোকিল' (কমলাকান্তের দপ্তরে) রচনাটিতে আছে।

'আনন্দমঠে'র ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাবে শ্মশানভূমি বাংলার এক হৃদয়বিদারী চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। এই অংশে বহু জীবজন্তু ও সর্প ইত্যাদির উল্লেখ আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই। এগুলি আর পৃথকভাবে বিন্যাস করা হল না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমরা উদ্ধৃতিটি আহরণ করছি।

"জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে,

বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকেরা বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীনবয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেঁচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে।" আনন্দমঠ : ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্য দ্বারা সম্ভবতঃ অচেতনভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পরিত্যক্তা অযোধ্যা নগরীর রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুশের সম্মুখে মধ্যরাত্রে উপনীতা হয়ে সেই মহানগরীর রিক্ততা এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

"নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং য সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ স বাহ্যতে রাজ-পথঃ শিবাভিঃ॥ ১২॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রৈর্মৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্॥ ১৩॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গান্মৃদঙ্গ-শব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্॥ ১৪॥
সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥ ১৫॥
চিত্রদ্বীপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্ন-কুম্ভাঃ সংরব্ধ-সিংহপ্রহৃতং বহন্তি॥ ১৬॥
স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামুৎক্রান্ত বর্ণক্রম-ধূসরাণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গান্নির্মোকি-পট্টাঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ॥ ১৭॥"

[পূর্বে আমার যে নগরীতে, দীপ্তি-কলোজ্জ্বল নূপুরধারিণী সীমন্তিনীরা রজনীযোগে নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন আর তাঁহাদের রত্নখচিত নূপুরালোকে রাজ-বর্ত্ম আলোকিত হইত, এখন সেই নগরীর সেই সকল রাজপথে আমিষলোলুপ উল্কামুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।"১২

পূর্বে যে সকল বাপীদীর্ঘিকার জলরাশি প্রমদাগণের বাহুবল্লীপ্রহৃত হয়ে

মৃদঙ্গবৎ ধীরধ্বনি করিত সেই দীর্ঘিকার জল এখন বন্যমহিষাদির কঠিন শৃঙ্গাঘাতে আর্তনাদ করিতেছে।১৩

(নাগরিকগণের) মৃদঙ্গধ্বনিতে নৃত্যপরায়ণ ক্রীড়াময়ূরগণের বাসযষ্টি (দাঁড়) ভঙ্গ হওয়াতে এবং গহন কাননজাত দাবানলস্ফুলিঙ্গে তাহাদের কলাপগুচ্ছ বিদগ্ধ হওয়াতে তাহারা এখন বন্যবর্হীর ন্যায় হতশ্রী।১৪

পূর্বে বিলাসিনীগণ, হর্ম্যমালার যে সকল সোপান অলক্তক-সিক্ত চরণ-বিন্যাসে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান এক্ষণে মৃগঘাতী ভীষণ ব্যাঘ্রসমূহের শোণিত-দিগ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে।১৫

ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত পদ্মাবন ছিল, তাহাকে শোভিত করিয়াছিল বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ, করেণুরা প্রীতিভরে তাহাদের মৃণালভঙ্গ অর্পণ করিতেছে। এক্ষণে কুপিত মৃগেন্দ্রগণের সগর্জন লম্ফপ্রদানে ও প্রখর নখাঘাতে চিত্রাবলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে।১৬

সৌধস্তম্ভে সংযোজিত দারুময়ী রমণীমূর্তির বর্ণবিন্যাস ক্রমশঃ ধূসরতা-প্রাপ্ত হইতেছে। মূর্তিগাত্রে পরিত্যক্ত সর্পনির্মোক এক্ষণে তাহাদের অঙ্গাবরণস্বরূপ হইতেছে।১৭]

—রঘুবংশম্ ষোড়শ সর্গ; শ্লোক সংখ্যা ১২-১৭

ঝড়ে-মেঘে-বর্ষণে :

প্রকৃতির এই দ্বৈত শক্তির প্রকাশ—ঝঞ্ঝা এবং বর্ষণ সাহিত্যে চিরদিনই অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। ঝড় যেন মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতম মুহূর্তের প্রকাশ, তার জীবনে কঠিনতম দুর্যোগের প্রতীক।

শেক্সপীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটকে এইরকম একটি ভয়ঙ্করী রাত্রিতেই দেখা দিয়েছে ডাকিনীরা, ম্যাকবেথের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেছে তারা। উন্মত্ত লীয়ার যখন ঝড়ের রাত্রে ছুটে চলেছেন তখন এই প্রাকৃতিক প্রচণ্ডতা যেন তাঁর হৃদয়ের সহযাত্রী। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মানবিক যে কোন প্রবল নাট্যমুহূর্ত রচনায়, যে কোন দুর্যোগময়তার সংকেতরূপে, পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে ঝড় অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রাবণের শেষ রাত্রে প্রতিশ্রুত রাজরক্ত আনবেন জয়সিংহ—প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রঘুপতি তারই জন্য অপেক্ষা করছেন—গোবিন্দমাণিক্যের শোণিত-তর্পণে তিনি ত্রিপুরেশ্বরীর তৃষ্ণা দূর করবেন। নাটকেই এই নিদারুণ মুহূর্তে দেখা দিয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি, যেন মহাকালীর মহাক্ষুধায় উন্মাদিত হয়ে উঠেছে দিগ্-দিগন্ত :

রঘুপতি। 'এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছে দেবী!
ওই রোষ হুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
আজ তিমিররূপিণী! ঐ বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত।

সংশয় গিয়েছে ; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়। ওই আসে তোর পূজা।'[১]

আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য বর্ষার বর্ণনায় মুখর। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, মন্দাক্রান্তা থেকে মেঘমল্লার পর্যন্ত এক উচ্ছ্বসিত প্রাবৃটস্তব।

কিন্তু মাত্র প্রাকৃতিক একটি আবির্ভাবরূপেই নয়, মানবের জীবনের সঙ্গেও নিবিড় ঐক্যে বর্ষা বিধৃত হ'য়ে আছে।

"ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ কঃ মেঘঃ সন্দেশার্থাঃ
ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।"[২]

(ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও সমীরণ এই পদার্থ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন অচেতন মেঘই বা কোথায়, আর সবলেন্দ্রিয় প্রাণীর দ্বারা দেশদেশান্তরে প্রেরণযোগ্য সংবাদই বা কোথায়?—মেঘের দ্বারা সেই দূর অলকায় সংবাদ প্রেরণ যে কত দূর সম্ভব, বিরহোন্মত্ত যক্ষ সে কথা একবার ভাবিতেও পারিল না। অথবা যাহারা কামশরে জর্জরিত, তাহারা চেতনাচেতন প্রভেদ করিবার শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে।)

মেঘের সঙ্গে মানুষের এই আত্মীয়তাবোধ বর্ষার দিনে আত্মবিস্মৃতির কথা কালিদাস জানতেন।

বিরহী যক্ষের দৃষ্টিতে দেখেও মেঘের মধ্যে চেতনার আরোপ অসত্য হয়ে যায় নি। মেঘদূতের প্রসঙ্গ ছেড়েই দেওয়া যাক। ঋতুসংহারে দেখি :

"সশীকরাম্ভোধরঃ মত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনি শব্দমর্দ্দন :
সমাগতোরাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে—"[৩]

("কামিনীগণের প্রিয়; উৎকটকান্তি বিশিষ্ট বর্ষাকাল, রাজার ন্যায় সমাগত হইল। জলকণাসংযুক্ত মেঘ ইহার মত্ত মাতঙ্গ। তড়িৎ ইহার পতাকা এবং অশনিশব্দ ইহার মর্দ্দল।")

১। বিসর্জন : ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। মেঘদূত : পূর্বমেঘ : শ্লোকসংখ্যা ৫, কালিদাস।
৩। ঋতুসংহার : বর্ষাবর্ণনম্ : শ্লোকসংখ্যা ১, কালিদাস।

এখানে যেমন বর্ষাকে 'রাজবদ্বন্ধতদ্র্যুতি", বলে সমারোহময় বর্ণনা করা হয়েছে, আবার তেমনি 'কামিজনপ্রিয়ঃ' বলে সমারোহময় বর্ণনা করা হয়েছে, আবার তেমনি 'কামিজনপ্রিয়ঃ' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মানবিকভাবে সম্পর্কান্বিত করা হয়েছে। এবং এই ধারায়, মিলন-বিরহ-অভিসার বাসকসজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন মানবিকলীলার মধ্য দিয়ে বর্ষা ভারতীয় সাহিত্যে প্রসারিত হয়েছে —ঝঙ্কৃত হয়েছে পশ্চিমভারতের 'কাজরী' গানে, পূর্বভাবতের বৈষ্ণবকবিতায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমজীবনে রচিত কবিতা-কাকলীতে ঐতিহ্যাগত বর্ষার বিরহ-মিলনের অনুকৃতিধর্মী বিবরণ পাওয়া যাবে। 'ললিতা' নামীয় গাথাকাব্যে যে ঝড়-ঝঞ্ঝার পরিবেশ আছে, তার সঙ্গে শেক্সপীয়র-কোলরিজ-বায়রণের সম্পর্ক অলক্ষ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 'ললিতা' কাব্যের একটি ঝড়ের দৃশ্য স্মরণ করতে পারি—

"গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥
ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার,
মানুষ চিবায় ভূতগণে
সমুদ্র সমান সোরে, বরিষা আছাড়ে জোরে
রেগে রেগে গর্জ্জে বায়ু সনে॥
উপরি উপরি ধ্বনি, আছাড়ে সংস্রাশনি
খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন।
বিদারিয়ে বিটপীরে, বজ্রাগ্নি পোড়ায় শিরে,
কাঁদে যত সিংহ ব্যাঘ্রগণ॥"[৪]

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে মাত্র ইওরোপীয় বা ভারতীয় ধারার অনুবর্তনই করলেন না, তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ওগুলিকে ঔপন্যাসিক

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—'ললিতা' কাব্য।

চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধ করলেন। তাদের একীভূত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর প্রারম্ভেই প্রবল মেঘাড়ম্বর বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-ঝড়ের আয়োজন। এখানে লেখক দুর্যোগের বিস্তৃত বর্ণনা না করে কয়েকটি ইঙ্গিতে তার তীব্রতাকে প্রকাশ করে একেবারে কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই ঝড়বৃষ্টিতে উপন্যাসে নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলি সাধিত হয়েছে :

দুর্যোগের সন্ধ্যায় প্রান্তরের শৈলেশ্বরের মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থী গ্রন্থনায়ক জগৎসিংহ ও নায়িকা তিলোত্তমা এই নাট্যমুহূর্তে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রণয় সঞ্চার। বাইরে প্রবল বর্ষণ, মন্দিরে সঙ্গিনীসহ তিলোত্তমা। জগৎসিংহের প্রবল করাঘাতে ভগ্নদ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্ত দ্বারপথে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া গেল।"[৫]

আর সেই মুহূর্তে মেঘের গর্জনে, বিদ্যুতের আলোয় শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে তিলোত্তমা জগৎসিংহের হৃদয়বিনিময় হয়ে গেল।

বীরেন্দ্রসিংহের পরিবার ও জীবননাট্যে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের প্রবেশ ও একটি রোম্যান্টিক কাহিনীর ইতিহাসের সংগ্রামসংঘাতময় পটভূমিকায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সন্ধ্যায়।

নায়িকাকে এমনভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে যে মনে হয় ভবিষ্যতে এমনি দুর্যোগের ভিতরেই বীরের বাহু দিয়ে তিলোত্তমাকে রক্ষা করবেন জগৎসিংহ। সেদিনের গ্রীষ্মসন্ধ্যায় প্রকৃতির সেই ঘন দুর্যোগের মধ্যে প্রেম ও প্রলয়ের পূর্বসংকেত ঘোষিত হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনীর এই প্রারম্ভ উপন্যাসের কাহিনীর দিক থেকে একটা চমৎকার প্রতীকী পূর্বাভাস। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রথম প্রণয়, প্রণয়াভিসার, পাঠানের সেনাপতি ওসমান খাঁ কর্তৃক বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ, কাহিনীব্যাপী সংঘাতময়তা প্রথমদিনের দুর্যোগের সঙ্গে নাটকীয় নিপুণতায় সংযুক্ত হয়ে এই প্রারম্ভের সাংকেতিক (Symbolic) সার্থকতা এনেছে।

গ্রন্থারম্ভের দুর্যোগের ফলেই নায়কনায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার ও কাহিনীর সূত্রপাত। সুতরাং পরিস্থিতি ও পটভূমিকাসৃষ্টি এই দুর্যোগের অন্যতর উপযোগিতা।

৫। দুর্গেশনন্দিনী : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিকায় দিগভ্রান্ত মানুষের কাহিনী 'কপালকুণ্ডলা'। উপন্যাসটিই নিসর্গকেন্দ্রিক। নিসর্গের বিভিন্ন শক্তি বিচিত্রভাবে গ্রন্থের পাত্রপাত্রীর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কুজ্ঝটিকা মেঘাড়ম্বর, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি এই গ্রন্থে বিচিত্ররূপিণী। এরা কাহিনীর ঘটনাসংস্থানের পরিবেশ ও পটভূমি সৃষ্টি করেছে, কখনো কখনো প্রতীক হয়ে উঠেছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটি আশ্চর্য নাট্যমুহূর্ত সৃটি করে উপন্যাসের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি বর্ণনার কাব্যসৌন্দর্য পাঠককে মুগ্ধ করে। এখানে কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে আচ্ছন্ন ক'রে তাঁর অন্তর্লীন কবিসত্তা অপরূপ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। চিত্রশিল্পীর তুলিকা আর কবির লেখনী মিলিত হয়ে বনপ্রকৃতির দুর্যোগের ঘনঘটা আর তার কেন্দ্রবর্তিনী কপালকুণ্ডলার ভাবমগ্ন আত্মবিস্মৃতি এক অভিনব রসমূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্-নির্ণয় করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল।......আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোনদিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না।'[৬]

এই দিগন্তব্যাপী কুয়াশা নাবিকদের দিক্‌ভ্রান্ত করল। সাগর প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রীরা উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠল। এই ঘটনারই পরোক্ষ ফল বেলাভূমির অরণ্যে নায়ক নবকুমারের বিসর্জন। নবকুমারের বনবাসের মধ্যেই কপালকুণ্ডলার কাহিনীর সূত্রপাত। কুজ্ঝটিকার যবনিকা অপসারিত করবার পরে ধীরে ধীরে লেখক নায়ককে সমুদ্র, কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার জীবননাট্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন। কপালকুণ্ডলার গল্পারম্ভের এই 'কুজ্ঝটিকা' চিত্র অঙ্কনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যঅভিজ্ঞতার প্রভাব আছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। 'পূর্ণচন্দ্র' 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'য় এক দিবসের কুয়াসার কথা বলিয়াছেন। সে দিবসের কুয়াসা এমন হইয়াছিল যে কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। এত গভীর কুয়াশা যে, কলেজ যাইবার কালে বেলা ১০টা ১১টার সময় নৌকায় উঠিয়া ওপারে যাইতে না পারিয়া মূলাজোড় বরাবর পৌঁছিল। পূর্ণচন্দ্র বলেন, 'কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ঐদিনের ঘটনাবলম্বনে।' "[৭] পৃঃ ৪১।

এই কুজ্ঝটিকার কয়েকটি তাৎপর্য অনুমান করা যেতে পারে।

৬। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩৬-১৩৮।

৭। বঙ্কিম রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ : উপন্যাস প্রসঙ্গ, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল।

এই কুজ্ঝটিকাকে কেন্দ্র করেই নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার যোগাযোগ এবং কাহিনীর সূত্রপাত। এদিক থেকে পরিস্থিতিসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে এর বিশেষ উপযোগিতা আছে।

প্রারম্ভিক কুজ্ঝটিকাকে প্রতীকীও বলা যেতে পারে। যেন এই কুহেলিকা কাহিনীর নায়ক নবকুমারকে এক অপরিজ্ঞাত, ভয়াল ও রহস্যময় জীবনতটে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তার পরিচিত অভ্যস্ত সংসারের সঙ্গে এই পরিমণ্ডলের কোনো সম্পর্ক নেই; কাপালিক যেন এক অলৌকিক জগতের করালমূর্তি, কপালকুণ্ডলা এক স্বপ্নজগতের বিদ্যুদ্বিকাশ, নবকুমারের পরবর্তী জীবনেও এই কুজ্ঝটিকা তার রহস্যের মায়া বিস্তার করে রেখেছে—সেই মায়ার আড়ালে কপালকুণ্ডলার হৃদয়জগৎ, তার দুর্নিরীক্ষ্য সেই ভয়াল সূচনা যেন 'ভবানী'র নিবেদিত বলির মতোই তাকে পরিণামের যূপকাষ্ঠে নিয়ে গেছে।

বৃষ্টি প্রসঙ্গেও আমরা বঙ্কিমের অনুরূপ শিল্প-সচেতনতা লক্ষ্য করি। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে সপ্তগ্রামে (স্বগ্রামে) ফিরছিলেন। পথে 'শীতের স্বল্প বৃষ্টি' আবির্ভূত হল:

'শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল।'[৮]

এই শীতের বৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনীতে নেই। তবে এই পরিবেশেই মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের অকস্মাৎ যোগাযোগ ঘটেছে। ঘটনাচক্রে এই সাক্ষাৎকার, নবকুমারের জন্য মতির দুরন্ত তৃষ্ণার এইখানেই সূচনা, কাহিনীর ভবিষ্যৎ ট্র্যাজিক পরিণতির একটি বিষাঙ্কুরের উদ্ভবও ঘটে তারই মধ্যে। এই ঘটনার একটি পরিবেশ সৃষ্টিতেই মাত্র এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাটির সার্থকতা।

অন্যত্র—'মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড সকল উত্তীর্ণ হইতেছে;...'[৯]

এই জ্যোৎস্নায় সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠে নিবিড় বনে কপালকুণ্ডলা একলা ওষুধের সন্ধানে চলেছিলেন। এইখানেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী ও কাপালিকের ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে 'দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।'

৮। কপালকুণ্ডলা: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ

৯। কপালকুণ্ডলা: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ

কিন্তু ঝঞ্ঝায়, মেঘে, বর্ষণে বনপ্রকৃতি ভয়ঙ্করী হয়ে মানুষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল।

'তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল, কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্‌ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপ তিনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না।...অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমত শব্দবোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন।...দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সাগরতীর প্রবাসী সেই কাপালিক।'[১০]

প্রকৃতির এই প্রলয়লীলা আর কাপালিকের অনুসরণ-এর নীরব ভীষণতা সঞ্চারিত করে দুরন্ত নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলেছেন লেখক। ভয়ঙ্কর এবং সুন্দরের অভিনব সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। বনভূমিতে এই প্রবল দুর্যোগ উপন্যাসে অসামান্য তাৎপর্যবাহী; একদিকে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের নিদারুণ ট্র্যাজিডির পূর্ব পটভূমি রচিত হয়েছে, অন্যদিকে সমগ্র কাহিনীর অন্তর্গত অসম সুরটির একটি কাব্যীয় প্রতীক এখানে বিকশিত হয়েছে।

বনের মধ্যে এই ঝড়, বজ্র, মেঘের গর্জন যেন পলাতকা কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির ক্রুদ্ধ আহ্বান, যে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে সে অচ্ছেদ্য

১০। কপালকুণ্ডলা: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

একতানে যুক্ত ছিল, সেখানে থেকে সে লোকালয়ের কৃত্রিমতায় এসে আবদ্ধ হয়েছে বলে—এই প্রতীকী ঝড়ের মধ্য দিয়ে নিসর্গ তাকে যেন ফিরে আসতে বলেছে।

অন্যদিকে কাপালিক আর তার ক্রুর প্রতিহিংসা এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কাপালিক একদিকে থেকে অরণ্যসভার লৌকিক দূত—ভাগ্যের মতো অমোঘ—তার হাত থেকে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও কপালকুণ্ডলার পরিত্রাণ নেই। ঝড় এবং কাপালিকের দ্বৈত সংযোগ কপালকুণ্ডলার অন্তর্বিরোধ এবং নিসর্গ-শক্তির প্রতীক। দুটি সম্পূর্ণ অসম মানসিকতার নরনারীর যে মিলন প্রথম থেকেই ব্যর্থতার জন্য পরিণামনিয়ন্ত্রিত ছিল, এইখানে তা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃশ্যটির সাহায্যে তার একটি সাংকেতিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

প্রকৃতির দাবী অলঙ্ঘ্য। অরণ্যদুর্যোগ আর কাপালিকভীতি কপালকুণ্ডলার রাত্রির ক্ষণকালের তন্দ্রাকেও বিভীষিকাময় দুর্যোগস্বপ্নে ভরিয়ে দিল।

'সমুদ্রের বুকে সুশোভিত তরণীতে কপালকুণ্ডলা—'পশ্চিমগগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে।......অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক নিরূপণ হয় না।......বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজুটধারী......'[১১] স্বপ্নে কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশীর দ্বন্দ্ব। অবশেষে 'নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।'[১২]

এই স্বপ্ন কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টের রূপকচিত্র। কপালকুণ্ডলা কাপালিক-পালিতা, আবাল্য বন্যপরিবেশে, কালিকার আরাধনার ছায়ায় লালিতা। তার সংস্কার, বিশ্বাস, আত্মস্বার্থ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিরাসক্তি, তার চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে অলৌকিকতার দ্বারা অনুরঞ্জিত করেছে। স্বপ্নদৃষ্ট দুর্যোগ ও পরিণতি তার অন্তরের মধ্যে দৈবীনির্দেশের মত জেগে রইল। তারপর ব্রাহ্মণকুমারের পত্র, বনভূমিতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ, কাপালিক ও নবকুমারের

১১। কপালকুণ্ডলা : ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

১২। ঐ ঐ।

যোগাযোগ ও তাদের বিচিত্র কুটিল ষড়যন্ত্র, আকাশে আবার নিবিড় মেঘাড়ম্বর, সমস্ত একত্রিত হয়ে যেন কপালকুণ্ডলাকে ভয়ঙ্কর নিয়তির মত আকর্ষণ করতে লাগল মৃত্যুর অতলে।

আকাশের মেঘসমারোহ যেন পলাতকা কপালকুণ্ডলাকে লক্ষ্য করে আবার কুটিল শাসনের ভ্রূকুটির মতো ফুটে উঠতে লাগল। কপালকুণ্ডলা গৃহপ্রত্যাগমনে উদ্যতা—তাঁর সমস্ত বাস্তবচিন্তাকে আচ্ছন্ন করে জেগে আছে তাঁর আরাধ্যা কালিকার নির্দেশ প্রতীক্ষা। আকাশের নিবিড় মেঘপুঞ্জের মধ্যে তাঁর আশৈশব উপাস্যা খেটক-খর্পরধারিণীর আবির্ভাব ও তাঁর নির্দেশই কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষ হল।

'দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি।… যেন ভৈরবী দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়।'[১৩]

তারপর আকস্মিকভাবে কাপালিক ও নবকুমারের মিলিত ষড়যন্ত্রের মধ্যবর্তিনী হয়ে নির্দেশের জন্য আর একবার আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—

'দেখিলেন, রণরঙ্গিনী খল্ খল্ হাসিতেছেন; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।'[১৪]

সেই রাত্রির মেঘচিত্রিত আকাশপট কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজিডিকে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দিল। কাহিনীটি নির্মম। অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভাষায়—

'নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার কঠিন পাথরের বেদীতে কপালকুণ্ডলা কাহিনীর প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে নিষ্ঠুরতা আছে কিন্তু সেসব মনুষ্যকৃত নিষ্ঠুরতা। কপালকুণ্ডলায় মনুষ্য, প্রকৃতি, দৈব সমস্তই নিষ্ঠুর, সকলেই পরস্পরবিমুখ, সকলেই একযোগে কপালকুণ্ডলার প্রতি বিমুখ।'[১৫]

১৩। কপালকুণ্ডলা: ৪র্থ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

১৪। ঐ ঐ ।

১৫। কপালকুণ্ডলা: শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ১৩৭১ সন, কার্তিক সংখ্যা: কথা-সাহিত্য।

পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলি এই তাৎপর্যকেই সুস্পষ্ট করে। সর্বোপরি প্রকৃতি-প্রেম কপালকুণ্ডলাকে লালন করে এবং প্রকৃতি ক্রোড়বিচ্যুতির ফলেই তার অভিশাপ যেন তাকে সর্বনাশের অতলে আকর্ষণ করে। বনভূমির এই মেঘাড়ম্বর সেই নির্মম পরিণতির এক অসামান্য পটভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় নিসর্গবর্ণনায় নিপুণ চিত্রধর্মিতার পরিচয় বহুস্থলে। কিন্তু লেখক স্বকীয় রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে নৈসর্গিক উপাদানের সঙ্গে নায়িকার অলৌকিকতায় বিশ্বাস সংযুক্ত করে একটি অভিনব চিত্রধর্মী সৌন্দর্য এই পরিচ্ছেদে সৃষ্টি করেছেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে ঝড়বৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ দৃশ্য বা বর্ণনা নেই। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরোক্ষ প্রভাব এই কাহিনীতে যথেষ্ট আছে। কাহিনীর নায়কনায়িকা হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর গোপন প্রণয় ও পরিণয়ের দ্বন্দ্বই গ্রন্থের উপাদান। এর মূল উৎস মথুরার রাজকন্যাদের সঙ্গে যমুনায় জলবিহারকালে মৃণালিনীর জীবনে এক দুর্ঘটনাজনিত দৈবযোগ। নৌকাডুবির ফলে স্রোতো-বাহিকা মৃণালিনীকে রক্ষা করলেন রাজপুত্র হেমচন্দ্র। তারপর তিনদিনব্যাপী ঘোর দুর্যোগের ফলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা, প্রণয় এবং অবস্থাচক্রে গোপনে পরিণয়। 'মৃণালিনী' কাহিনীর সূত্রপাত এইভাবে দুর্যোগের মধ্যে, পরবর্তী ঘটনা সংঘাতগুলির মূলও এইখানে। মৃণালিনীর বিবৃতি স্মরণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে—

'আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনায় জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল।...'[১৬]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সামাজিক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ পারিবারিক, গৃহনিষ্ঠ। নিসর্গের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যখন দুর্যোগের আলোড়ন আসে তার স্পর্শ শান্ত গৃহজীবনকেও কখনও কখনও অশান্ত করে তোলে। নৈসর্গিক ঝঞ্ঝায় বিরতি আসে, কিন্তু পরোক্ষে মানবজীবনে যে আলোড়ন তা সঞ্চারিত করে দেয়, তার পরিণতি কখনও সুখান্তক, কখনও চরম বেদনাময়। বিষবৃক্ষের আরম্ভে দুর্যোগ, মধ্যে দুর্যোগ, অন্ত্যে দুর্যোগের পরিসমাপ্তি। আরম্ভে মেঘাচ্ছন্ন

১৬। মৃণালিনী: ৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি, অন্তে সূর্যালোকিত প্রভাত। এই দুর্যোগের বলি, বালিকা কুন্দনন্দিনী গ্রন্থের অন্যতমা নায়িকা। এই নায়িকা অসামাজিক—'কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে…যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।'[১৭]…পবিত্রতায়, সরলতায়, কুন্দ স্বর্গীয় কুসুম, একটি গাঢ় দুর্যোগের সন্ধ্যায় আশ্রয়স্বজনহীনা এই বালিকা আকস্মিকভাবে এই কাহিনীর সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে, আর একটি দুর্যোগরাত্রির শেষে সংসারের অন্ধকার কোণে অনাদরে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই উপন্যাসের ঘটনাসমূহের গতিপরিণতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করলে মনে হয়, কিশোরী নায়িকাটিকে লেখক নিবিড়তম মমতায় সৃষ্টি করে গভীরতম বেদনায় প্রায় মৌনী করে রেখেছেন, তাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য নৈসর্গিক দুর্যোগের পটভূমিকা বারবার প্রয়োজন হয়েছে। অপ্রগল্‌ভা কুন্দর নির্বাক্‌ অথচ নির্মম অন্তর্দ্বন্দ্বকে সবাক করে তুলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কতখানি সক্ষম হয়েছে, কোন মানবিক উপকরণ দ্বারা তা বোধ হয় সম্ভবপর হত না। অবশ্য অঙ্কন করে কুন্দনন্দিনীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা রচনা ছাড়াও লেখক উপন্যাসের অন্যতর প্রয়োজনও পূরণ করেছেন, ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, প্রতীকী তাৎপর্য বিন্যাস করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যের কেন্দ্রেই কুন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি ও চিত্রশিল্পীর মন সজাগ হয়ে উঠেছে তখনই, যখন নিসর্গদুর্যোগের পট-ভূমিকায় পটচিত্রটি হয়ে উঠেছে কুন্দনন্দিনী। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাকৌশল নৈসর্গিক দুর্যোগচিত্র, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী উপস্থাপনা এবং পটভূমির ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুসমঞ্জস হয়ে উঠেছে। বর্ণনার চিত্রধর্মী নৈপুণ্য কাহিনীর অন্তর্গত ভাবকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চিত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে:—

প্রারম্ভিক ঝড়। নদীতে জ্যৈষ্ঠের তুফান উঠেছে, নৌকায় নগেন্দ্রনাথ। ভাগ্যের অদৃশ্য নির্দেশের মত পত্নী সূর্যমুখীর নিষেধ নগেন্দ্রনাথের স্মরণে এল—'ঝড়ের সময় কখনও নৌকায় থাকিও না।'[১৮] দুর্যোগের মধ্যে গ্রামে আশ্রয়সন্ধানে গিয়েই ভগ্নগৃহে প্রদীপের আলোয় নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দের সাক্ষাৎকার। পরবর্তী অধ্যায়গুলি নগেন্দ্রনাথের শান্ত গৃহজীবনের দুর্যোগের

১৭। বিষবৃক্ষ: ৫ম পরিচ্ছেদ

১৮। ঐ ঐ

কাহিনী। তার সূত্রপাত এইখানেই, এই দুর্যোগ এবং এই সাক্ষাৎকার। জ্যৈষ্ঠের এই তুফান, মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ যেন সাংকেতিক—কাহিনীমধ্যস্থ দুর্ভাগ্য, বিপর্যয়ের পূর্ব সংকেত। নগেন্দ্র ও কুন্দের সাক্ষাৎকারের পরিবেশসৃষ্টি এর অন্যতর প্রয়োজনীয়তা। এখানে দুর্যোগ বাহ্যিক, এখানে বর্ণনায় objective (তন্ময়) বৈশিষ্ট্যই অধিক লক্ষিত হয়। বর্ণনা লঘুভার থেকে ক্রমশঃ গম্ভীরতা লাভ করে যেন একটা ভীষণতর অন্ধকারের দিকে দিক-নির্দেশ করছে।—

'ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল।...

আকাশে মেঘাডম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময় হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপীসকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল...নববারি সমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল।...ঝিল্লীরব...রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব...বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ,... পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষবিধূনন শব্দ...।'[১৯]

এই দুর্যোগেরই পরবর্তী অংশ, গভীর অন্তর্বেদনায় নির্বাক কুন্দচিত্র প্রকাশের সবাক পটভূমি। এই অংশ মনস্তাত্ত্বিক।
এই অংশ বর্ণনায় যেন subjective (মন্ময়) ভাবটিই বেশী ফুটে উঠেছে।—

'নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল।......নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা, বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহে কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল।'[২০]

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্ধকারের সঙ্গে কুন্দর দুর্বিপাকময় তামসী ভবিষ্যৎ এক হয়ে গেছে। তাই কুন্দর ভগ্নগৃহের দ্বারে ঝঞ্ঝার করাঘাত।

১৯। বিষবৃক্ষ: ১ম পরিচ্ছেদ।
২০। বিষবৃক্ষ: ২য় পরিচ্ছেদ।

এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একাধারে পটভূমি ও কুন্দর মানসদ্বন্দ্বে প্রতীক হয়ে উঠেছে।

অন্যত্র—সূর্যমুখীর তিরস্কারে অভিমানিনী কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ করে নিশীথে অপরিচিত পথে একাকিনী যাত্রা করলেন। একদিকে তীব্র অভিমান, অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো তাঁর বাতায়নের আলোকবৃত্তে বার বার ফিরে আসার যন্ত্রণা, সম্মুখে আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন নিষ্ঠুর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের ঘন দুর্যোগময় মেঘমন্দ্রিত রাত্রির পটভূমিতে নিঃসঙ্গ অজানা পথে পথযাত্রিণী কুন্দনন্দিনী যেন একটি কঠিন দুর্ভাগ্যের পরম করুণ ও কাব্যিক চিত্রপট।

এই অংশে বর্ণনাভঙ্গী (subjective) ঘনিষ্ঠ। সমগ্র দুর্যোগচিত্রটি যেন কুন্দের ভাগ্যের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমনে একদিকে শিল্পীর নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে অসীম মানবিক মমতায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্ধৃত বর্ণনায় তা সুপরিস্ফুট :

'রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য…। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে।…ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সার্সী খুলিল।…নগেন্দ্র…নগেন্দ্র…চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাও?'…পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, 'কোথায় যাও?' …কুন্দ চলিল…আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘসকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জিল, মেঘ গর্জিল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?''[২১]

এই ঝড়, বৃষ্টি, মেঘাড়ম্বর বাস্তব হলেও প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক, কুন্দনন্দিনীর দুর্ভাগ্য ও মানসদ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি।

কুন্দের বিষপানে মৃত্যুর রাত্রিও লেখক সমাপ্ত করলেন দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। এই অংশে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কোন বর্ণনা নেই। নগেন্দ্রনাথ-

২১। বিষবৃক্ষ : ১৮শ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমুখীর জীবনে দুর্যোগ এসেছিল কুন্দর সঙ্গে সঙ্গেই। আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে কুন্দ যখন নিজেকে নগেন্দ্রর সংসার থেকে অপসৃত করে নিল, কাহিনীরও মেঘ দূর হয়ে গেল, প্রভাত আলোয় সূর্য্যমুখীকে ফিরে পেয়ে সংসার আনন্দিত হল। এই রাত্রিতে যে বাত্যা এবং বর্ষণ তা সম্পূর্ণই প্রতীকী।

'এখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না, পূর্বদিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল।'[২২]

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মেঘ-বর্ষা-ঝটিকার চিত্র লেখক দুইবার দুটি ভিন্নরূপে অঙ্কন করেছেন। এই দুটি দুর্যোগেই কাহিনীর বিশেষ তাৎপর্যকে প্রকাশ করেছে এবং রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনা বিস্তৃত। বিবৃতির গতি বর্ণনার তাৎপর্যকেই অনুসরণ করেছে। শৈবলিনীর অশান্ত আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করবার জন্য লেখককে নৈসর্গিক রুদ্রতার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রতাপের প্রতি দুর্নিবার প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, তাঁকে লাভ করার অবাস্তব স্বপ্নে শৈবলিনী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন করল। তার স্থৈর্যহীন চিত্তের কাছে সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমারেখাই সেদিন ছিল না। এই উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্তি যে ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর পরিণামের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবে, তারই একটি রূপক ইঙ্গিত প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঝড়ের গতিবেগের বর্ণনায়। অন্যতর তাৎপর্য, প্রভাতী বাতাসের সুস্থির স্নিগ্ধতায় যে কাহিনীর আরম্ভ নিদারুণ দুর্যোগেই তার পরিণতি ঘটবে। গৃহত্যাগের অবিমৃষ্যকারিতায় শৈবলিনী যখন ফস্টরের নৌকায় তখন নদীবক্ষে প্রভাতবায়ুর ক্রমশঃ গতি-পরিবর্ত্তনের বর্ণনায় লেখক যেন রূপকাশ্রয়ে সেই ভীষণ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন :

'প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর, চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে, কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কালো

২২। বিষবৃক্ষ : ১৮শ পরিচ্ছেদ।

মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কানের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে।...ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কানের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জন বাড়িল, বড় হুহুংকারের ঘটা; তরঙ্গসকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল...।'[২৩]

এই বর্ণনায় যে ইঙ্গিত ছিল, শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্তচিত্র তারই পরিণতি। বঙ্কিমসাহিত্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এমন নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর চিত্র কোথাও নাই। শৈবলিনীর প্রতি লেখক সুকঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন। সে প্রায়শ্চিত্ত নরকযন্ত্রণার প্রতিরূপ। লেখক কোন অলৌকিক উপায়ে শৈবলিনীকে দণ্ডবিধান করেন নি—অরণ্য এবং নৈসর্গিক নিষ্ঠুরতা বিধাতার কশার মতো পাপীয়সীকে জর্জরিত করেছে। গঙ্গাজলে প্রতাপবিস্মৃতির প্রতিজ্ঞার পর জীবনের প্রতি সমস্ত আকর্ষণই শৈবলিনীর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর পর্বতভূমির সেই নিদারুণ মেঘাড়ম্বর আর তারই মধ্যে শৈবলিনীর সকরুণ আত্মপীড়নের কঠিন শাস্তিভোগ তাঁর স্বেচ্ছাপ্রায়শ্চিত্তের প্রতিচ্ছবি। মুঙ্গেরের সেই পার্বত্য পটভূমিতে মানুষের হৃদয়মন্থন আর প্রকৃতির প্রলয়তাণ্ডবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক। ভিতরে শৈবলিনীর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাইরে প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ। "আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ, তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সে অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।...শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল।...কণ্টকে ভগ্ন শাগাগ্রভাগে বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদিসকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল...

২৩। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"[২৪] শৈবলিনীর স্বেচ্ছাকৃত এই প্রায়শ্চিত্তকে দুঃসহতর নিষ্ঠুরতর করে তুলল প্রকৃতি। "ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত বনরাজি, দুরন্ত নদী; সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল। জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই।...আকাশে মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

...অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনতমস্তকে পার্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষলতাগুল্মাদির শাখাসকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।"[২৫]

মানুষের চিরন্তন জীবনবাসনা শৈবলিনীর এই মর্মন্তুদ মরণকামনাকে অতিক্রম ক'রে শেষবারের মত জেগে উঠল এই নিশ্চিত মৃত্যুপরিবেষ্টনীর মধ্যে। "অনেক পরে বৃষ্টি থামিল, ঝড় থামিল না, কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রাম পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব।"[২৬]

তারপর—জীবন আর মৃত্যুর, চেতন, অচেতন আর অবচেতন মনের নিষ্করুণ

২৪। চন্দ্রশেখর: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

২৫। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

২৬। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত প্রেমিকার সুকঠিন প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস।

এই অংশে নিসর্গলীলার মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা অসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসগত প্রয়োজনে শৈবলিনীকে নারকীয় প্রায়শ্চিত্ত করানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। শিল্পীর নিপুণ কৌশলে অস্বাভাবিক চিত্তযন্ত্রণার সঙ্গে নিসর্গের সমস্ত রুদ্রশক্তিকে মিলিত ক'রে একটি ভয়াল পার্বত্য দুর্যোগচিত্রের মাধ্যমে শৈবলিনীর নরকদর্শনের পূর্বপটভূমি রচনা করেছেন তিনি। সুতরাং চিত্রধর্মিতা এবং পরিবেশসৃষ্টিও এই নৈসর্গিক দুর্যোগবর্ণনার অন্যতর তাৎপর্য। পূর্বের উদ্ধৃতিটি এই বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে।

'রাধারাণী' উপন্যাসে গল্পের আরম্ভেই ঘনদুর্যোগের সন্ধ্যা। এই দুর্যোগই নায়ক দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় আর নায়িকা রাধারাণীর আকস্মিক সাক্ষাৎকারের কারণ। এই ঘটনাই পরবর্তী সমগ্র গল্পটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের মূলসূত্র রচিত হয়েছে এইখানে।

"রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না।···সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব···।···দুই গণ্ডাবলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার ফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল···।"[২৭]

সেই বর্ষার সন্ধ্যার অন্ধকারে রাধারাণীর দুঃখের মালা কিনলেন রুক্মিণীকুমারের ছদ্মনামে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ। পরবর্ত্তী কাহিনী পথের এই সামান্য পরিচয়কে কেন্দ্র ক'রে; সেই চকিত পরিচয়ের পরিণামেই নায়ক-নায়িকার প্রণয়প্রতীক্ষা ও পরিণয়ে তার সমাপ্তি।

"দেবী চৌধুরাণী" ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলিত তত্ত্বের নির্দেশ অনুসারে সুশিক্ষিতা। এই শিক্ষার ফলে দেবীর মানসিক বিকাশের ব্যাপকতা। চারিত্রিক বীর্য্য, কৌশল, বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও স্থৈর্য, সমস্ত কিছুর পরিচয় লেখক উপন্যাসের একটি দুর্যোগময় চিত্রে

২৭। রাধারাণী : ১ম পরিচ্ছেদ।

সুকৌশলে উদ্ভাসিত করেছেন। তিস্তানদীর খরস্রোতে দেবীর শাণিতবুদ্ধিচালিত বজরা কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে অসম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারে, কয়েকটি জীবনের সঙ্গে কাহিনীর গতি পরিবর্তিত ক'রে একটি পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে। হাস্যরস ও নাটকীয়তায় সফল এই দুর্যোগচিত্রটি তার প্রমাণ:

"হুজুর! তুফান উঠা, বলিয়া বাহির হইতে জোমাদ্দার হাঁকিল; সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, শুনা গেল। কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্তে···শাঁক বাজিল।···বজরার নোঙর ফেলা ছিল না—···খোঁটার কাছে দুইজন নাবিক···যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল।···প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটান ছিল···পালের কাছির কাছে চারিজন নাবিক ···শাঁকের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা পালের কাছিসকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুইজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তারপর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে।···

কিন্তু নৌকা ডুবিল না···কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল।···সাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল।···নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না।··· নিমেষমধ্যে যুদ্ধজয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান করিতেছেন।"[২৮]

বিশ্বাসঘাতক হরবল্লভ ইংরেজ লেফট্‌ন্যাণ্ট সাহেবের গোয়েন্দা হয়ে দেবী রাণীকে ধরিয়ে দিতে এসেছিলেন। দেবীর অসাধারণ কৌশলে, সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে ইংরেজের পাইককে পরাজিত ক'রে, সাহেব এবং হরবল্লভকে যখন বন্দী করেছেন—তখন তাঁর সহায়ক হয়েছে দুরন্ত ঝড় এবং সে ঝটিকা-তাড়িত তিস্তার প্রচণ্ড স্রোত। দেবী চৌধুরাণীর গল্পাংশটি স্মরণ করলে উপরি উক্ত বর্ণনা থেকে দেবীর কৌশলময় বুদ্ধি ও সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে।

২৮। দেবী চৌধুরাণী: ৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

এই কালবৈশাখীর ঝড়ের অন্যতর উপযোগিতা দেবীর সন্ন্যাসিনী জীবন থেকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন। তাঁর বাহ্য রূপান্তর, অন্তরের শাশ্বত নারীত্বের প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা। দেবীর অন্যতমা শিক্ষাদাত্রী নিশিঠাকুরাণীর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

"ঝড় থামিল; নৌকাও থামিল। দেবী···বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত!"

নিশি—"আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

···দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।"[২৯]

স্বামীগৃহ থেকে বিচ্ছিন্না প্রফুল্লকে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন প্রথম পরোক্ষভাবে সূচিত হ'ল বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর কালোমেঘে আর কালবৈশাখীর ঝড়ে; সে আয়োজন সম্পূর্ণ হ'ল অবসিত ঝঞ্ঝার সূর্যালোকিত সুপ্রভাতে।

রাত্রি ও দিন

রাত্রি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। হিংসার উৎক্ষেপ, মৃত্যুর নিবিড় মুহূর্ত্ত, ভীতি এবং অনিশ্চয়তার শিহরণ, আবার প্রণয়ের উন্মাদনা, অভিসারের চিত্তচাঞ্চল্য, বেদনা ও বৈরাগ্যের অনুরণন—রাত্রির বক্ষপুটেই সব চাইতে সার্থকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। যে কোনো আবেগ, যে কোনো অনুভূতি যে কোনো সমস্যা ও সংকট নিশীথের স্পর্শে তীব্র এবং প্রবল হয়ে ওঠে—এমন কি বিজ্ঞান অনুযায়ী রাত্রিতেই ব্যাধির আক্রমণ মরণান্তিক রূপ গ্রহণ করে।

তাই উপন্যাসে, কাব্যে অথবা নাটকে রাত্রিকে আমরা বারে বারে অপরিহার্য পটভূমিকারূপে এমন কি প্রয়োজনীয় চরিত্ররূপে দেখতে পাই।

২৯। দেবী চৌ   ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

শেক্সপীয়র তাঁর "The Merchant of Venice" নাটকে পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লরেন্‌জো আর জেসিকার সংলাপের মধ্য দিয়ে বহু অতীত নরনারীর প্রেম ও বেদনার বৃত্তান্ত এইভাবে উপস্থিত করেছেন :

Lor : The moon shines bright. In such a night as this.
When the sweet wind did gently kiss the trees.
And they did make no noise in such a night,
Troilus methinks mounted the Troyan walls,
And sigh'd his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.
Jes : Did This by fearfully O'ertrip the dew,
And saw the lion's shadow ere himself,
And men dismayed away.
Lor : Stood Dido with a willow in her hand
Upon the wild sea banks, and waft her love.
To come again to carthage.
Jes : In such a night Jew,
Medea gathered the enchanted herbs
That did renew old Aeson."[৩০]

শেক্সপীয়রের নাটকেই আমরা পেয়েছি এক একটি অসাধারণ রাত্রির বিবরণ : চন্দ্রালোকিত সেই অপূর্ব মুহূর্তটি রোমিও জুলিয়েটের অলিন্দদৃশ্য (Balcony scene), ম্যাকবেথ কর্তৃক ডানকান হত্যার সেই প্রলয় রাত্রি, যুদ্ধের পূর্ব-নিশীথে নরদানব তৃতীয় রিচার্ডের বিভীষিকা দর্শন, 'Midsummer Night's Dream'-এর প্রণয় এবং কৌতুকোজ্জ্বল অরণ্য নিশীথিনী অথবা ঝঞ্চাক্ষুব্ধ রাত্রিতে উন্মত্ত লীয়ারের সেই অভিসম্পাত !

পৃথিবীর সাহিত্যে রাত্রির কত বিচিত্র প্রকাশ। মহাকবি গ্যোয়টের 'Walpurgis Night' এক নরকের দৃশ্য ; কোলরিজের 'ইসাবেলা'র রাত্রি কে ভুলতে পারে ? এমিলি ব্রন্টির 'Weathering Heights'-এর বিভীষিকাভরা রজনী সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ; ভিক্তর ইয়ুগোর 'Troilers of the Sea'-তে

৩০। Shakespeare : The Merchant of Venice—Act V, scene I

সামুদ্রিক রাত্রি অনন্ত শিল্পসৃষ্টি। সহস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে চলে। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসের বিবিধ নাট্যিক মুহূর্ত এবং ঘটনার বৈচিত্র্য নিশীথের অঙ্কেই স্থাপন করেছেন।

বঙ্কিম-চন্দ্ররচিত উপন্যাসগুলিতে রাত্রিকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে পাই :

প্রদোষকালে ও সন্ধ্যালগ্নে ; মধ্যযামে :

দুর্যোগ-বিক্ষোভে ; চন্দ্রালোকে ; প্রাগূষায় :

অরণ্য, লোকালয়, পথ, পর্বত, নগরী এবং বিভিন্ন মানসিকতায় এরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রদোষে, সন্ধ্যায়, মধ্যযামে, চন্দ্রালোকে, অমান্ধকারে অথবা দুর্যোগের ঘনঘটায় —রাত্রি চিরদিনই সাহিত্যের অতি মূল্যবান উপকরণ। দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মানুষের দ্বিতীয় সত্তার উদ্বোধন হয়—দিবালোকের স্থূলতা ও প্রত্যক্ষতার উপরে যবনিকা পড়ে—রহস্যময় গভীর, আবেগ-কম্পিত অথবা হৃদ্‌বৃত্তির সংঘর্ষ-মুখর এক নবীন জীবন-নাট্যের পটোত্তলন ঘটে।

স্বভাবতঃই কাব্যে নাটকে কথাসাহিত্যে পটভূমিরূপে অথবা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশরূপে দিনের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল। ঝড়-বৃষ্টি অথবা অন্যবিধ কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রখর তপনতাপ অথবা অপরাহ্নের কোনো বসন্ত সমীরিত উদ্যান—দিনের এই সমস্ত উপাদানগুলিই সাহিত্যে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আমাদের এই ভারতবর্ষে অরুণোদয় এবং প্রভাতকাল —সবিতার বন্দনায়, দেবতার ধ্যানে, পবিত্রতায় এবং প্রশান্তিতে চিরদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত। অতএব প্রভাতের বর্ণনাও বাংলাসাহিত্যে তথা বঙ্কিমসাহিত্যে একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র দিন ও রাত্রির কয়েকটি বিশেষ ক্ষণকে তাঁর সাহিত্যে চয়ন করেছেন। সেই বিশেষ প্রহরগুলি কখনও লেখকের বর্ণনার রঙ্গে চিত্রোজ্জ্বল, কখনও কাহিনীর কোনো বিশেষ বক্তব্যকে সুস্পষ্টতর করে তুলেছে। এক একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ অথবা পটভূমি সৃষ্টি করে ঘটনাগুলিকে আরও তাৎপর্য-গভীরতা দান করেছে। এই প্রবন্ধে এইরকম কয়েকটি স্থলের বর্ণনা ও বিবরণ লক্ষ্য করা যাক। বঙ্কিমসৃষ্ট এই দিবসরাত্রির প্রহরগুলির ক্রমনির্দেশনায় সন্ধ্যার আলোছায়া থেকে দিনের প্রখর আলোকে আমাদের উত্তরণ। কারণ রাত্রি রহস্যে অবগুণ্ঠিত, দিন প্রত্যক্ষতায় আবরণহীন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সমুদ্রতীরে নবকুমার পরিত্যক্ত। তিনি ভীত, বিভ্রান্ত, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কোনদিন যে স্বদেশে ফিরতে পারবেন এ প্রত্যাশা স্বপ্নবৎ—জীবনরক্ষাও সন্দেহস্থল। এই জনহীন ও অরণ্য-সংকুল প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি যেন লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো চতুর্দিক পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন।

"ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতি পদে হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।"[৩১]

সপ্তগ্রামের গৃহাবরোধে কপালকুণ্ডলা, ননদিনী এবং সখী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে নিভৃত আলাপে রত। পরিণীতা দুটি নবযুবতী কিন্তু তাঁদের আলাপ, স্বাভাবিক প্রণয়বিষয়ক নয়। বনললিতা কপালকুণ্ডলার উদাসীন মনকে গৃহমুখী করবার প্রয়াস শ্যামাসুন্দরীর। এই বিশেষ মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্কিমচন্দ্র বন ও নগরের সংযোগ-সীমানায় সন্ধ্যাসমাগমের একটি ফটোগ্র্যাফিক চিত্র যেন তুলে ধরেছেন এই বর্ণনাটিতে :

"এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সুতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।"[৩২]

এই সন্ধ্যাটির পটভূমিকায় সখী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মৃণ্ময়ীর প্রথম কথালাপ ও

৩১। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৩২। ঐ ঐ

শূন্যতার দৃশ্যও উন্মোচিত হয়েছে। উভয়েই গৃহচ্ছাদে দণ্ডায়মানা। বনভূমি-সমৃদ্ধ মহানগর, সপ্তগ্রামের সৌধমালা এবং তরণীপরিকীর্ণ ভাগীরথীর রমণীয় সমগ্রতায় (Panorama) সন্ধ্যার আবির্ভাব অতি সুন্দর একটি চিত্রের মত অঙ্কিত। যে চিত্রধর্মিতা বঙ্কিমের রচনার একটি প্রধান গুণ, বারুণীপুষ্করিণীর রূপায়ণে অথবা বালিয়াড়ীশিখরে নবকুমার কর্তৃক প্রথম কাপালিক সন্দর্শনে যে অনন্য চিত্রী-নৈপুণ্য, এই বর্ণনায় তারই আভাস।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি চিত্রসৌন্দর্যে এবং কবিত্বব্যঞ্জনায় কেবল বঙ্গসাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেই অদ্বিতীয় সৃষ্টি। এ যেন গ্রীক সৌন্দর্য-দেবতা আফ্রোদিতির বিশ্ববিমোহন আবির্ভাব। চিত্রের মনোহারিত্বে এবং ভাষার সঙ্গীতে এই অংশটি যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সর্বোজ্জ্বল "Inspired Moment"-এর দৈবধন! এখানে সন্ধ্যার বর্ণনা বিস্তৃত নয়। কিন্তু সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার পশ্চাৎপট, রহস্য সমাকুল বনভূমি এবং কলমন্দ্রিত সমুদ্র কপালকুণ্ডলার এই আবির্ভাবকে এত বিস্ময়কর করে তুলেছে। যে মানবস্পর্শাতীত ছায়াসঞ্চারিণী সৌন্দর্যসত্তা—অন্ধকারের মধ্যেই তার বিকাশ এবং অন্ধকারেই যে সে হারিয়ে যাবে এখানে যেন তারই ভবিষ্যৎ সংকেত!

"অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।"[৩৩]

'মৃণালিনী' উপন্যাসে নায়িকা মৃণালিনী পাষণ্ড ব্যোমকেশের উৎপীড়নে এবং হৃষীকেশের অবিচারে গৃহ-বিতাড়িতা অবস্থায় গিরিজায়ার সঙ্গে নৌকাযোগে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এই সময়টিও সন্ধ্যাকাল। গঙ্গার বক্ষে নক্ষত্রলোক এবং নগরীর প্রতিবিম্বিত দীপমালায় একটা স্বাভাবিক বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর মানসিক অনিশ্চয়তার কথাও ভুলতে পারেন

৩৩। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

নি। তাই খরতর পবনবেগ। তরঙ্গে ঘোর বিক্ষেপ এবং যাত্রায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে। এ যেন মৃণালিনীর স্রোতোবাহিত এবং তরঙ্গক্ষুব্ধ ভবিষ্যতেরই প্রতীক :

"সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনী দত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুম-সমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কস্পর্শ-জনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভি-ঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল।"৩৪

"তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী"—এই সংবাদ পাওয়ার পর দুঃসহ মনোযন্ত্রণায় অধীর হয়েছেন জগৎসিংহ। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রাত্রি যেন তাঁরই মানস-তমসারই প্রতিচ্ছবি। নিদাঘ-পবন-ব্যজিত ললাটে জগৎসিংহ অন্ধকারের মধ্যে অন্তরমগ্ন ক'রে বসে আছেন, তাঁর কর্তব্যপথ তিমিরাবগুণ্ঠিত; সেই অবকাশে রাত্রির বর্ণনা এই রকম :

"নিশা অন্ধকার; আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত; নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না, কদাচিৎ সচল মেঘখণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তারা দেখা যাইতেছে; দূরস্থ বৃক্ষশ্রী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে; সম্মুখস্থ এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপে স্থিত রহিয়াছে।"৩৫

এই অন্ধকারে 'হীরকচূর্ণবৎ' খদ্যোতদীপ্তি কি তাঁর অন্তর্জ্বালার পরিচয়? জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত তমশ্ছায়া কি তার ভবিষ্যতের সংকেত?

"তখনও রাত্রি আছে, আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগন-মণ্ডলমধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবন-হিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষসকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদুগম্ভীর নিনাদ-

৩৪। মৃণালিনী : ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৩৫। দুর্গেশনন্দিনী : ২য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকারমূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই-নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপট প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"[৩৬]

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহের পর আয়েষার নিভৃত নিঃসঙ্গ মনের সম্মুখে রাত্রির আকাশ। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার মর্মবেদনার আবহরূপে শৈবলিনীর মতো কালরাত্রির করালতা রচনা করেন নি। কারণ, আয়েষার প্রেম হিংস্র বা উন্মত্ত নয়। তা ত্যাগে উজ্জ্বল, নারীত্বের মহিমায় ভাস্বর। তাই তাঁর বেদনাতুর নিশিযাপন রাত্রির স্নিগ্ধ আকাশের আশীর্বাদ লাভ করেছে, যেন পত্রমর্মরধ্বনিতে তাঁরই উদ্দেশ্যে সমবেদনা উচ্চারিত, নক্ষত্র দীপায়ন যেন তাঁর প্রতি দেবলোকের করুণার্দ্র প্রসন্নদৃষ্টি।

নবকুমার যখন আপন অজ্ঞাত অদৃষ্টের তাড়নায় কাপালিক কর্তৃক ভবানীর বলির জন্য উৎসর্গীত তখন মূর্তিমতী ত্রাণকর্ত্রীর মত কপালকুণ্ডলা কৌশলে তাকে কাপালিকের মৃত্যুকবল থেকে রক্ষা করলেন। তারপর কাপালিকের ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উভয়েরই পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তারপর সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বনপথে সন্ত্রস্ত দুটি নরনারী অনিশ্চিতের অভিমুখে যাত্রী। অরণ্যের সেই অন্ধকার তার সমস্ত ভীষণতা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এখানে চিত্রিত:

"সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুইজনে উর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।...অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখনও কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়—কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।"[৩৭]

"চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি।..."[৩৮]

কপালকুণ্ডলা বিসর্জনের এ রাত্রি। প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ সুষমা দিয়ে যেন কপালকুণ্ডলাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে আজ প্রকৃতিক্রোড়বিচ্যুতা। সামাজিক জীবনের পঙ্কস্পর্শে সে নিসর্গসম্ভব সৌন্দর্য ম্লান, হয়ত সেইজন্যই

৩৬। দুর্গেশনন্দিনী: ১ম খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ।

৩৭। কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৩৮। কপালকুণ্ডলা: ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জনের প্রয়োজন এল। সামাজিক মনের এ বিকৃতিকে কুণ্ঠিতা প্রকৃতি যেন তাই রাত্রির জ্যোৎস্নাকে আচ্ছাদন করে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিয়েছেন। মাতৃপূজার নামে যে বীভৎস হত্যার আয়োজন সেদিন কাপালিকের পূজাস্থানে সংঘটিত হতে চলেছিল, দেবচক্ষুরূপ আকাশের চন্দ্র সে দৃশ্য যেন সহ্য করতে পারল না—মেঘান্তরালে অস্তমিত হল।

অপমানিতা কুন্দ প্রেমের সকরুণ দুর্বলতায় অশান্ত হৃদয়কে, সবল শাসিত করে অভিমানে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করলেন। বাইরে ঘন দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি, কুন্দর অন্তরেও সেই তমিস্রার ছায়া। একান্ত অসহায় কিশোরী, সম্মুখে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর এক অজানা পথ, অনিশ্চয়তার শঙ্কায় বিভীবিকাময়, তথাপি "কুন্দ চলিল।" ভীষণতায় গাম্ভীর্যে রাত্রির এই চিত্রটি পাঠকের কল্পনাকে শিহরিত করে। কুন্দর নিদারুণ অসহায়তা আর রাত্রির অন্ধকার আর দুর্যোগের ভীষণতা দুই-এর বৈপরীত্য এই রাত্রির বর্ণনায় সুপরিস্ফুট। নিশীথিনীর এই মসীময়ী মূর্তির একটি মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা আছে। এই পটভূমি কুন্দর ভাগ্যের অনিশ্চয়তা ও তার মানসদ্বন্দ্বের পরিচায়ক।

"রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাক্‌চিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে, ফুটিতেছে।……আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে…আকাশে দুই একটি নক্ষত্রমাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউগাছের শ্রেণী,…বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচীভাষায় কুন্দর মাথার উপর কথা কহিতেছে।…কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে,……আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘসকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল…বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল, বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?"[৩৯]

"বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই।…ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না।…

৩৯। বিষবৃক্ষ : ২০শ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে। সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।"[৪০]

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ঘনবর্ষায় মসীকৃষ্ণ রাত্রিতে পথ চলতে চলতে দিশাহারা। এমন সময় শায়িত একটি মনুষ্যশরীর তিনি অনুভব করলেন। পথের ধারে এই মুমূর্ষু নারী স্বয়ং নগেন্দ্রের পত্নী সূর্য্যমুখী। দারুণতম অভিমানে তিনি গৃহত্যাগিনী, কিন্তু কোথায় তিনি যাবেন? ভাগ্যবিড়ম্বিতা সূর্য্যমুখীর জীবনও তো দুর্যোগের দারুণ অন্ধকারে পথভ্রষ্ট—তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো পরিণাম নেই। এই রকম একটি রাত্রিতে, তাঁকে মরণাপন্ন অবস্থায় পথিপার্শ্বে স্থাপন করে বঙ্কিম সূর্য্যমুখীর বেদনাকে মর্মন্তুদ করে তুলেছেন; রাজরাণী যে কী সকরুণভাবে ভিখারিণী হয়েছেন তা এই পরিবেশে যতটা পরিস্ফুট হয়েছে, তা আর অন্যভাবে বা অন্যত্র সম্ভব ছিল না।

"অর্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব-উন্নিসা বাদশাহ দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুলোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার—কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজিতুল্য, সমুদ্রে ফেন-নিচয়তুল্য এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্নরাশিতুল্য, একস্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে—আর সর্বত্র নিঃশব্দ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্রিগ্রহণগুরু গর্জ্জিত" কখন বা একমাত্র কামানের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল।"[৪১]

রাজসিংহের রণপাণ্ডিত্যে সম্রাট ঔরংজেবের পত্নী, কন্যা প্রমুখ সমগ্র অবরোধ উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে আনীত। সম্রাটের অন্তঃপুরিকারা সেখানে যোগ্য

৪০। বিষবৃক্ষ: ৩৪শ পরিচ্ছেদ।

৪১। রাজসিংহ: ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মর্যাদার সঙ্গে গৃহীতা। কিন্তু অভিমানিনী জেব-উন্নিসার মনে বিচিত্র ভাব ও ভাবনার সংঘাত চলছে। বন্দিনীরূপে আহত আত্মসম্মান তাঁকে মধ্যে মধ্যে কুপিতা করে তুলছে। কিন্তু মবারকের মৃত্যুর পর দর্পিতা রাজনন্দিনীর আর সে অহমিকা নেই। কখনো তীব্র আত্মগ্লানি তাঁকে দগ্ধ করছে, কখনো বা যন্ত্রণায় তিনি শরাহতা হরিণীর মতো ছট্‌ফট্‌ করছেন। বাইরে দূরে যুদ্ধশিবিরের আলোকমালা। কখনো বন্দুকের শব্দ, কখনো বা গিরিসংকটে ধ্বনিত কামানের রোল—সব একত্রে মিলিত হয়ে জেব-উন্নিসার অন্তরযন্ত্রণাকে যেন তীব্র এবং দুঃসহ করে তুলেছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও প্রবল বায়ুবেগ জেব-উন্নিসার মানসিকতাকেই সহায়তা করছে।

"আজ রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী জলপূর্ণতার জন্য ধূম্রবর্ণ; তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার, গাঢ়, অনন্ত, সর্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।"[৪২]

গঙ্গার জলে প্রতাপকে বিস্মৃত হবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবার পর শৈবলিনীর জীবনের সমস্ত আশা, আলো, ভবিষ্যত, গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হল। এই দুরন্তনারীর অন্তরাকাশের সুনিবিড় মসীলেখা যেন বাইরে প্রকৃতিকে এক সর্বাবরণকারী অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে। শৈবলিনীর সেই দুর্ভাগ্যের রাত্রিতে নিসর্গ যেন তারই হৃদয়দর্পন। শুক্লপক্ষের রাত্রি তাই চন্দ্রহীন, আকাশ প্রান্তর আবৃত করে মেঘের তমিস্রা নেমেছে, সেই বিপুলব্যাপ্ত অন্ধকারে শৈবলিনী একাকিনী। এই রাত্রির চিত্র শৈবলিনীর সীমাহীন যন্ত্রণাকে একটি অপূর্ব তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা দান করেছে।

"রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত। একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য নীরব। রবের মধ্যে দূরে, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে

৪২। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ।"[৪৩]

আনন্দারণ্যের স্বাভাবিক স্তব্ধতা এখানে নিবিড়তর; চন্দ্রহীন রাত্রি এবং দুর্ভেদ্য বনভূমির এই হৃৎকম্পনকারী মৌনকে আরো ভয়াল করে তুলেছে কচিৎ পক্ষিকুলের ডানার শব্দ, কখনো বা দূরশ্রুত ব্যাঘ্রগর্জন। এখানে একটি ভগ্ন অট্টালিকার শীর্ষে চিন্তাকুল ভবানন্দের এই পরিবেশটিই প্রয়োজন ছিল। তিনি বীরপুরুষ, শাসিতেন্দ্রিয়, সন্তানদের অন্যতম অধিনেতা। অথচ কল্যাণীর সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট, তাঁর সাধনস্থিত চিত্ত আজ বিচলিত। অন্তরে অন্তরে তিনি ব্রতচ্যুত। একদিকে অপরিসীম আত্মগ্লানি, অন্যদিকে রূপমোহের তীব্র আকর্ষণ হৃৎক্ষেত্রে এই দ্বৈরথের ফলে ভবানন্দ জর্জরিত। তাই সমগ্র বিশ্বসংসারের শ্রুতিদৃষ্টির বহির্ভাগে আত্মসমীক্ষার এই নিবিড়তম ও তিমিরান্ধ বনভূমিই এই মুহূর্তে তাঁর আবশ্যক ছিল।

"একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়। পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়। শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল; কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল।...

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"[৪৪]

'আনন্দমঠ' এর সূচনায় যে মহারণ্যের উপর এক মহাযাম বর্ণিত হয়েছে তা যেমন মহিমান্বিত তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। অনন্ত অন্ধকার, কল্পনাতীত

৪৩। আনন্দমঠ: ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৪। আনন্দমঠ: উপক্রমণিকা।

নৈঃশব্দ্য, মহাবনের দুর্ভেদ্য রহস্য-জটিলতা—সমস্ত একসঙ্গে মিলে যেন এখানে রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার নাট্যিক মুহূর্ত রচিত। এই অন্তঃশূন্য অরণ্য এবং অননুভবনীয় তমসা যেন নিজের বিশাল, অজ্ঞেয় গর্ভে কোন্ এক অলৌকিক, অপার্থিব বার্তা বহন করছে। 'আনন্দমঠ' এর সূচনায় এই ভয়াল গম্ভীর পরিবেশ রচনা যেন কোনো রুদ্র সন্ন্যাসীর আত্মরুদ্ধ তপস্যার সঙ্গে তুলনীয়: "অন্তশ্চরাণাং মরুতান্ নিরোধান নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"[৪৫]

এই প্রতীক্ষাময় ভয়াল মৌন বিদীর্ণ করে যে প্রশ্নোত্তরমালা নিশীথ কাননে নিনাদিত হল, তার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাত্মক তপস্যার শ্রেষ্ঠ দানের সত্যটি নির্দেশিত। উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা জানতে পারি এই প্রশ্নকর্তা "আনন্দমঠ" এর প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ এবং উত্তরদাতা তাঁর গুরু। উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-সংঘের কার্যাবলীর যে পরিচয় আমরা পাই, তার প্রথম উদ্দীপন এইখানেই। যেমন বোধিদ্রুমচ্ছায়ে গৌতম প্রথম বুদ্ধত্বলাভ করে বলেছিলেন, 'গেহকারকং দিঠঠোসি পুন গেহং ন কহোসি' সেইরকম এখানেই সত্যানন্দ পেয়েছিলেন তাঁর 'আনন্দমঠ' এর মর্মবীজ: "প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে।"

"দিতে হবে—" "ভক্তি।"

শক্তি এবং ভক্তির অদ্বৈতসাধনাই 'আনন্দমঠ।' এই উপক্রমণিকার মহান্ধকার তপস্যারণ্যে এক স্তব্ধতম রাত্রির মধ্যযামে সাধক সত্যানন্দ সেই সাধনায় তাঁর গুরুমন্ত্র লাভ করেছেন।

"সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।...

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।"[৪৬]

রজনী প্রেমমুগ্ধা, অনাগতপ্রাণা। বিবাহপ্রচেষ্টা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হীরালালের মত দুর্জনের সঙ্গে অনিশ্চিতের মত ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু বিপদ সেখানে নিষ্ঠুরতর। অন্ধনারী অবশেষে গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জন ছাড়া অনন্যোপায়। নিশ্চিত শীতল মৃত্যুর ক্রোড়ে রজনী ধীরে

৪৫। কুমারসম্ভবম্: ৩য় সর্গ, শ্লোকসংখ্যা ৪৮, কালিদাস।

৪৬। রজনী: ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

অতি ধীরে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপ্ত করে রাত্রি যেন ধ্যানমৌন, নিয়ে কলনাদিনী গঙ্গা এক সুগম্ভীর সঙ্গীতের মত অনন্তের পথে প্রবাহিনী। রাত্রি, গঙ্গা, রজনীর প্রণয় আর তীব্র নিরাশা সমস্ত চিত্রটিকে সুগভীর কারুণ্য দিয়েছে।

কিন্তু এই চিত্রপটের ভূমিকা এইখানেই সমাপ্ত নয়। সন্ন্যাসীর মন্ত্র প্রভাবেই হোক অথবা অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপেই হোক—এই চিত্রটিই নায়ক শচীন্দ্রের কামনার ধ্যানপটে উজ্জ্বলতম বিভাতি পেয়েছে, নায়ক-নায়িকার মিলন ত্বরান্বিত করেছে।

"কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্র-শৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্ট লক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগসকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুকুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল, প্রকৃতি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল।"[৪৭]

কাহিনীর পাত্রপাত্রী যখন একটি বিশেষ ঘটনার সম্মুখীন হয়, বঙ্কিমের বর্ণনায় প্রকৃতির পটভূমি স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার প্রকৃতি অনুসরণ করে।

এখানে একটি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির শেষপ্রহর বর্ণিত। কুন্দর পলায়নের রাত্রি ছিল ভয়ঙ্কর। নগেন্দ্রকে ক্ষণমাত্র দর্শনের আশায় কুন্দ গোপনে নগেন্দ্রের উদ্যানে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কুন্দর ভাগ্যের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি শেষপ্রহরে উপনীত হয়েছিল, বাতাস অনুকূল, প্রকৃতি মমতায় স্নিগ্ধ। সেই রাত্রিশেষের প্রথম উষার আলোয় কুন্দ সূর্য্যমুখীর হাতে বন্দিনী হয়ে নগেন্দ্রের বধূ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষের আকাশে চন্দ্র ছিল ক্ষীণ আর বৃক্ষান্তরালে লুকোন ছিল রাশি রাশি অন্ধকার। এই ক্ষীণ চন্দ্রালোক আর রাশি রাশি অন্ধকার যেন কুন্দেরই ভাগ্যের প্রতিলিপি।

এই বিশেষ নৈসর্গিক উপাদানটি কাব্য, কথাসাহিত্যে বা নাটকে বিবিধ প্রয়োজনে অতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। রোম্যান্টিক প্রণয়দৃশ্য, কল্পনাময় সৌন্দর্যসৃষ্টি অথবা চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট করবার প্রয়োজনে চন্দ্রালোক ব্যবহৃত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সুপরিচিত ঐতিহ্যলব্ধ প্রাকৃতিক উপকরণটিকে বিভিন্ন

৪৭। বিষবৃক্ষ: ২৩ পরিচ্ছেদ।

ত্র তাঁর উপন্যাসে আহরণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে সন্ধ্যা বা রাত্রি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চন্দ্রালোকিত। জ্যোৎস্না এবং চন্দ্র বিবিধ প্রয়োজনে তাঁর রচনায় বিন্যস্ত হয়েছে :—

১। নায়কনায়িকার সাক্ষাৎকার (দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল)

২। ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাববৈপরীত্যের প্রকাশ (চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ)

খ) রহস্যময়তা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ (মৃণালিনী)

৩। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে পটভূমি রচনা।

৪। নিছক সৌন্দর্যবর্ণনা (চন্দ্রশেখর)

৫। নারীসৌন্দর্যের চিত্রকল্প বর্ণনায়।

নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনে কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির সৌন্দর্যের বর্ণনা লক্ষ্য করা যেতে পারে :

"শ্যামোজ্জ্বল শাখাপল্লব-সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত; কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল; কাননতলে ঘোরান্ধকার; কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে; আমোদরের স্থিরাম্বুমধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত; দূরে, অপরপারস্থিত গগনস্পর্শী মূর্ত্তি। কোথাও বা তৎপ্রসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব।"[৪৮]

এই অংশটিতে নিছক সৌন্দর্যবর্ণনা। এই সৌন্দর্যই বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের প্রাসাদের জানালা থেকে দেখেছিলেন, আম্রকাননে শ্রুত তূর্যধ্বনির রহস্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে। সে রাত্রে বাইরে আম্রকানন যখন জ্যোৎস্নার মায়াজালে আচ্ছন্ন তখন একদিকে শত্রু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, অন্যত্র প্রাসাদের নিভৃতকক্ষে জগৎসিংহ তিলোত্তমার ক্ষণমিলনের বাসর রচনা করেছেন। আর সবিশেষ কোনো তাৎপর্য এই অংশের নেই।

"চারিদিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাগুল্মশোভী বিশাল বিটপী-সকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপর চন্দ্র-নক্ষত্র-জলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে বাপীসোপানে, নীলজলে সর্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা,

৪৮। দুর্গেশনন্দিনী : ১ম খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ।

ধৈর্য্যময়ী। সেই ধৈর্য্যময়ী প্রকৃতি প্রাসাদমধ্যে মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।"৪৯

দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের একটি অত্যন্ত মনোরম ও উপযোগী পরিবেশ এখানে রচনা করা হয়েছিল। দুটি হৃদয়ই পরস্পরের জন্য উদ্বেল, ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মৃণালিনী এতদিনে তাঁর পরম বাঞ্ছিতকে লাভ করেছেন। কিন্তু হঠকারিতা এবং ভ্রান্তির দ্বারা হেমচন্দ্র এমন মধুর মুহূর্ত এবং রূপোজ্জ্বল পরিবেশটিকে এক নিষ্ঠুর বেদনাময়তায় পরিণত করলেন। মৃণালিনী কেন হৃষীকেশের গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার পূর্ণ সত্য তিনি শুনতে চাইলেন না—পূর্বশ্রুত মিথ্যা অপবাদকেই মৃণালিনীর উপরে আরোপ করে বীভৎসতম অবমাননায়, অপাপবিদ্ধা, সরলা, প্রণয়মুগ্ধা মৃণালিনীকে জর্জরিত করে চলে গেলেন। এই সকরুণ বিষাদনাট্যে চন্দ্রালোকিত এই রাত্রির পরিবেশটি যেন মৃণালিনীর যন্ত্রণাকে আরো নির্মম পরিহাসে ভরিয়ে তুলেছে।

"ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল।…তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাঁহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে।…গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্ত্তিবৎ সে চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন।"৫০

উপর্যুক্ত অংশটি রোহিণী ও গোবিন্দলালের সাক্ষাৎকার ও পূর্বরাগ সঞ্চারের মনোরম পটভূমি। বারুণীপুষ্করিণীর চন্দ্রালোকিত সৌন্দর্য রোহিণী-গোবিন্দলালের চিত্তোন্মাদনাকে জ্বালিত করে তুলেছিল; সেই বসন্তসন্ধ্যার পুষ্পসমারোহ কোকিলের কুহুধ্বনি আর সুবাসের মদিরতায় গোবিন্দলালের প্রসুপ্ত রূপতৃষ্ণা আর রোহিণীর ব্যর্থযৌবনজ্বালা উন্মথিত হল একটি সকরুণ বেদনার মধ্যে। "চম্পকবর্ণ জ্যোৎস্না"য় রোহিণীর সম্মুখে উদ্ভাসিত হল গোবিন্দলালের "চম্পক-নির্মিত মূর্ত্তি", আর গোবিন্দলাল সেই দুর্লগ্নে বারুণীর কৌমুদীময় জলদর্পণে

৪৯। মৃণালিনী: ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

৫০। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

প্রতিবিম্বিত দেখলেন সৌন্দর্য্যের স্বর্ণপ্রতিমা। তার ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে গোবিন্দলাল অনুভব করলেন নিষ্ঠুর সমাজের অকরুণ বিধান।

"গোবিন্দলাল সেই স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ।"[৫১]

সেদিন পূর্ণচন্দ্রের দীপালোকেই রূপবিহ্বল ও করুণাকাতর গোবিন্দলাল মৃত্যুরূপা রোহিণীকে তাঁর জীবন বরণ করে নিলেন।

উপন্যাসটিতে চন্দ্রালোকের সার্থকতা এখানেই। অনুরাগসৃষ্টির পরিবেশরচনা ছাড়াও জ্যোৎস্নাদীপ্তা বারুণী ব্যঞ্জনাত্মক সৌন্দর্যচিত্র চিত্রণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উদ্ধৃত উপযুক্ত পংক্তিগুলিতে চিত্রধর্মী বর্ণনার একটি অপূর্ব নৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়েছে।

২। (ক) জ্যোৎস্নার রূপ কখনও কখনও ভাবের বৈপরীত্যকে তীক্ষ্ণতা দান করে, অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুপরিস্ফুট করে :

"কপালকুণ্ডলা একাকী সঙ্কীর্ণ বনপথে ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেতমেঘখণ্ডসকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণে প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেতকুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। পশুপক্ষী নীরব।......মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ, একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র।..."[৫২]

শ্যামাসুন্দরীর জন্য অরণ্যে ওষধিআহরণে চলেছেন কপালকুণ্ডলা—সেই বনভূমির একটি চিত্রধর্মী বর্ণনা উপস্থিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এর ফলে যেমন জ্যোৎস্না রাত্রির সৌন্দর্য প্রকটিত হয়েছে, তেমনি মতিবিবির সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের যে দুর্যোগ-রাত্রি ঘনায়মান, তারও ছায়া আভাসিত; সেইজন্যই যেন বিধাতার বিদ্রূপ বা 'Irony'র মতো জ্যোৎস্নারাত্রি আজ 'মধুরা ও স্নিগ্ধরশ্মিময়ী।'

৫১। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৫২। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

"মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল ;......পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন।"[৫৩]

কপালকুণ্ডলার জীবনে সর্বনাশ এল ব্রাহ্মণের বেশে। পদ্মাবতীর স্বার্থ আর কাপালিকের প্রতিহিংসা অন্ধকারের প্রেতের মত জ্যোৎস্নারাত্রির সমস্ত সুষমাকে হত্যা করে প্রকৃতির সৌন্দর্যপ্রতিমা কপালকুণ্ডলাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল।

"নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত, শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল ; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকরপ্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিনী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী..."[৫৪]

নবদ্বীপের উপবনে পালঙ্কে শায়িত হেমচন্দ্র বাতায়নপথে চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে গঙ্গার সৌন্দর্য দর্শনে তন্ময় হয়ে আছেন। এই বর্ণনার কোনো ভাবগত তাৎপর্য নেই—মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিস্ফুট করাই কবি ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। তবে এই জ্যোৎস্নাকিরণেই হেমচন্দ্র এক মনুষ্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেছেন—বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের এই প্রথম ছায়াসঞ্চার।

"রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী ; আকাশে তারা ; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল।...পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন ? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজি সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন ? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল।...জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না...।"[৫৫]

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রনাথ তাঁর সন্ধানে গোবিন্দপুর যান। সেখানে সূর্য্যমুখীর মিথ্যা (ভ্রান্তিমূলক) মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি শোকার্তচিত্তে যখন শিবিকায় ফিরছিলেন তখন শিবিকাদ্বারপথে দেখলেন কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নার রূপ—সুন্দর-নিষ্ঠুর ! স্মৃতি উদ্বেল হ'য়ে উঠল। এইরকম কত মোহিনী রাত্রি নগেন্দ্র-

৫৩। কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৫৪। মৃণালিনী : ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৫৫। বিষবৃক্ষ : ৩৮শ পরিচ্ছেদ।

মুখীর দাম্পত্য-জীবনের সুখ-স্মৃতিতে বিধৃত, কত আনন্দ, কত ভালবাসা এই চন্দ্রকিরণস্নাত নিশীথের সঙ্গে বিজড়িত। আজ শোকাহত অনুতপ্ত নগেন্দ্র তাই এই সৌন্দর্যকে সহ্য করতে পারছেন না—তাঁর কৃতকর্মের জন্য গ্লানি এবং সূর্য্যমুখীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় রূপসী রাত্রি তাঁর কাছে একান্ত হৃদয়হীনায় পরিণত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্যের আর একটি শুক্লপক্ষের রাত্রি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে। নগেন্দ্র গঙ্গাবক্ষে; নৌকারোহণে কাশীত্যাগ করে রাণীগঞ্জ চলেছেন মৃতপ্রায় সূর্য্যমুখীর সন্ধানে। 'নিশা চন্দ্রহীনা' কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, পৃথিবী সজ্জিতা। প্রকৃতির এই আনন্দযজ্ঞ নগেন্দ্রনাথের বক্ষে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা ধরিয়ে দিল।

"...নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেইদিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ততেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে...। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ! নীলাম্বরবৎ স্থির নীল তরঙ্গিনীহৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে।...আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী—সকলই জ্যোতির্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য তাহার আজি সহ্য হইল না।"[৫৬]

গঙ্গানদীর উপকূলে ইংরেজের নৌকা শ্রেণীবদ্ধভাবে বাঁধা। ইংরেজের নৌকায় বন্দী প্রতাপ রায়কে উন্মাদিনী সেজে সুকৌশলে মুক্ত করল শৈবলিনী। দুইজনে গঙ্গার জলে সাঁতার দিয়ে পলায়ন করতে লাগল। এই রাত্রিটির পরিবেশ রচনা করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গার জল, আকাশ, তটভূমির বনরাজির অতি সুন্দর একটি বিবরণ দিয়েছেন।

"জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখোচিত নীল,...নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা

৫৬। বিষবৃক্ষ: ৩৬ শ পরিচ্ছেদ।

অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন মনুষ্য আপনাকে গণনা করে।"[৫৭] "চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।"[৫৮]

লক্ষণীয়, এখানে 'নীল' বর্ণের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

"গঙ্গার জল ঘন নীল…রত্নখচিত নীল।"

এই নীলিমার যথার্থ ব্যঞ্জনা পাওয়া যাচ্ছে তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, যেখানে গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীকে দিয়ে নিষ্ঠুরতম শপথ করিয়ে নিচ্ছেন প্রতাপ: "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি। …আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"[৫৯] বস্তুতঃ এইখানেই শৈবলিনীর উন্মত্ত অভিসারের সমাপ্তি, তার সর্বাকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ—তার জীবন উদ্দেশ্যহীন। জ্যোৎস্না তাই এখানে "নীল বিষে"র মতো জ্বলছে—এ শৈবলিনীরই মৃত্যুবিষ।

"বন অত্যন্ত অন্ধকার…চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আর বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।"[৬০]

ঘন আরণ্য তরুশ্রেণীর আচ্ছাদন আনন্দারণ্যকে দুর্গের নিরাপত্তা দান করেছে। বনের আকাশে মাঝে মাঝে বৃক্ষপ্রাচীরের অন্ধকারকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে চাঁদ ওঠে। আলো-অন্ধকারের লুকোচুরির মধ্যে প্রকৃতি যখন সৌন্দর্যস্বপ্নে মগ্ন, তখন নগরবাসিনী মা মন্বন্তরের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সন্তান বুকে অরণ্যাশ্রয়ে ছুটে আসছেন। সেই শঙ্কিত মাতৃত্বকে গ্রাস করবার জন্য অনুসরণ করছে একদল অন্নহীন মানুষের কদর্য ক্ষুধা, জ্যোৎস্নাস্নাত আনন্দারণ্যের নৈশধ্যানকে ছিন্নভিন্ন করছে সেই ক্ষুধার নগ্ন পাশবিক উল্লাস।

জ্যোৎস্নারাত্রির সমস্ত সৌন্দর্যকে মৃত্যুবিভীষিকায় পরিণত করেছে আর একটি রাত্রির বর্ণনা। মাতৃভূমির রক্ষায় ইংরেজের সঙ্গে সন্তানসেনার শেষ

৫৭। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

৫৮। চন্দ্রশেখর: ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫৯। ঐ

৬০। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

"সংগ্রাম সমাপ্ত হয়েছে। এই যুদ্ধেই ব্রতভঙ্গকারী সন্তান ভবানন্দ, জীবানন্দ, নবীনানন্দের মৃত্যুপ্রায়শ্চিত্ত। সেই বীভৎস রণভূমিতে মৃত জীবানন্দের দেহ সন্ধান করছিলেন নবীনানন্দ, জীবানন্দের সহধর্মিনী, সহমর্মিনী শান্তি!

"পূর্ণিমার রাত্রি! সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির।…বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্রে জড়াজড়ি, জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।…নিশীথ-কালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে কি খুঁজিতেছিল …শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।"[৬১]

এই জ্যোৎস্নারাত্রির মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যে আলোর আভাস ছিল। জীবানন্দ নবীনানন্দের বিচ্ছেদ, প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই ছিল শান্তি-জীবানন্দের ভবিষ্যৎ আত্মিক মিলনের স্বপ্ন, সম্ভাবনা।

(খ) অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে রহস্যের সংমিশ্রণ :-

আত্মজীবনের যন্ত্রণাকে নিভৃতে শান্ত করবার জন্য মনোরমা সন্ধ্যাবেলা একলা যখন দীর্ঘসোপানে স্থির হয়ে বসে আছে তখন হেমচন্দ্রের সঙ্গে এই অদ্ভুত সাক্ষাৎকার। জ্যোৎস্নালোকে মনোরমার প্রায় অপ্রাকৃত একটি রূপ তার অন্তরশায়ী রহস্যের দ্যোতনা যেন হেমচন্দ্রের মনে সংকেতিত করে তুলেছে।

"হেমচন্দ্র…নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন।…সোপানমার্গের নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন।…দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজালস্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।"[৬২]

৩। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে পটভূমি রচনা: একটি জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা—

হেমচন্দ্র কর্তৃক বিনা অপরাধে লাঞ্ছিতা মৃণালিনী এক অসীম শূন্যতার মধ্যে বাস করছেন। সংসারে কোথাও তাঁর যেন আশ্রয় নেই, অবলম্বনও

৬১। আনন্দমঠ: ৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৬২। মৃণালিনী: ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

নেই। এই নিদারুণ মনোযন্ত্রণার মধ্যে আংশিকভাবে শান্তিদায়িনী সন্ধ্যার আবির্ভাব—উদ্যানের সুরভিত পুষ্পরাজিতে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল উদ্ভাস যেন মৃণালিনীর তপ্ত হৃদয়ে কিছু শান্তির প্রলেপ, কিছু সান্ত্বনার আভাস। এই সন্ধ্যার বর্ণনাটি এই রকম:

"শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী অর্ধপ্রস্ফুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দেশ করিতেছিল; কচিৎ দুই একটি দীর্ঘশাখা উর্ধ্বোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুটকুসুম-সৌরভ আসিতেছিল।"[৬৩]

অতীতপ্রায় একটি সন্ধ্যা:

কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রর বিবাহ সংঘটিত হ'লে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন; অনুতাপবিদ্ধ নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখীর সন্ধানে সংসারত্যাগী। অতএব সূর্য্যমুখীর সাধের লতা-মণ্ডপে হীরার অধিকারে। কুন্দনন্দিনীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দেবেন্দ্র যখন এই লতা-মণ্ডপে হীরা-সন্নিধানে উপস্থিত, তখন সান্ধ্য-জ্যোৎস্নায় জমিদার-বাটীর উদ্যান পরিপ্লাবিত। দেবেন্দ্র হীরাকে চান না—কিন্তু হীরা দেবেন্দ্রর জন্য উন্মত্তা। হীরার মানস-মাদকতা প্রকাশ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জ্যোৎস্নাদীপ্ত সন্ধ্যাটিকে বিহ্বল করে তুলেছেন:

"তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লব-রন্ধ্রমধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তারিত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল।"[৬৪]

একটি বঞ্চিত সন্ধ্যার মোহাবেশ—

প্রথম উইল অপহরণের পর হরলালের শঠতায় মর্মপীড়িতা রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল নিতে এসে অশ্রুবর্ষণ করছিল। বসন্তের দিনান্তে, কোকিলের

৬৩। মৃণালিনী: ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৬৪। বিষবৃক্ষ: ৩৩শ পরিচ্ছেদ।

কূজনে, পুষ্পসৌরভে সমাকুল উদ্যানে এমন সময় দেবদূতের মত গোবিন্দলালের আবির্ভাব এবং তাঁর সান্ত্বনার বাক্য। অনুতাপজর্জরিতা রোহিণী এই বসন্ত-বিহ্বল মুহূর্তে যেন নতুন করে গোবিন্দলালকে দেখল, লজ্জা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মিশল বিমুগ্ধ সন্ধ্যার মত্ততা, রোহিণী আত্মবিস্মৃত হ'ল, উপন্যাসের ভয়াল সম্ভাবনা জন্ম নিল। নির্জন পুকুরঘাটে রোহিণীর সেই মানসদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কখন সময় অতিক্রান্ত হ'য়ে যাচ্ছে তা সে জানেও না। রোহিণীর সেই আত্মবিস্মৃতির অবকাশে এইভাবে সন্ধ্যার আগমন:

"শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখীসকল উড়িয়া গাছে গিয়া বসিতে লাগিল। গোরুসকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল। অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে।"[৬৫]

৩। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে পটভূমি রচনা:

"সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল।... ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।......যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নদ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল।......

...ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপনমনে গীত আরম্ভ করিলেন,

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র...জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"[৬৬]

৬৫। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৬৬। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রকে ইংরেজের সিপাহীর হাত থেকে রক্ষা করবার পর ভবানন্দ ও মহেন্দ্র আনন্দারণ্যে চলেছিলেন। জ্যোৎস্নালোকিত এই রাত্রে মাতৃমন্ত্রী ভবানন্দের ধ্যাননেত্রে যেন বঙ্গলক্ষ্মীর আলোকসামান্য সৌন্দর্যমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই এই অপূর্ব মুহূর্তে সৈনিক-সন্ন্যাসীর মর্মলোক থেকে উচ্ছলিত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্'—আনন্দমঠের আত্মার সঙ্গীত, বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রলয়-ঝঙ্কার। বঙ্কিমচন্দ্র যেন কৌমুদীপ্লাবিত আরণ্যসৌন্দর্যকে এই মহত্তম মহিমায় উত্তীর্ণ করবার জন্যই ধীরে ধীরে রাত্রিকে নিবিড় এবং প্রাকৃতিক শোভাকে মহান্ করে তুলেছিলেন। তারপর এই সৌন্দর্য তন্ময়তার হৃদয় মন্থন করে জেগে উঠল বন্দে-মাতরম্ স্থানিক ও কালিক রূপ যেন দেশজননীর চিরন্তনীরূপের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেল।

আর একটি জ্যোৎস্নারাত্রি—

নিস্তব্ধ বনভূমি যেন চন্দ্রালোকে কোনো মহাব্রতসাধনে তপোমগ্ন। বৃক্ষপত্রের মর্মরে মহাব্রতের মন্ত্রশিহরণ। সন্তানসেনা প্রতীক্ষারত। পরমনির্দেশের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ পর্বতশিখরে দণ্ডায়মান; অরণ্যপ্রকৃতি মোহময়ী।

"রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না।······গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর্‌সর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাঁহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন······সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরের কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্মর শব্দ···বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে।···বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে।"[৬৭]

'আনন্দমঠ'-এর বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির সঙ্গে চন্দ্রালোকিত রাত্রির যোগ নিবিড়। সন্তানব্রতের সংগ্রামতপস্যার অবসানের আদেশও আসে মাঘীপূর্ণিমার রাত্রিতে।

"সত্যানন্দ ঠাকুর···গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত।······

৬৭। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক আসিয়া দেখা দিলেন।···চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ আজ মাঘীপূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্!······আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়ই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?······

তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে···।"[৬৮]

এই মাঘীপূর্ণিমার রাত্রির সাক্ষাৎকার 'আনন্দমঠে'র সংগ্রামকাহিনীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে।

'আনন্দমঠের' ষষ্ঠ থেকে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চন্দ্রালোকিত অরণ্যভূমির বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। এদের মধ্যে ঘটনাগত ধারাবাহিকতা আছে, একটি বিশেষ কালপরিবেশের ভিতর অনেকগুলি নাট্যমুহূর্ত পরপর সৃষ্টি হয়েছে।

ক) বনমধ্যে কন্যাসহ পলাতকা কল্যাণী

খ) দণ্ডায়মান ব্রহ্মচারী যেন ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারের আশায় অপেক্ষমান—সেইসঙ্গে অরণ্যপ্রকৃতির মনোরম বর্ণনা।

গ) নীল আকাশের নীচে চন্দ্রদীপিত জীবানন্দ।

ঘ) কোম্পানীর গাড়ী লুণ্ঠনের পর মহেন্দ্রের মুক্তিলাভ ঘটলে চন্দ্রালোকিত রাত্রি এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রভাবে ভবানন্দের কণ্ঠে সমুৎসারিত হল 'বন্দেমাতরম্'। বঙ্কিমচন্দ্র যেন কৌমুদীপ্লাবিত অরণ্যসৌন্দর্যকে এই মহত্তম মহিমায় উত্তীর্ণ করবার জন্যই ধীরে ধীরে রাত্রিকে নিবিড় এবং প্রাকৃতিক শোভাকে মহান করে তুলেছিলেন। তারপর এই সৌন্দর্য তন্ময়তার হৃদয় মন্থন করে জেগে উঠল বন্দে-মাতরম্ স্থানিক ও কালিক রূপ যেন দেশজননীর চিরন্তনীরূপের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেল:

"শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু

৬৮। আনন্দমঠ: ৪র্থ খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারমাখা পৃথিবীর জ্যোৎস্নাময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি।"[৬৯]

ত্রিস্রোতার চঞ্চলবক্ষে বজরায় আসীনা রত্নৈশ্বর্য্যে মণ্ডিতা দেবী চৌধুরাণী বীণাবাদনরতা। নদীর খরস্রোতে এবং দেবীর তরঙ্গিত অপরূপ সৌন্দর্যে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। বীণার স্বর, বনপুষ্পের গন্ধ, আশ্চর্য রমণীসৌন্দর্য ত্রিস্রোতার জলোচ্ছ্বাস এবং চন্দ্রালোক সব মিলিয়ে পরিবেশটি রূপোজ্জ্বল ও সংগীতময় হয়ে উঠেছে। দেবী ও ত্রিস্রোতা উভয়েরই শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য চন্দ্রকরপ্লাবনে উজ্জ্বল রহস্যময়। এই নদী আর এই নারী দুইয়েরই ঐশ্বর্যের বিরাটত্বকে প্রস্ফুট করবার জন্য প্রয়োজন যেন আকাশপ্রদীপের আলোর, গৃহদীপের স্তিমিত আলোয় সে শক্তির পূর্ণ উদ্ভাস হয় না।

"সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।…হীরা, পান্না, মতি, সোনায়, সেই পরিপূর্ণ দেহ, মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড ঝকমক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন ঝিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। …ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে …তাহার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; …চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদু মধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুমসুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছে।"[৭০]

"পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;…এ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

৬৯। দেবী চৌধুরাণী: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৭০। দেবী চৌধুরাণী: ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদীসৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে, অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিনী। সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক-বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।"[১১]

'কমলাকান্তের' দপ্তরের প্রথম প্রসঙ্গটিকে ('একা') জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি ও পথিকের মধুর কণ্ঠোত্থিত সুর-লহরী একসঙ্গে সমন্বিত হয়ে কমলাকান্তের নিঃসঙ্গ হৃদয়কে, ব্যাকুল করে তুলেছে। এই জ্যোৎস্নার বর্ণনা ও আনন্দগীতি মানুষের সুখ এবং সামাজিক পরিতৃপ্তির প্রতীক; কিন্তু যেহেতু কমলাকান্ত একক—পরের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের হৃদয়কে তিনি মেলাতে পারেন নি; সেইজন্য এই সৌন্দর্যময় পরিবেশ তাঁর অন্তরে পরিতাপ ও সত্য জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছে।

৪। শুধুমাত্র সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কনের জন্যই কিছু কিছু চন্দ্রালোকিত দৃশ্য রচিত হয়েছে:

"জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকতে-পুলিনমধ্য-বাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণ প্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্মিত মিনার, গম্বুজ, বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতুবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে।"[১২]

মোগলযুগের দিল্লীনগরীর স্থাপত্যসৌন্দর্য চন্দ্রালোকে সুন্দরতর হয়ে উদ্ভাসিত এই চিত্রটিতে। বঙ্কিমের সুনিপুণ বর্ণনাশক্তির পরিচয় এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

৫। নারীসৌন্দর্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত চিত্রকল্প (Image) সৃষ্টি করেছেন লেখক সে সব ক্ষেত্রেও তাঁর কবিকল্পনাকে কিভাবে চন্দ্রালোক অনুপ্রাণিত করেছে নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি তার নিদর্শন।

"...ললাট...নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক।" (দুর্গেশনন্দিনী)

১১। কমলাকান্তের দপ্তরে: ১ম সংখ্যা, একা।

১২। চন্দ্রশেখর: ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

"যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।… …তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাব-ব্যক্তি শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে স্বচ্ছ সরোবরের ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে।" (বিষবৃক্ষ)

"একবার যেন, কি সুখস্বপ্ন দেখিয়া সুপ্ত শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল।" (চন্দ্রশেখর)

"অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।…কটাক্ষ এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।" (কপালকুণ্ডলা)

"যেমন করিয়া শরতমেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য বিকশিত করে,……তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল।" (আনন্দমঠ)

"রমা হিমরাশি-প্রতিফলিত কৌমুদীরূপিণী।" (সীতারাম)

"সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি,…যেন চন্দ্রোদয়ে নদীস্রোতের মত আনন্দে প্রফুল্ল হইল।" (ইন্দিরা)

"কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্রজন্য মেঘমালা মুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য।" (মৃণালিনী)

"কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল।" (বিষবৃক্ষ)

প্রভাত

প্রাগুষা—"তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে।… কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউ-এর ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীড়মধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ …পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল।…শেষে উষাসমাগমসূচক শীতলবায়ু বহিল। তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল।"[৭৩]

৭৩। বিষবৃক্ষ: ২৩শ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রের উদ্যানে উষাসমাগমের একটি স্নিগ্ধ বর্ণনা এখানে পাই। যেন অন্ধকারের সব ছায়া সরে গেছে, প্রকৃতির বুকে একটি নবজাগরণের, পরিপূর্ণ আনন্দের কলরব। তারমধ্যে শঙ্কাকম্পিতা কুন্দ নগেন্দ্রর দর্শনপ্রতীক্ষায় কুণ্ঠিত হ'য়ে বসে আছেন। মানুষের স্নেহবঞ্চিতা কুন্দনন্দিনী ভাগ্যের ক্রীড়নক। সেইজন্যই প্রকৃতি কুন্দর বেদনায় আজ মমতাময়ী। যেন বাঞ্ছিত নগেন্দ্রের সঙ্গে মিলনের পূর্বসূচনা রূপে নিসর্গজগতে জ্বলছে বধূবরণের দীপাবলী, পাখির কণ্ঠে হুলুধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে।

উষাকাল—"যখন আমার ঘুম ভাঙিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুকরা টুকরা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে।···

কিন্তু পৃথিবীকে রবিরশ্মিপ্রভাসিত দেখিয়া, পক্ষিগণের কলকূজন শুনিয়া, লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতে দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।"···[১৪]

হতাশের জীবনে আশ্বাসের বাণী নিয়ে এসেছে একটি সুন্দর উষা। নূতন সূর্যের আলো, পাখীর কাকলী ও পুষ্পের আনন্দিত শিহরণ—প্রকৃতির যেন এদের মধ্য দিয়ে নূতন প্রাণের আমন্ত্রণ। আশার বাণী পাঠিয়েছে। ইন্দিরার কাছে—যার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন সেই রাত্রির কালাদীঘির ডাকাতিতে অকূল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। "বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল" —প্রথম অরুণোদয়ের সঞ্জীবনী প্রভাব এরই মধ্যে ব্যঞ্জিত।

"শীতল সমীরণময়ী উষার পিঙ্গলমূর্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখন মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন।···"[১৫]

হেমচন্দ্রের উপেক্ষা ও পদাঘাতের পর পুষ্করিণীর তীরে মৃণালিনীর রাত্রি প্রভাত হল। এ এক পরম দুঃখের প্রভাত—এ আলোয় সুখ নেই, সান্ত্বনা নেই—শুধু যন্ত্রণাজর্জর দেহমন নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পদক্ষেপ।

'উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজি পরিবৃত।···বহু কুসুমরাশি বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে। বসিতেছে, উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে।—বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান

১৪॥ ইন্দিরা: ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

১৫। মৃণালিনী: ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বরসম্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালাবর্ণ লুকাইয়া গলবাজিতে সকলকে জিতিতেছিল।"[৭৬]

উদ্যান-সৌন্দর্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধশিল্পী। বিশেষতঃ প্রভাতী উদ্যানের যে মনোরম শোভা, তা তাঁকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। হীরার গৃহে দুদিন অজ্ঞাতবাসের পর পলাতকা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের দর্শনাভিলাষে শেষরাত্রে দত্তবাড়ীর উদ্যানে প্রবেশ করেছেন—এই বর্ণনা সেই সময়ের। পুষ্পবাসিত কুসুমোদ্যানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক অনুরাগে বর্ণনাটি রমণীয়। কুন্দর প্রেমাকুল হৃদয়ের স্পন্দন ও প্রতীক্ষা যেন এই বসন্ত-বীজিত উদ্যানে, নবীন উষালোকে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

প্রভাতী উদ্যানের একটি প্রাসঙ্গিক বিবরণ দেওয়াই এখানে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও অনুমান করা যায়, এরপরে সূর্য্যমুখীর আনুকূল্যে কুন্দ ও নগেন্দ্রের বিবাহ; কুন্দের জীবনে নবীন প্রভাতোদয় নবপুষ্পের সম্ভাবনা। এই উষা ও কুসুম-সম্ভারের শেষ পরিণাম যতই বিষাদান্ত হোক, কুন্দের ক্ষেত্রে এক প্রত্যাশাময় সম্ভাবনারূপেই নির্দেশ করা উচিত। "ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে···সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্বদিক হইতে আসিয়া পূর্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি-চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে-মিলিয়া গেল।"[৭৭]

প্রভাতী আলোর সঙ্গে লেখক কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মিলিতহৃদয়ের প্রেমমাধুর্যটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন। এই পরিচ্ছেদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৭৬। বিষবৃক্ষ: ২৪শ পরিচ্ছেদ।

৭৭। কৃষ্ণকান্তের উইল: ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।

উজ্জ্বল-মধুর প্রভাতে রোহিণীর উইলচুরি ধরা পড়ার কালোছায়া পড়ল দম্পতীর মনে, তারই সঙ্গে উভয়ের মনে জাগল রোহিণীর প্রতি বিশ্বাস ও পরদুঃখ-কাতরতা। সেই ছিদ্রপথেই গোবিন্দলালের জীবনে কলি-প্রবেশ। ট্র্যাজিডির সূত্রপাত।

প্রাতঃকাল—"প্রাতঃকালে গ্রাম পর্যটনে গিয়াছিলাম। একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দোয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারিদিকে বৃক্ষরাজি, ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম।"[৭৮]

পল্লীগ্রামের প্রভাতী সৌন্দর্য এখানে বর্ণিত। এই বর্ণনায় সুন্দর আর অসুন্দরের একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন লেখক। প্রভাতের নির্মল আলোয় প্রকৃতি যেখানে পুষ্পে পত্রে, সুরে ছন্দে এত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, মানুষের ভিতরে সেখানে লালসার মূর্তি জান্তব হিংস্রতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমুদ্রতীরে প্রভাত—"প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে—মৃদুপবনোত্থিত অত্যুন্নতরঙ্গে বালরুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে। তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।"[৭৯]

সমুদ্রতীরের প্রভাতসৌন্দর্যের একটি বাস্তববর্ণনা এখানে আমরা পাই। এই সৌন্দর্য বর্ণনার যে, কোন একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে তা নয়। অবশ্য এই প্রভাতের আনন্দোজ্জ্বল শ্রী নায়িকা হিরণ্ময়ীর মনে বিষণ্ণতার ছায়াই ফেলেছে। পুরন্দরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিলনের দিনগুলির মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা এনেছে এই সাগরেরই বাণিজ্যযাত্রার আহ্বান।

প্রভাত—"নিস্তব্ধ কাননমধ্যে···ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে। পশুপক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রনিচয়। আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণ-নাদিনী, মধুরকল্লোলিনী

৭৮। রজনী: ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৭৯। যুগালাঙ্গুরীয়: ১ম পরিচ্ছেদ।

সংকীর্ণা নদীর তর্ তর্ শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।"৮০

মহেন্দ্রসিংহ মাতৃসেবাব্রত গ্রহণের পূর্বে বিষপানে তাঁর স্ত্রীকন্যার মৃত্যু হয় বলেই তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে সন্তানগণ তাঁর স্ত্রীকন্যাকে রক্ষা করেন। যুদ্ধশেষে সন্তানের জয়লাভের পর বনভূমির প্রভাতী সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁদেরই সাহায্যে স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গে মহেন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটে। এ যেন মানবজীবনের তিমিরাবসানেও এক সার্থক সূর্যোদয়।

"মাথার ওপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। "ভৃঙ্গরাজ" কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদুগন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদুপবনে মর্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে।"৮১

মহেন্দ্র ও কল্যাণী পদচিহ্ন গ্রাম ত্যাগ করে আসার পর দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আনন্দমঠের সন্তানসেনা কর্তৃক আশ্রিতা হন। অনেক দুঃখ ও বিচ্ছেদের পর সন্তানের সাহায্যে যখন আনন্দারণ্যের বনভূমিতে কল্যাণী ও মহেন্দ্র পুনর্মিলিত হলেন এবং কল্যাণী তাঁর অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত ও মহেন্দ্র তার সেবাব্রতের সঙ্কল্পের কথা আলোচনা করছিলেন, সেই সময় বনভূমি প্রভাতের আলোয় রূপে, গন্ধে সঙ্গীতে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছে।

"রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন—এতক্ষণ অন্ধকারে শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়, পক্ষিকূজন শব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন।...ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।...এই নবারুণ প্রফুল্ল প্রাতঃকালে যখন নিকটস্থ কানন হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার।..."৮২

৮০। আনন্দমঠ: ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

৮১। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।

৮২। আনন্দমঠ: ১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।

এখানে 'আনন্দমঠে'র অরণ্যে প্রভাতের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাত্রিতে আনন্দারণ্য যতই ভয়ঙ্কর হোক—দিবালোকে দেশভক্ত সন্ন্যাসীদের বিবিধ পুণ্যকর্মের সূচনায়—সেই বনভূমি পবিত্র ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে।

দ্বিপ্রহর : দ্বিপ্রহরবেলা

"জ্যৈষ্ঠমাস, দারুণ রৌদ্র। পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ।... কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেঁজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল।... তাঁহারা...সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন।"[৮৩]

প্রখর তাপে তাপিতা ধরিত্রীর দুঃসহতৃষ্ণার মূর্ত্তি আকাশ প্রান্তর ব্যাপ্ত করে জ্বলছে। প্রকৃতির সেই রুদ্রমূর্ত্তি এই দ্বিপ্রহর বর্ণনায় সুপরিস্ফুট। তারই মধ্যে ছিয়াত্তরের ভীষণ মন্বন্তরের ছায়া। স্ত্রী আর শিশুকন্যা নিয়ে মহেন্দ্র পলায়ন করছেন দুর্ভিক্ষের রাহুগ্রাস থেকে আত্মরক্ষার আশায়। সেই কষ্টকঠিন পথচলার একটি চিত্র এখানে বিন্যস্ত।

তখন বেলা আড়াই প্রহর—

"সম্মুখে অতি নিবিড়মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা...পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফটিকভঙ্গ হইতেছে, ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবালে দুলিতেছে।...

আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা! কি সুন্দর শ্বেত-মেঘের স্তরপরম্পরের মূর্ত্তিবৈচিত্র্য—কিংবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা।"[৮৪]

নবযৌবনে প্রথম স্বামীগৃহে গমনরতা ইন্দিরা পাল্কীর ঘেরা সরিয়ে দ্বিপ্রহরের যে রূপ ফুটে উঠেছে কালাদীঘিকে কেন্দ্র করে, চোখ মেলে আছে সেইদিকে। এখানে ইন্দিরার অপরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে বাঙালীবধূসুলভ একটি স্নিগ্ধ কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে, আর পতি-সমাগমের আশায় তার যে সুখ-স্বপ্ন সেই স্বপ্নময় দৃষ্টিতে সমগ্র প্রকৃতি সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে।

দিনান্তে—"অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালজলে

৮৩। আনন্দমঠ : ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

৮৪। ইন্দিরা : ২য় পরিচ্ছেদ।

পড়িয়াছে, কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জলপর্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুল-কামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত।...

পুষ্করিণীর শ্যামজলে স্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।"[৮৫]

ভীমাপুষ্করিণীর ওপর দিনান্তের ছায়া পড়েছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের স্বর্ণরৌদ্র, প্রকৃতির স্বহস্তরচিত একটি পত্রনীড়, দীঘির শান্ত জলে সব মিলিয়ে দিবাবসানের একটি শান্ত, সুন্দর রোম্যাণ্টিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক অনুরাগ আছে—তাঁর উপন্যাসে প্রায়ই এরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শৈবলিনীর জীবননাট্যের এই ভীমার একটি বিশেষ অবদান আছে।

৮৫। চন্দ্রশেখর : ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট

এই আলোচনার প্রয়োজনে কিছু কিছু অতিরিক্ত অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

বিভিন্ন উপন্যাসের কালসীমা

বিষবৃক্ষ, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস-সমূহ সমকালের ওপরই নির্ভরশীল। এই কালভূমি প্রধানভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, কুরুচিসম্পন্ন সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এইসব উপন্যাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্রেও উনবিংশ শতাব্দী স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। জমিদারকেন্দ্রিক গ্রাম্য-সমাজ এবং কলকাতায় নবোদ্ভূত অ্যাটর্নি-উকিল-মুৎসুদ্দি ইত্যাদির সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন উপন্যাসগুলিতে স্থান পেয়েছে। সমকালীন ইংরাজ রাজপুরুষ, দেশীয় কর্মচারী, আদালত-আমলা ইত্যাদি (বিশেষভাবে 'মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিত' দ্রষ্টব্য) প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সনতারিখে এরা সীমাবদ্ধ না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অল্প পূর্ববর্তী এবং কালবর্তীরূপেই এই উপন্যাসগুলিকে গণ্য করা উচিত।

অন্যান্য :

দুর্গেশনন্দিনী : ১৫৮০ থেকে ১৫৯০ সালের মধ্যে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় পাঠানবিদ্রোহ দমনের জন্য এই সময় রাজা মানসিংহ ও তাঁর পুত্র (বা নাতি) জগৎসিংহ বাংলাদেশে আসেন :

"During 1590 the rebellion in Bengal, Behar and Orissa was finally crushed by Man Singh and his son, Jagat Singh." —Cambridge History of India, Vol. IV, Page 159 (1963 Ed).

ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন : "The Muslim Chiefs in Bengal and Bihar, mostly of Afgan origen, were specially alarmed by Akbar's conduct, which was interpreted and not without reasons, as an attack upon the Muslim religion....

The rebillion broke out in January 1580, and continued for five years."—Vincent Smith: The Oxford History of India.

কপালকুণ্ডলা: কাহিনীর কাল ১৬০৫ থেকে ১৬০৬ সালের মধ্যে। এইসময় ও তার একবৎসর পরের ঘটনা কাহিনীর কালসীমা। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত লেখকের কিছু উক্তিই কালনির্দেশে সহায়ক।

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।"—কপালকুণ্ডলা: ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

মেহেরুন্নিসা ও মতিবিবির কথোপকথনে—

মতিবিবি— "সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবর শাহ্ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন।" কপাল-কুণ্ডলা: ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুকাল—১৬০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণকাল—৭দিন পরে। ১৬০৫ সালের অক্টোবরের শেষে।—An Advanced History of India.

মৃণালিনী: রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের শেষাংশে, ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে।

"ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।"—মৃণালিনী: ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

"During the period of turmoil some time about 1202 A. D. when Lakshmanasena was probably very old, Bengal was invaded by the Muslims (Vaktiar Khilji) who had by that time conquered nearly the whole of Northern India."—History of India. Vol. I: R. C. Majumdar.

যুগলাঙ্গুরীয়: কাহিনীকাল অষ্টমশতকের মধ্যে। এই কাহিনী সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্তের।

"বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; সেই তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য-সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে

য়ুয়ান চোয়াঙ্ ও ইৎ-সিঙ্ তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না।"—

বাঙালীর ইতিহাস। পৃষ্ঠা-১৯৮, ৪র্থ অধ্যায়—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।

চন্দ্রশেখর: উপন্যাসের কাহিনীকাল, ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ সন। নবাব মীরকাশিমের রাজত্বকাল—ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ—নবাবের পরাজয় ও পলায়নকালের মধ্যে কাহিনীর ব্যাপ্তি।

"Mirkasim was then declared Nawab and the revolution of A. D. 1760 was affected without bloodshed.

... ...

towards the end of 1762...the Nawab decided to abolish altogether; but the English clamoured against this...the events led to the outbreak of war between the English and Mirkasim (1763)......the English gained successive victories at Katwah, Murshidabad, Giria, Sooty, Udaynala and Munghyr. Mirkasim fled to Patna and after having killed all the English prisoners and a number of his prominent officials, went to Oudh."—

An Advanced Historyof India : Majumdar, Roychowdury and Datta.

আনন্দমঠ: কাহিনীকাল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা ১১৭৬ সাল, ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ ও পরবর্তী একবছর।

সুতরাং কাহিনীকাল—১৭৬৯ থেকে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল।

[W. Hastings to the Court of Directors, dated 3 November, 1772 Forrest, London Ed., II 263 et seqi.]

ইহার তিন বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ হইতে রেসিডেণ্ট বেচার সাহেবের লেখা পত্রেও প্রজার অকথ্য দুর্দশা স্বীকার করা হইয়াছে।" (C.H.I.P. 202) ঐতিহাসিক ভূমিকা—শ্রীযদুনাথ সরকার।

দেবী চৌধুরাণী: কাহিনীকাল—১৭৭৬ থেকে ১৭৮৬ সন।

"বঙ্গ……কলকাতায় নাকি হষ্টিন্ (Warren Hastings) বলিয়া একজন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।"—দেবী চৌধুরাণী : ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।

"যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ দেবী চৌধুরাণীর সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য।

হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এদেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'র কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী……তখন মুঘলসাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে। অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুদ্ধের সন্ধিস্থল……অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।"
—আচার্য যদুনাথ সরকার।

"এই চিরন্তন প্রফুল্ল ১৭৭৬-১৭৮৬ সনের বঙ্গদেশ হইতে অনেক দূরে……"
—আচার্য যদুনাথ। 'দেবী চৌধুরাণী'র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা।'

সীতারাম : উপন্যাসের কাহিনীকাল—১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১৪ পর্যন্ত।

"শাহজাদা আজীম এবং বাদশাহ কর্তৃক অসামান্য ক্ষমতাযুক্ত হইয়া বঙ্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদকুলি খাঁ) নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না।… ঠিক এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উত্থান।…১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্য্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক রাজসুখ ভোগ করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সালে ফররুখশিয়র দিল্লীর বাদশাহ হইবার পর মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবাদার হইয়া আসিলেন।…এখন হইতে নামতঃ ও কার্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্বেসর্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের শীতকালেই সীতারামের ধ্বংসসাধন করিলেন।"—

(ফেব্রুয়ারী—১৭১৪) ঐতিহাসিক ভূমিকা—শ্রীযদুনাথ সরকার।

রাজসিংহ : উপন্যাসের কাহিনীকাল—১৬৫৯-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

অওরংজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষকাহিনী এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। ইংরেজী ১৬৭৯ সালে অওরংজেব যুদ্ধযাত্রা করেন।

অওরংজেব ও রাজসিংহের রাজত্বকালের সাধারণ সীমা—১৬৫৯-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

"Aurangzeb re-entered Delhi in May, 1659, and was enthroned for the second time in June with complete ceremonial."

Aurangzeb Alamgir 1658 –1707 : The Oxford History of India. : Vincent A. Smith. Chap—VI.

"Rana Raj Singh, A. D. 1652—80.

Rana Raj Singh mounted the throne in 1710 (A.D. 1654)"

—Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan Vol I.

উপন্যাস ও ইতিহাসের তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত কালসীমায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী-কাল পরিব্যাপ্ত।

উপন্যাস-সমূহের ঘটনাস্থল

দুর্গেশনন্দিনী : বিষ্ণুপুর, গড়মান্দারণ, পাটনানগরী, বঙ্গপ্রদেশের তৎকালীন রাজধানী তাণ্ডানগর, বর্ধমান, ধরপুর গ্রাম, কতলু খাঁর রাজধানী উৎকল দেশ, কাশীধাম।

উপন্যাসের পটভূমি গড়মান্দারণ। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় এটি অবস্থিত। স্থানটির পাশ দিয়ে আমোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে। একাধিক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে বিদ্যমান। জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থলে স্থিত এই অঞ্চলটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় কতখানি ঘটে জানা যায় না, তবে তাঁর মেজঠাকুরদা এবং অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র* (যিনি কিছুকাল কার্যব্যপদেশে জাহানাবাদে ছিলেন,) গড়মান্দারণের কিংবদন্তী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে বিবৃত করেছিলেন। এই স্থানটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কেন্দ্রভূমি। এছাড়া কাহিনীতে বিষ্ণুপুর এবং উড়িষ্যায় কতলু খাঁর প্রাসাদও স্থান পেয়েছে।

* "এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনেছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন।"—

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে Bengal District (Hooghly) Gazetteer (P-288, 289)-এ বলা হয়েছে।

"An old place lying in thana Goghat of the Arambagh subdivision, 7 or 8 miles W. S. W. of Arambagh town. The Burdwan-Midnapore road passes west and the old Nagpur road a little north of the place. It contains the ruins of two forts, the northern one called Garh Mandaran and the southern one Bhitagarh."

কপালকুণ্ডলা : গঙ্গাসাগরের মোহানা, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সমুদ্রসীমায় রসুলপুর নদী ও তার তটভূমি, দৌলতপুর ও দরিয়াপুর গ্রাম, মেদিনীপুর, সপ্তগ্রাম, বৰ্দ্ধমান, আগ্রা, উড়িষ্যা, হিজলী।

সপ্তগ্রাম : 'বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের কাছে ও, ই, আই রেলপথের ত্রিশবিঘা স্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম বন্দর অবস্থিত ছিল। এখন সাতগাঁ নামে একটি অতিক্ষুদ্র পল্লী সেই ইতিহাস-বিখ্যাত বিপুল বৈভবসম্পন্ন মহানগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে।' (বিশ্বকোষ)

সপ্তগ্রাম সরস্বতী তীরে অবস্থিত। বর্তমান রেল স্টেশনের নাম আদি সপ্তগ্রাম।

দরিয়াপুর, দৌলতপুর : দরিয়াপুরে কাছারি আদালত ছিল বটে—কিন্তু মনুষ্যবসতি অতি বিরল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁয়ো দোকান—তাহাও বহু দূরে দূরে। বহু দূরে নদীর উপকূলে দৌলতপুর গ্রাম—তথায় (যাহা তৎকালে "রসুলপুরের নদী" বলিয়া বিখ্যাত ছিল) মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত কয়েক যোজন পথ ব্যাপিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত ছিল।...ইহার পরে দূরে বহু দূরে মণ্ডল মধ্যস্থিত প্রান্তরের শেষ সীমায় বহুকালের অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় কালীমন্দির।"—পৃষ্ঠা-১৩, বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

মৃণালিনী : প্রয়াগতীর্থ, নবদ্বীপ, লক্ষ্মণাবতী, মথুরা, গৌড়, কামরূপ। নবদ্বীপের দক্ষিণ দিকে হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্য।

বিষবৃক্ষ : গোবিন্দপুর, দেবীপুর, ঝুমঝমপুর, কলকাতা, কোন্নগর, মধুপুর গ্রাম, কাশীধাম, রাণীগঞ্জ।

যুগলাঙ্গুরীয় : তাম্রলিপ্ত বন্দর, সিংহল, কাশী।

তাম্রলিপ্ত : "বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম উপন্যাস "যুগলাঙ্গুরীয়" ও মেদিনীপুরের অতীত যুগের সমৃদ্ধির একটি ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া লিখিত। যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের পরিকল্পনাক্ষেত্র এই জেলার অন্তর্গত আধুনিক তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর। বঙ্গের অতীত গৌরবের দিনে এই তাম্রলিপ্তই পূর্বভারতের প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। তখন অনন্ত নীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে তাম্রলিপ্তের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। তাম্রলিপ্ত বন্দরে তখন বাণিজ্যপোত ও রণতরীসমূহ নির্মিত হইত এবং ঐ বন্দর হইতে সুবৃহৎ অর্ণবযানসমূহ মন্দপবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশবিদেশে যাত্রা করিত। বাঙালীর পোতারোহণ কোলাহলে তখন তাম্রলিপ্তের লবণম্বুবেলা নিয়ত কলকলায়মান রহিত।

বাঙালীর বাণিজ্যপোত সেদিন কত দেশের রত্নভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় শত সৌধচূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে, তাম্রলিপ্তের সেই গৌরবময় যুগের, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

পৃষ্ঠা ৩১ বঙ্কিমস্মৃতিচিহ্ন—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

চন্দ্রশেখর : গঙ্গাতীরস্থ কোন গ্রাম, বেদগ্রাম, মুঙ্গের, আজিমাবাদ, পুরন্দরপুর, মুর্শিদাবাদ, গঙ্গাবিধৌত মুঙ্গেরের পর্বত কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা।

রাধারাণী : শ্রীরামপুর, মহেশের রথতলা, কলিকাতা, রাজপুর, কাশী।

রজনী : কলিকাতা, গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রাম, কাশীধাম, ভবানীনগর গ্রাম, কালিকাপুর গ্রাম।

কৃষ্ণকান্তের উইল : হরিদ্রাগ্রাম, প্রসাদপুর, রাজগ্রাম, শ্রীবৃন্দাবন, যশোহর।

আনন্দমঠ : পদচিহ্ন গ্রাম, ভৈরবীপুর, উত্তরবঙ্গ, আনন্দারণ্য নগর।

"'আনন্দমঠ' ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসের 'বঙ্গদর্শনে' সুরু হইয়া ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে সমাপ্ত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে ইহার ৫টি সংস্করণ হইয়াছিল।—মূলপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন ও পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংক্ষেপে বিবৃতি দিয়াছেন। প্রথম চারি সংস্করণে 'আনন্দমঠ'-এর ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, অজয়ের তীরবর্তী কোনও আরণ্য

ও পার্ব্বত্যপ্রদেশ ; কিন্তু আসলে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল উত্তরবঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন করেন নাই। পঞ্চম সংস্করণে এই পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্বত এমনভাবে মিশিয়া ছিল যে, সামান্য কয়েকটা নাম তুলিয়া অথবা বদলাইয়া বীরভূমকে বরেন্দ্রভূমি করা সম্ভব হয় নাই ; বরেন্দ্রভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমই ফুটিয়া উঠে।"

'আনন্দমঠে'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ সম্বন্ধে আনন্দমঠের 'সাহিত্য-পরিষদ' সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস) উক্তি।

নগর (Nagar) : Stewart identified Lakhanor with Nagar, while Professor Bochmann suggests that it may be Lakrakund near Dubrajpur, both places in this district ; but neither theory is satisfactary, as Lakhanar lay in low marshy country.............whereas both Nagar and Lakrakund are situated on high rocky ground........... (PP 10)

* * * * * *

In that part of the district called Viradesa is the city of Nagara ; also sipulya, and other towns from this account it appears that Nagar was the head quarters of the Hindu rulers, and that the country was known as Viradesa or Virabhumi, the modern Birbhum, P. P. 11.

* * * *

The rebels obtained possession of Nagar and Afzalpur, but after some further fighting were compelled to evacuate them and retire across the border to Kumrabad. PP.26.
—Bengal District Gazetteers : Birbhum, By L. S. S. O. Malley.

দেবী চৌধুরাণী : বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রাম, শ্রীবৃন্দাবন, গৌড় (১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ), রংপুর, তিস্তার নদীবক্ষে।

ইন্দিরা : কালাদীঘি গ্রাম, গৌরীগ্রাম, মনোহরপুর, মহেশপুর, কলকাতা, কালাদীঘির ধারে '(জলাধারের দর্পণে দ্রষ্টব্য)'

রাজসিংহ : রূপনগর, আগ্রা, দিল্লী, উদয়পুর, উদয়সাগর '(জলাধারের দর্পণে দ্রষ্টব্য)' উদয়পুরের পর্বতরাজি, চিতোর, আজমীর গুজরাট অঞ্চল।

মুচীরামগুড়ের জীবনচরিত : মোহনপল্লী, কলিকাতা, চন্দনপুর, আরও ২।৩টি গ্রাম, নাম উল্লিখিত হয় নি।

কমলাকান্তের দপ্তর : স্থানের নামোল্লেখ নেই। বাংলাদেশের কোন গ্রাম আর নিবাস—শ্রী শ্রী নসীধাম, প্রসন্নর গোয়াল ("গরুও থাকে আমিও থাকি ") এবং তথাকথিত 'হট্টমন্দির'।

উপন্যাসের উৎসস্বরূপ কিছু ঘটনা

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকে অনেক ছোট ছোট ঘটনা, চরিত্র এবং বাল্যজীবনের সঙ্গে জড়িত বহু স্থান বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিমসৃষ্ট সাহিত্যের উৎস অনুমান করে এই জাতীয় কিছু বর্ণনা নিয়ে উদ্ধৃত করা হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ফুলের বাগান : "তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণদিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দু কাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা। আড়েও প্রায় ঐরূপ। তিনদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ।...চারিদিকেই যেন গ্যালারির মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল তাহাতে শুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যুঁই, জাঁতি, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।"—

'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়'—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (নারায়ণ—বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা—বৈশাখ, ১৩২২)

এই ফুল এবং ফুলবাগানটি বঙ্কিমসাহিত্যের বিচিত্র পুষ্পসমারোহ ও বিভিন্ন পুষ্পোদ্যানের মূল প্রেরণা।

অর্জ্জুনা পুষ্করিণী : "এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। গ্রামোপান্তে অতি নির্জনস্থানে উহার খনন হইয়াছিল। কিন্তু কোন সময়ে উহা খাত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অর্জ্জুনা পূর্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকে পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে···অর্জ্জুনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলের বাগান ছিল, উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীও ছিল···তেরোচৌদ্দ বর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ টাকা হইতে এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলী কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক নির্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।···বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন।"···অর্জ্জুনা পুষ্করিণী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'নারায়ণ' বঙ্কিম স্মৃতিসংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২।

এই অর্জ্জুনা পুষ্করিণী ও তৎসংশ্লিষ্ট পুষ্পোদ্যান যে বঙ্কিম-সাহিত্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছে বিশেষ করে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস দুটিকে "পুষ্পরাজি" ও "জলাধারের দর্পণে" প্রবন্ধ দুটিতে এ বিষয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা আমরা করেছি।

"আমাদের গ্রামের আড় পারে হুগলী কালেজ। প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত,—কোন কোন দিন মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কালমেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবলবেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গসকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত।···বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন।" —'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কলেজজীবনে নিত্য এই দুর্যোগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং প্রকৃতির সংহারিণী মূর্ত্তির প্রতি বঙ্কিমের এই অদ্ভুত আকর্ষণ যা বিপদের ভয়কে অনায়াসেই উপেক্ষা করত তাঁর পরবর্তী কথা-সাহিত্যকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছে মনে হয়।

["ঝড়ে মেঘে রৌদ্রে ও রাত্রিদিনের পালাবদলে মানুষ" অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।]

"চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে বাটী আজও আছে, বাটীটি প্রশস্ত দ্বিতল। ঠিক গঙ্গার উপর বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপরে নীলাকাশ, পদনিম্নে কুলুকুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী।...বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন। 'একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে—কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল'।" ("ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত")

হুগলী ত্যাগের কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দেবী চৌধুরাণী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাহার মানসপটে এ চিত্র অঙ্কিত ছিল।

"রাজলক্ষ্মী দেবীর পবিত্র চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে নভেলিষ্ট করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী।' সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ষোল আনাই তাঁহার স্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন, 'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের —আমার পরিবারে। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।'—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন—পৃঃ ৮-৯, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

"শচীশবাবু লিখিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র সে বিশাল হৃদয় রূপনারায়ণ দেখিলেন। মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর, পক্ষিকুল, শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।' আর বঙ্কিম সেই সমুদ্রবৎ বিপুলাকার রূপনারায়ণ তটোপরি দেখিলেন, 'এক বিচিত্র অট্টালিকা', তাহার নিকটে 'সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা', এই দৃশ্য—তমলুকের এই দৃশ্য, তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছেন।' (বঙ্কিমজীবনী পৃঃ ৫১৬)। ১৮৬০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তমলুকে আসিয়াছিলেন এবং ১৮৭৪ সালে তাঁহার যুগলাঙ্গুরীয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।"—'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন' পৃঃ ৩৭-৩৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

"কাঁথি সহরের মধ্যস্থলে "কৃষ্ণকান্ত" নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। জনপ্রবাদ উহার প্রতিষ্ঠাতার নামেই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, সেকালের নিমকমহলের দেওয়ান ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি।...এখনও উহাকে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন উহা কোন সৌখীন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল। তখন উহার খঞ্জনীলিমাতুল্য জলরাশি দর্পণের মত অনাবিল ও স্বচ্ছ ছিল। চারিদিকে ফল ও ফুলের সুশোভিত উদ্যান বিরাজ করিত এবং সরসীর সোপানমালা লীলাললিতগামিনী কুলললনাগণের অলক্তলাঞ্ছিত চরণের মধুর মঞ্জরীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত।...কবি বারুণী পুষ্করিণীতে তাহারই ছবি দিয়াছেন এবং গ্রন্থের নামে ঐ দেওয়ান কৃষ্ণকান্তেরই স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।...ইহার কোন প্রমাণ নাই—লেখকের অনুমান মাত্র।" 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন' পৃঃ ৩৯-৪০, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

"বঙ্কিমচন্দ্র ১৯এ জানুয়ারী অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমেই নেগুঁয়ায় আসিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলার প্রারম্ভে এই মাঘ মাসের শেষের একদিনের 'সাগর সঙ্গম' এর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ঐ সময় গঙ্গাসাগর যাত্রীদিগের নৌকা সকল প্রত্যাগমন করিয়া থাকে।...তিনি নেগুঁয়া আসিবার দিন কয়েক পরেই মাঘ মাসের শেষের কোন পুণ্য প্রভাতে ঐ সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেদিন ঐ সমুদ্রসৈকতে দাঁড়াইয়া দিগন্তব্যাপ্ত ঘোরতর কুজ্ঝটিকার মধ্যে কোন যাত্রীর নৌকার অস্পষ্ট ছায়া দেখিয়া তাঁহার নিজ জীবনের আর একদিনের কথা (হুগলী কলেজে যাওয়ার পথে কুয়াসা) বুঝি মনে পড়িয়াছিল—কবি সেই ঘটনার সহিত কল্পনা মিশাইয়া কপালকুণ্ডলার প্রথম পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।"—'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন' পৃঃ ৬৪, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মতিবিবি একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোনো ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে, প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল তাহা লইয়া স্বামী সন্দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিত আর কাঁদিত।" 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—বৈশাখ—১৩২২। 'নারায়ণ'।

"যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্বে জর্মণ জাতির সমন্বয় বা জলভরীণ হইতে National Cohesiveness বা জাতি সংহতি লইয়া ইউরোপে এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিন্যাল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসালা অনেকটা আছে।"—'নারায়ণ', বৈশাখ—১৩২২ 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী'—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

"কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন।...গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন...গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই।...

"কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্রান্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"

—'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিম-স্মৃতিসংখ্যা। 'নারায়ণ'।

"১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই। কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে "আনন্দমঠ" লিখিলেন। "বন্দে মাতরম্" গীতটি উহার বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎবাক্য আছে।" —'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—'নারায়ণ' বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।

রাজমোহনের স্ত্রী :

"রাজমোহনের স্ত্রী" মূল ইংরেজী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-এর কিছু অংশ বাংলায় নূতনভাবে রচনা করেছিলেন। সেই অসমাপ্ত গ্রন্থে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদান পাওয়া যায়; বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

"বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সর্বত্র নিঃশব্দ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ শিহরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুঁড়ি ছিল প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে নরম্ন প্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাহার প্রতীতী হইতে লাগিল।"

"The recent shower had but to the morning delightful and invigorating freshness. Leaving the mass of floating clouds behind, the sun advanced and careered on the vast blue plain that shone above; and every house-top and every tree-top, the cocoa-palm and the date-palm, the mango and the acacia received the flood of splendid light and rejoiced. The still lingering water-drops on the leaves of trees and creepers glittered and shone like a thousand radiant gems as they received the slanting rays of the luminary. Through the openings in the thick-knit boughs of the groves glanced the mildray on the moistened grass beneath. The newly awakened and joyous birds raised their dissonant voices, while at intervals the Papia (Sparrow-hawk) sent forth its rich thrilling notes into the trembling air. Light fleecy clouds of white wandered in the solitude of the now purified blue of the heavens, which were fanned by a light breeze that had

sprung up to shake the pattering drops from the pendant and wooing boughs."

সমাজের প্রায় সর্বস্তরের চরিত্রের বিন্যাসই আমরা এই উপন্যাসের সামাজিক উপাদান হিসেবে লক্ষ্য করতে পারি। প্রকৃতিও তার বিচিত্ররূপে, এই সব সামাজিক চরিত্রের অনুষঙ্গিণী।